মিত্র প্রকাশন প্রকাশনা

জানুয়ারি ১৯৮৯ ● মূল্য ৬·০০

আক্রমণের মুখে জ্যোতি বসু ও তাঁর পরিবার

দেব আনন্দ: তিন প্রজন্মের নায়ক

হাজিমস্তানের রাজনৈতিক অনুপ্রবেশ
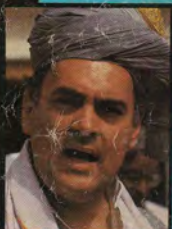
উত্তরপ্রদেশ কি রাজীব গান্ধীর ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করবে?

অপমানিতা অভিনেত্রীরা

ইসলামীকরণের পর বাংলাদেশে হিন্দুভাগ্য!

আপনার সন্তানকে
বুদ্ধিমান করে তুলুন
ওকে দিন
চিল্ড্রেন্স নলেজ ব্যাংক
(ছয় খণ্ডে)
সাফল্য আর জনপ্রিয়তার নতুন ধারা সৃষ্টিকারী এক অপরিহার্য শিক্ষামূলক সিরিজ
"র‍্যাপিডেক্স" ইংলিশ স্পীকিং কোর্স
3,00,00,000
তিন কোটিরও বেশি
পাঠকের পছন্দ
New Addition
LETTER WRITING
মূল্য 30/-
ডাক মাশুল
5/- অতিরিক্ত
It's really a good book to learn spoken English —Kapil Dev
কনভেন্ট স্তরের 'শুদ্ধ ও অনর্গল ইংরাজী' শেখাবার এমন বই —যা ভারতের সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। যাকে সমাজের সর্বস্তরের এবং সব ভাষাভাষি লোক আপন করে নিয়েছে।
এই বই শিশুর মস্তিষ্কে টনিকের মতো কাজ করে
যে-মুহূর্তে একটি শিশু চিন্তা-ভাবনা করতে শুরু করে, সেই মুহূর্ত থেকেই তার মনে জাগতে থাকে কৌতূহল। তার চারপাশের এই সুন্দর পৃথিবী সম্পর্কে জমা হতে থাকে নানান বিস্ময়। তার মনে 'কীভাবে' আর 'কেন' — এই প্রশ্ন উঁকি দিতে শুরু করে। সে এসব প্রশ্নের উত্তর চায়, কিন্তু সহজে পায় না। সঠিক সময়ে প্রশ্নগুলির উত্তর পেয়ে গেলে তার জ্ঞানের পরিধি বেড়ে যায়। তার মন হয়ে ওঠে আরও তীক্ষ্ণধী; উপলব্ধি করবার ক্ষমতাও বেড়ে ওঠে, তাকে আরও বুদ্ধিমান করে তোলে। অন্যদিকে, প্রশ্নগুলির উত্তর না পেলে তার বুদ্ধি ভোঁতা হতে শুরু করে। তখন সে বিষয়টি না বুঝেই মুখস্থ করতে শুরু করে দেয়। এর ফলে তার স্বাভাবিক মানসিক বিকাশ ব্যাহত হয়।
বৈশিষ্ট্য
৬ খণ্ডের একটি সেটে আছে—
১৩০০ বড়ো সাইজের পৃষ্ঠা
১১০০ ছবি
৫,০০,০০০ শব্দ
১০৫০-এরও বেশি 'কীভাবে' এবং 'কেন' আর
সেটটি ভরা আছে একটি
গিফট বক্সে
PRICE:
Paperback Student Edition: Rs. 24/- each
Postage: Rs. 4/- each
Full Set Rs. 144/- Postage Free
Hard Bound Gift Edition: Rs. 30/- each
Postage: Rs. 5/- each
Full Set Rs. 180/- Postage Free
Also available in English
Six Vols. Price Same
101 ম্যাজিক ট্রিক্স
101 সাইন্স গেমস
Price Rs. 15/- Postage Rs. 4/- each
101 সাইন্স গেমস্
যখন শিশুরা বিজ্ঞানের সাধারণ ও সহজ সূত্রগুলি শিখছে অন্যদিকে তারা সঙ্গে সঙ্গে এও শিখছে রকমারী বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি তৈরী করার বিধি যেমন ব্যারোমিটার, বৈদ্যুতিক চুম্বক, হেক্টোগ্রাফ, বাষ্প চালিত টারবাইন, ইলেকট্রোস্কোপ ইত্যাদি
101 ম্যাজিক ট্রিক্স
একটা মজার ব্যাপার কোন পার্টিতে, জলসায়, ঘরোয়া জমায়েতে অথবা ভ্রমণকালে কেড়ে নেওয়ার জন্য নতুন মজাদার হাত সাফাই-এর খেলা দেখিয়ে আত্মীয়-স্বজন বন্ধু বান্ধবকে আনন্দ দাও।
বাংলা হিন্দী
লার্নিং কোর্স
Price 30/-
Postage Rs 5
AVAILABLE at leading bookshops, A.H. Wheeler's and Higginbothams Railway Book Stalls throughout India or if not available ask by V.P.P. from
PUSTAK MAHAL
Khari Baoli, Delhi-110006
Show Room: 10-B, Netaji Subhash Marg, New Delhi

তৃতীয় বর্ষ * দ্বাদশ সংখ্যা * জানুয়ারি ১৯৮৯

বাস্তব জীবনের আয়না

প্রধান সম্পাদক: আলোক মিত্র
সহায়ক সম্পাদক: রমাপ্রসাদ ঘোষাল
সহ সম্পাদক: প্রদীপ বসু
উপ সম্পাদক: গুরুপ্রসাদ মহান্তি
সংবাদদাতা
দিল্লি: পুষ্কর পুষ্প
হায়দরাবাদ: পারভেজ খান
মাদ্রাজ: লক্ষ্মী মোহন
লন্ডন: বলবন্ত কাপুর
ওয়াশিংটন: শেখর তেওয়ারি
লস এঞ্জেলেস: আফসান সফি
বম্বে ব্যুরো প্রধান: রবীন্দ্র শ্রীবাস্তব
আলোকচিত্রী: বিকাশ চক্রবর্তী
ভিসুয়ালাইজার: শান্তনু মুখার্জি

দিল্লি কার্যালয়:
সঞ্জয় লাল: ব্যবসায়িক ব্যবস্থাপক
৪০৫ রোহিত হাউস, ৩ তলস্তয় মার্গ
নয়াদিল্লি–১১০০০১
দূরভাষ: ৩৩১৪৫৩০
টেলেক্স: ০৩১ ৬৭১৫ নিউজ ইন
বম্বে কার্যালয়:
অনুপ তুৎসি: আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক
৮২০ এমব্যাসি সেন্টার
নরীমান পয়েন্ট
বম্বে–৪০০০২১
দূরভাষ: ২৪৩৫৭৭, ২৪৪৮৪৬
টেলেক্স: ০১১ ২৫৫৭ মায়া ইন
লখনউ কার্যালয়:
বি–২০৫, গোপালা অ্যাপার্টমেন্টস,
৩০, রামতীর্থ মার্গ, হজরতগঞ্জ, লখনউ–২২৬০০১
দূরভাষ: ৩৬২৬২/৩৪৪৭৭
ব্যুরো প্রধান: অজয় কুমার
কলকাতা সম্পাদকীয় ও ব্যবসায় কার্যালয়:
স্টিফেন্স কোর্ট
ফ্ল্যাট–ও এ (পাঁচতলা)
১৮ এ পার্ক স্ট্রিট
কলকাতা–৭০০০১৬
দূরভাষ: ২৯২০৩৫, ২৯৮৫৪০
টেলেক্স: ০২১ ৫৭৭৩, নিউজ ইন
ব্যবসায়িক ব্যবস্থাপক: অমিত সেন
প্রধান কার্যালয়:
মিত্র প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড
২৮১ মুঠিগঞ্জ, এলাহাবাদ ২১১০০৩
দূরভাষ: ৫৪৬৮১, ৫১০৪২, ৫৫৮২৫, ৫৫৭৭৩
গ্রাম: মায়া এলাহাবাদ
টেলেক্স: ০৫৪–২৮০
প্রকাশক: দীপক মিত্র
মিত্র প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড, ২৮১ মুঠিগঞ্জ,
এলাহাবাদ–২১১০০৩ থেকে প্রকাশিত
এবং মায়া প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড থেকে
অলোক মিত্র কর্তৃক মুদ্রিত।
ফোটোকম্পোজিং: মিত্র প্রকাশন প্রাইভেট
লিমিটেড, এলাহাবাদ–এর একটি ইউনিট–
সুরুচি চক্রবর্তী

AIR SURCHARGE 50 PAISE PER COPY
for Dibrugarh, Silchar, Tinsukia, Jorhat, Tezpur, Shillong, Kathmandu and Agartala

সূচীপত্র

স্টারডম–৪৬

পুরুষ শাসিত টলিউডে প্রতি বছরই সঞ্চিত হচ্ছে সেই সব অভিনেত্রীদের নাম-যাঁরা বাদ পড়েছেন ছবি থেকে, চাবুক খেয়েছেন, নিরপত্তাবিহীন হোটেলে থেকে ঝুঁকি নিয়েছেন জীবনের। রূপা-দেবিকা সঞ্চিতাকে নিয়ে দীর্ঘ এই তালিকায় লিখিত হয়েছে সুমিত্রা মুখার্জিরও নাম! টলিউডের এই অজানা অধ্যায়ে আলোকপাত।

প্রচ্ছদ প্রতিবেদন–২৬

পশ্চিমবঙ্গের 'ফার্স্ট ফ্যামিলি' অর্থাৎ মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু-পরিবারের কাউকে না কাউকেই জড়িয়ে ফেলা হয়েছে কোন না কোন দুর্নীতির অভিযোগে। অনেকেরই ধারণা, মুখ্যমন্ত্রীর শুভ্র পোশাকে আজ বহু দুর্নীতির মালিন্য। তাঁকে নিয়ে ক্রমাগতই তিক্ত লেখালিখি এবং বিতর্ক। বামফ্রন্টের খুদে শরীক, সি পি এম এবং খোদ মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য, এ আসলে সাংবাদিক আর আমলাদের নিয়ে কংগ্রেসী চক্রান্ত! সত্যি কোনটা? জ্যোতি বসু কি আজ সত্যিই দুর্নীতিগ্রস্ত? উত্তর সন্ধানে এই বিশ্লেষণী প্রতিবেদন।

পশ্চাদপট–৬৪

ত্রিপুরা এবং পশ্চিমবঙ্গ আবার কি হতে চলেছে শরণার্থী ভারে ভারাক্রান্ত? এরশাদের শাসনে বাংলাদেশের সীমানা পেরিয়ে কেন চলে আসছে অন্নহীন-নিপীড়িত হিন্দুরা! ইসলামিকরণের পর বাংলাদেশে হিন্দু-ভাগ্য কি আজ বিপর্যয়ের মুখে? বিশদ প্রতিবেদন।

আলোকপাতের বিগত তিনটি বছর পাঠকদের পৃষ্ঠপোষকতা আর আগ্রহের ফলশ্রুতি। আমরা অভিভূত হৃদয়ে নববর্ষে প্রবেশ করছি আমাদের বৈচিত্র্যের মঞ্জুষাকে সঙ্গে নিয়ে। এবারের সংখ্যাটিও আমাদের ধারাবাহিকতার ঐতিহ্যানুসন্ধানী।

জানুয়ারি সংখ্যায় আমাদের প্রচ্ছদ কাহিনী পশ্চিমবঙ্গের ফার্স্ট ফ্যামিলি মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর পরিবারের ওপর সংবাদমহলের নিরন্তর আক্রমণের ঘটনাটি নিয়ে। সত্যিই কি মুখ্যমন্ত্রীর শ্বেতশুভ্র পোশাকে দুর্নীতির কালির ছোপ লেগেছে? না আসলে এটা বৃহত্তর কংগ্রেসী চক্রান্তেরই একটা অঙ্গ! অভিযোগ পাল্টা অভিযোগের উতোর চাপানের মধ্যে আসল সত্যটা কি? এ বিষয়ে একটি বিস্তৃত বিশ্লেষণী আলোকপাত এই সংখ্যায়, যা পশ্চিমবঙ্গের সাম্প্রতিক রাজনীতির জট খুলতে অনেকটাই সাহায্য করবে।

আগামী সাধারণ নির্বাচন যতই এগিয়ে আসছে ততই দেশময় সঞ্চারিত হচ্ছে রাজনৈতিক ব্যস্ততা। উত্তরপ্রদেশ সর্বভারতীয় রাজনীতিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। আর আমেথি রাজীব গান্ধীর ভি-আই-পি নির্বাচনী কেন্দ্র। রাজীব গান্ধীকে ঘিরে শুরু হয়েছে উত্তরপ্রদেশের রাজনৈতিক অঙ্কের হিসেব নিকেশ। কিন্তু উত্তরপ্রদেশের কংগ্রেসীরাও দ্বন্দ্বদীর্ণ। জনতাদলের নেতৃত্বও হচ্ছে সংঘবদ্ধ। এ বিষয়ে একটি বিস্তৃত প্রতিবেদন, 'উত্তরপ্রদেশ কি রাজীব গান্ধীর রাজনৈতিক ভাগ্য নির্ধারণ করবে?'

এছাড়া প্রতিবেশি দুটি দেশ পাকিস্তান ও বাংলাদেশকে নিয়েও পেশ করা হয়েছে দুটি প্রতিবেদন। পাকিস্তানের রাজনৈতিক ইতিহাসে সাম্প্রতিক পরিবর্তনের বিশালত্বকে আনার চেষ্টা করা হয়েছে একটি বিশ্লেষণী ও আকর্ষণীয় রচনার সীমানায়। আর ইসলামিকরণের পর বাংলাদেশে হিন্দুভাগ্য নিয়ে রয়েছে একটি প্রতিবেদন। হিন্দুরা কি বাংলাদেশে বর্তমানে এক নিরাপত্তাহীন জনগোষ্ঠী? প্রেসিডেন্ট এরশাদ হঠাৎ কেন বাংলাদেশের ইসলামিকরণে প্রবৃত্ত হলেন–বিরোধী দলগুলির প্রবল বিরোধীতা সত্ত্বেও? একটি অন্তর্তদন্তমূলক প্রতিবেদন।

খেলার জগতে আমাদের এবারের প্রতিবেদন মহিন্দর অমরনাথকে নিয়ে। মহিন্দর কি সত্যিই অপরাধী, নাকি ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডে বাসা বেঁধেছে কায়েমী শক্তিরা? আমাদের প্রতিবেদক এব্যাপারে একটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদন পেশ করেছেন।

বম্বের চলচ্চিত্রজগতের তিন প্রজন্মের নায়ক দেব আনন্দকে নিয়ে তাঁর বিরল সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে রচিত হয়েছে একটি আকর্ষণীয় চলচ্চিত্র রচনা। সঙ্গে রয়েছে 'অপমানিতা অভিনেত্রীরা' নামের একটি রচনায় চলচ্চিত্রের অন্দরমহলের এক অজানা অধ্যায়ের প্রতি আলোকপাত।

এছাড়া রয়েছে বম্বের অন্ধকারজগতের অঘোষিত সম্রাট হাজি মস্তানের রাজনীতিতে অনুপ্রবেশ। দার্জিলিং–এ সি পি এম-এর অস্ত্রসংগ্রহের প্রেক্ষাপট, ছাব্বিশ বছর বিনাবিচারে কারান্তরালে থাকার এক অকথিত করুণ কাহিনী। প্রধান ও সর্বভারতীয় ক্ষেত্রের সুপরিচিত কমিউনিস্ট নেতা মোহিত সেন একটি অন্তরঙ্গ সাক্ষাৎকারে আমাদের প্রতিনিধিদের কাছে উন্মোচন করেছেন এই প্রথমবার তাঁর ভাবনাচিন্তা আর ব্যক্তিগত জীবনের এক অজানা অধ্যায়।

আমাদের আগামী সংখ্যাটি তৃতীয় বর্ষপূর্তি সংখ্যা। পাঠকদের কাছে সেই সংখ্যাটির আকর্ষণীয়তার আগাম সংবাদ জানিয়ে তাঁদের শুভেচ্ছা ও পৃষ্ঠপোষকতার প্রার্থনায়, নববর্ষের শুভেচ্ছাসহ

-আলোক মিত্র

ছাব্বিশ বছর জেলখানায় ঃ বিনা অপরাধে!

এক নিরপরাধিনীর জীবনের সবচাইতে ভাল সময়ের ছাব্বিশটা বছর কেটে গেল কারা প্রাচীরের অন্তরালে! তার অপরাধ, সে একজনকে ভালবেসেছিল। পুরুষের বিশ্বাসঘাতকতা তাকে মানসিক দিক দিয়ে বিপর্যস্ত করে তুলেছিল। কিন্তু একি সমাজব্যবস্থা, এ কোন আমলাতন্ত্রের ভয়াবহ রূপ! বিশ্বাস হয় না, এমনই এক ঘটনার প্রতিবেদন।

ইরাদেবী, জেল-জীবনের পর

ইরা এবং অজয়ের প্রেম ভালবাসার সম্পর্কটা ছিল বহুদিনের, ইরা যখন পুরুলিয়া গভর্নমেন্ট হাইস্কুলের ছাত্রী তখন থেকে। অজয়দের বাড়িও ছিল পুরুলিয়ায় শরৎপল্লীতে। ঘটনাচক্রে পরবর্তীকালে দুই প্রেমিক-প্রেমিকা চাকরিও পেয়ে যায় একই অফিসে। পুরুলিয়াতেই পুলিশ বিভাগে কেরানির চাকরি। কম বয়সের ভালবাসা এসময় আরো গাঢ় হতে থাকে।

ইরার বাবা ছিলেন বাংলাদেশের খুলনা জেলার অধিবাসী। বাবা মারা যাবার পর ইরার মা আশা-দেবী বাচ্চাদের নিয়ে চলে এলেন কলকাতায়। সময়টা ছিল ১৯৫০-এর কিছু আগে। সঞ্চিত অর্থ দিয়ে আশাদেবী ভবানীপুরে বিজয় মুখার্জি লেনে একটি ছোট্ট বাড়ি কেনেন। এবং দুটি অ্যাম্বাসাডর কিনে সেগুলি ভাড়ায় দিয়ে জীবিকা নির্বাহের বন্দোবস্ত করেন।

সাত ভাইবোনের মধ্যে ইরা তৃতীয়। কলকাতায় সে যখন আসে, তার বয়স তখন পাঁচ। ইরার বড়দি মেরির বিয়ে হয় আসানসোলের মসজিদ বাড়ি লেনের বাসিন্দা ডাঃ অজিতকুমার বিষ্ণু মহাশয়ের সঙ্গে। দিদি জামাইবাবুর আন্তরিক ইচ্ছায় আশা দেবী ইরাকে ওদের হাতেই ছেড়ে দিলেন।

ডাঃ বিষ্ণু সরকারী রেডিয়োলজিস্ট ছিলেন। তিনি তখন দার্জিলিং-এ কর্মরত। ইরাকে দার্জিলিং-এর মহারানী গার্লস হাইস্কুলে ভর্তি করানো হয়। ডাঃ বিষ্ণু এরপর বদলি হয়ে এলেন কলকাতায়। ইরাও ভবানীপুরের বালিকা বিদ্যামন্দির-এ ভর্তি হল। পরবর্তী বদলিতে ডাঃ বিষ্ণু ২৪ পরগনা জেলায় চলে এলে ইরা তখন ভর্তি হল হাওড়া গার্লস হাইস্কুলে। তারপর ঐভাবেই জামাইবাবুর বদলির চাকরির ফলে ইরাও চলে এল পুরুলিয়ায়। ১৯৬১ সালে ইরা পুরুলিয়ার গভর্নমেন্ট হাইস্কুল থেকে খুব ভাল রেজাল্ট করে মাধ্যমিক পাশ করে।

জামাইবাবুর কথায় ইরা চাকরির জন্যও চেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকে। ইতিমধ্যে অজয়ের সঙ্গে

৮১ পৃষ্ঠায় দেখুন

পরিবারের স্বাস্থ্যের জন্যে বরদান
১ কিলো চকোলেট কমপ্লান
Complan
COMPLETE PLANNED FOOD
CHOCOLATE FLAVOUR
FREE!
Collect a ceramic mug with this pack.
No need to add milk
বিনামূল্যে!
Complan
৫০০ গ্রামের দুটিন চকোলেট
কমপ্লান কেনার বদলে,
১ কিলোর একটিন কিনুন আর
৪/- টাকা বাঁচান, সঙ্গে লাভ করুন
বিনামূল্যে একটি সেরামিকের মগ্ !
কমপ্লান-এ আছে আপনার
পরিবারের প্রতিদিনের প্রয়োজনীয়
খাদ্যগুণ ।
আজই কিনুন !
23
সুপরিকল্পিত মাত্রায়,
২৩টি একান্ত
প্রয়োজনীয় খাদ্যগুণ
কমপ্লান®
GX/58/254 BEN

মোহিত সেন

ভারতবর্ষের সুপরিচিত কমিউনিস্ট-ব্যক্তিত্ব মোহিত সেন কলকাতা থেকে পালিয়ে গিয়ে যেন হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছেন। ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনে একজন শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিত্ব হয়েও কেন এই বঙ্গসন্তান বঙ্গ-বামপন্থার কেন্দ্রপীঠ কলকাতা থেকে পালিয়ে থাকতে চান? কলকাতা-বিরাগ নিয়ে অনেক একান্ত ব্যক্তিগত কথা বলেছেন কমরেড মোহিত সেন।

মোহিত সেনের কলকাতা-বিরাগ

'আমার বাড়ি? হ্যাঁ, কলকাতা-তেই। যে কলকাতা আমাকে সব সময় ঘৃণা করেছে। যে মায়াবী শহর আমাকে কখনও পছন্দ করে নি। আমিও তার সস্তা অহংকার, স্বভাবকে কখনই তোয়াক্কা করিনি।' গত চল্লিশ বছর ধরে তিনি নিজের শহর কলকাতা থেকে দূরে। আর কলকাতার সেই ধূসর স্মৃতি আজও তাঁকে পিছু টানে। তাঁর শরীরের পেশীগুলিও জানে এ কেমন শহর, এ কোন মহাদেশ, বামপন্থী রাজনীতির কতগুলি শরীর এখানে আঁকা আছে—বোম্বাই, লণ্ডন, পিকিং, দিল্লি, হায়দ্রাবাদ, মাও সে তুং, চৌ এন লাই, অজয় ঘোষ, এস এ ডাংগে, রাজেশ্বর রাও, জানা অজানা আরও কত কি। কলকাতার সীমাহীন যন্ত্রণা, এখানে ওখানে আড্ডা গল্পের মধ্যেও সে সবের তিক্ত অভিজ্ঞতা তাঁকে যন্ত্রণাকাতর করে তোলে। উদাস করে তোলে। আর অতীতের স্মৃতিবিজড়িত কলকাতা যখন চোখ ওপরে তুলে তাঁকে জিজ্ঞাসা করে, 'মোহিত, আজকাল কোথায় তুমি?' তখন বিচিত্র এক আবেশের বশে তিনি বলেন, 'আমি যেখানেই থাকি তাতে তোমার কি? আমার পিছু ছাড়!' কলকাতা আবার তটস্থ মোহিতকে পালিয়ে যেতে দেখে। পালিয়ে যাওয়া ওই মানুষটির চোখে অনায়াসে কয়েকটি দৃশ্য ফুটে ওঠে। ধাক্কা দেয়। কলকাতার এক ক্লাস রুমে পড়াচ্ছেন বিষ্ণু দে। বাংলার প্রখ্যাত কবি বিষ্ণু দে, যাঁর স্নেহ আজও তাঁকে ভাবিয়ে তোলে।

বিষ্ণু দে আজ আর নেই। আগে কলকাতায় এলে তার সঙ্গে অবশ্যই দেখা করতেন মোহিতবাবু। দেশের বামপন্থী রাজনীতির শীর্ষস্থানীয় নেতা এই মোহিত সেনের শেকড় কিন্তু কলকাতাতেই। বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডে। বছর কয়েক অন্তর এখনও তিনি আসেন কলকাতায়, তাঁর পুরনো ভিটেয়। যেখানে তাঁর আনন্দমুখর শৈশবের দিনগুলি কেটেছিল এক সময়। শুধু সেইটুকুর জন্যই তাঁর মনে কলকাতার সমস্ত টানাপোড়েন শীতল মনে হয়, সমস্ত কোলাহল শীতল হয়ে আসে, আর জীবনের তামাম লেনদেন, রাগ অভিমান সব কিছুই মুক্ত হয়ে যায়। পাখির নীড়ের মত চোখ দুটি তুলে আস্তে আস্তে তবুও কলকাতা জিজ্ঞাসা করে—'তোমার কি মনে হচ্ছে আজও লোকেরা ওই চৌরাস্তায় তোমাকে প্রতিহত করার প্রতীক্ষায় নিজেদের অস্ত্রশস্ত্রের ধার পরখ করছে কমরেড মোহিত সেন?' বিতৃষ্ণায় ভরে ওঠেন তিনি।

মোহিত সেনের মুখে সেই বিতৃষ্ণা জড়িয়ে আসে, বলতে থাকেন, 'কলকাতাবাসীদের ভারতীয়আনা খুবই কম। হতে পারে এর মূলে দেশভাগের ব্যথা। সে তো গভীর কথা। সুভাষচন্দ্র বোসের অটোবায়োগ্রাফি পড়ুন, পড়ুন জওহরলাল নেহেরুরও। দুটোর মধ্যে ব্যবধান দেখবেন। সুভাষবাবু খুবই দেশভক্ত ছিলেন। কিন্তু সবার আগে তিনি বাঙালি। কলকাতায় প্রভিনসিয়ালিজ্‌মকে স্পষ্ট করার ভাবনা প্রকট। এর জন্য কলকাতা কেবল বাঙালি বানায়, ভারতীয় নয়।' কিন্তু সত্যি কি কলকাতায় ভারতীয়আনার ঘাটতি আছে? মোহিতবাবু কেন এমন বলেন? যে মানুষের শেকড় কলকাতায়, তাঁরই বা কেন কলকাতার প্রতি এমন মনোভাব? মোহিত সেন বলেন, 'বাঙলার যে মধ্যবিত্ত পরিবারে আমি জন্মাই সেখানে সেই পরিবেশের। ওরা আমাকে অকর্মণ্য বলতো। আড্ডা আর গল্পই আমার কাজ ছিল। বলতো, প্যারিস আর লণ্ডন নিয়েই যত কৌতূহল, কিন্তু দেশের প্রতি কোন নজর নেই।'

মোহিত সেন কি এক বিদ্রোহী বাঙালি, নাকি ভ্রান্ত বুদ্ধিজীবী? নাকি কলকাতায় তাঁর নিজস্ব সংস্কারের কোন জায়গা নেই, যিনি একসময় বালিগঞ্জের অলিগলিতে খেলতে খেলতে শৈশব কাটিয়েছেন, লা মার্টিনিয়ার স্কুল থেকে ক্রমে প্রেসিডেন্সিতে পড়াশুনা করেছেন। কমরেড মোহিত সেন হওয়ার মধ্যে কি করে তাঁর ফারাকটা এসে গেল?

মোহিত সেনের দাদা পূর্ণচন্দ্র সেন প্রথমে কলকাতায় বসবাস শুরু করেন। বালিগঞ্জে। পূর্ণচন্দ্র ছিলেন বাংলাদেশের চট্টগ্রামের আদি বাসিন্দা। রেঙ্গুনে অ্যাকাউনট্যান্ট জেনারেল পদে ছিলেন তিনি। পরে গোটা পরিবার নিয়ে চলে যান লণ্ডনে। মোহিতের বাবা অমরেন্দ্রনাথ সেন ১৯৩৮ থেকে '৫২ সাল পর্যন্ত কলকাতা হাইকোর্টের জর্জ ছিলেন। পড়াশুনা করেছিলেন লণ্ডনেই। বিয়েও ওখানে। কিন্তু রেঙ্গুন কিংবা লণ্ডনের জীবন পূর্ণচন্দ্রের ভাল না লাগায় এক সময় তিনি পরিবার নিয়ে চলে আসেন কলকাতায়। বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডে ঘর নেন। তখন থেকেই মোহিত সেনের পরিবার সেখানেই ছিলেন। পরে মোহিত সেনের বাবা জজ হলে তাঁরা হাঙ্গার ফোর্ড স্ট্রীটে উঠে আসেন। মোহিত পড়তেন লা মার্টিনিয়ারে। সেই সময় জাপানী হামলার গরম হাওয়া আর কলকাতায় দু'একটি বোমা ইতিউতি নিক্ষেপের

ফলে স্কুল বন্ধ হয়ে যায়। মোহিত কলকাতা থেকে চলে আসেন পুণায়। পুণায় সেই সময় সম্ভবত 'শ্রী শিবাজী মিলিটারি প্রিপেয়ার স্কুল' নামে একটি স্কুল ছিল। আজও আছে। ওখানেই কয়েক মাস পড়েন। তাঁর বড়দা বোম্বাই-এর একটা কোম্পানীতে চাকরি করতেন। সেজন্যই কয়েক মাস বাদে মোহিত বোম্বাই-এর 'সেন্ট মেরী স্কুল'-এ ভর্তি হন। ওখানে কয়েকদিন চক্কর দিয়ে আবার তিনি কলকাতায় ফিরে আসেন। পড়া শুরু করেন সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুলে। পরে প্রেসিডেন্সিতে ইতিহাসে বি-এ পাশ করেন। ওই সময় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার ছিলেন ডাঃ এম এন ব্যানার্জি। প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রিন্সিপাল ছিলেন প্রশান্ত চন্দ্র মহলানবীশ। প্রখ্যাত পরিসংখ্যানবিদ ছিলেন তিনি। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার যোজনা প্রস্তুতিতে তাঁর বড় অবদান ছিল।

কলেজ জীবন থেকেই মোহিত কমিউনিস্ট পার্টির রাজনীতিতে সক্রিয় হয়ে ওঠেন। তিনি বলেন, 'ওই সময় প্রেসিডেন্সি কলেজেই প্রথম এ আই এস এফ শাখার জন্ম। আমার বড়দা প্রতাপ চন্দ্র সেন তখন কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তেন। দাদার সহপাঠী ছিলেন ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত, রেণু চক্রবর্তী, মোহন কুমার মঙ্গলম এবং পার্বতী কৃষ্ণন প্রমুখ সাচ্চা কমিউনিস্টরা। দাদা অবশ্য কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য ছিলেন না। কিন্তু সহপাঠীদের সান্নিধ্যে কমিউনিস্ট আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। আমিও বড়দার সংস্পর্শে আসি। বাবা ছিলেন লিবারেল ডেমোক্রেটিক। তবে আমাদের কমিউনিস্ট হওয়ার ব্যাপারে কোনও আপত্তি ছিল না। এভাবে প্রায় ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত কলকাতায় কেটে যায়। বাবাও মৃত্যু অবধি কলকাতায় ছিলেন। ১৯৫৪ সালে বাবা মারা যান। তারপর মাও, ১৯৬২ সালে। মা-বাবার মৃত্যুর পর কলকাতার সঙ্গে সম্পর্ক প্রায় মুছে যায়।'

'১৯৪৮ সালে আমি কেমব্রিজে পড়ার জন্য লন্ডন যাই। ওখানে রজনী পাম দত্তের সঙ্গে পরিচয় হয়। দুইজনের মধ্যে ভাবধারার বেশ আদান প্রদান হয় বহুদিন। ততদিনে কমিউনিস্ট পার্টির পূর্ণ সদস্যপদ পেয়ে গেছিলাম। বিয়েও করি লন্ডনে। স্ত্রী হায়দ্রাবাদের। তেলেগুভাষী, সেও আমার সঙ্গে কেমব্রিজে পড়ত। ওর ছিল অংক। আমার বিষয় ছিল ইতিহাস। ১৯৫০ সালে বিয়ের পর কমিউনিস্ট পার্টি থেকে আমাকে চীনে পাঠানো হয়। চীনে পার্টি স্কুল চলছিল, পার্টি ইউনিভার্সিটিও বলা যায়। স্কুল ছিল পিকিং-এ। প্রিন্সিপাল ছিলেন লিউ শাও চি। আমি ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির ডকুমেন্ট নিয়ে ওখানে যাই। ওই সময় ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির বি টি রণদিভে ও এস এ ডাঙ্গের মধ্যে গোষ্ঠী দ্বন্দ্ব জাঁকিয়ে ওঠে। সে জন্যই 'ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি'র দলিল দস্তাবেজ বয়ে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব আমার ওপর পড়ে। চীন যাওয়ার ফলে মাও সে তুং-এর সঙ্গে আমার ভাব বিনিময়ের সৌভাগ্য হয়েছিল। পার্টি স্কুলে সপ্তাহে তিন চার দিনই মাও সে তুং ও চৌ এন লাই প্রমুখ আসতেন। তত্ত্ব ও তার প্রয়োগ নিয়ে তর্ক হত। মাও ছিলেন খুবই গম্ভীর ব্যক্তিত্বের মানুষ। অত্যন্ত মিতভাষীও। মাও-র 'চৌনিন্দা' পড়েই আমি প্রথম চীন ভাষা শিখি। লেখার ধার ছিল খুব তার। চীনা ভাষার প্রসারে মাও-র অবদান অনেক। মাও ইংরেজি জানতেন না। কিন্তু চৌ এন লাই ইংরেজি খুব ভালোই জানতেন। আমার দেওয়া দস্তাবেজ পড়ে মাও একদিন পার্টি স্কুলে আসেন। বললেন, 'আপনার লেখা পড়ে মনে হলো আপনারা চীনের রাস্তায় আসতে চান কিন্তু রুশ রাস্তায় চলে দিশি বন্দোবস্ত শুরু করেছেন। বস্তুত চীন বা রুশ রাস্তায় আপনাদের চলা ঠিক নয়। নিজের দেশের সমস্যা নিয়ে নিজেদের রাস্তায় চলুন।' ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত চীনে থাকার পর ভারতে ফিরে আসি। তখন পার্টির মহাসচিব কমরেড অজয় ঘোষ। এস এ ডাঙ্গে প্রমুখ পার্টির প্রথম সারির নেতারা আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব ভ্রান্তি কাটিয়ে ওঠার জন্য তখন উঠে পড়ে লেগেছেন।

ভারতে ফিরে প্রথমে যাই কলকাতায়। মা-

মাও ইংরেজি জানতেন না। কিন্তু চৌ এন লাই ইংরেজি খুব ভালোই জানতেন। আমার দেওয়া দস্তাবেজ পড়ে মাও একদিন পার্টি স্কুলে আসেন। বললেন, 'আপনার লেখা পড়ে মনে হলো আপনারা চীনের রাস্তায় আসতে চান।'

বাবার সঙ্গে দেখা করতে। তারপর হায়দ্রাবাদে স্ত্রীর কাছে। আমার স্ত্রী তখন ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা। কিন্তু হায়দ্রাবাদে বেশি দিন থাকা সম্ভব ছিল না। কেননা আমাকে পার্টির 'হোল টাইমার' করে নিয়েছিলেন কমরেড অজয় ঘোষ। দিল্লিতে পার্টির মাসিক পত্রিকা 'নিউ এজ' প্রকাশনার দায়িত্ব পড়ে আমার ওপর। দশ বছর আমি স্রেফ প্রুফ রিডিং-এর কাজ করি। বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে যোগাযোগও করতে হত। সেই সময় আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন অমর্ত্য সেন, বিপিন চন্দ্র এবং কে এন রাজ। কমরেড অজয় ঘোষ খুবই উৎসাহ যোগাতেন। তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন নেতা ছিলেন তিনি। প্রখর বিশ্লেষণ ক্ষমতাও। তবে তাঁর বড় বেশি ভুলো মন।

১৯৫৫ সালে অন্ধ্র প্রদেশের ভোটে পার্টির ব্যাপক পরাজয় ঘটলে পার্টির কার্যকলাপ নিয়ে সমালোচনার ঝড় ওঠে। জ্যোতি বসু, বি টি রনদিভে এবং হরকিষণ সিং সুরজিৎ প্রমুখ নেতারা তখন অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টিতেই ছিলেন। এদিকে অন্তর্দ্বন্দ্ব দিন দিন প্রকট হয়ে উঠছে। এরই মধ্যে ১৯৬২ সালে হঠাৎই কমরেড অজয় ঘোষের মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যু আমাকে খুবই আঘাত দেয়। ঠিক করি দিল্লি ছেড়ে হায়দ্রাবাদ চলে যাব। স্ত্রী ছিলেন হায়দ্রাবাদে। তাই হায়দ্রাবাদেই আমি পার্টির কাজ করতে থাকি। পরে ১৯৬৪-৬৫ নাগাদ কমরেড রাজেশ্বর রাও ও এস এ ডাঙ্গে আমাকে দিল্লিতে ডেকে নেন। সেই কাজ আবার শুরু হয়। পার্টির মহাসচিব রাজেশ্বর রাও সহযোগিতা করতে থাকেন। ১৯৬৬ সালে আমাকে পার্টির রাষ্ট্রীয় সদস্য করা হয়। ততদিনে কমিউনিস্ট পার্টির ভাগ হয়ে গেছে। ১৯৭৫-এ আমাকে পার্টির সেন্ট্রাল এক্সিকিউটিভ সদস্য করা হয়। সেন্ট্রাল স্কুলও খোলে। আমাকেই প্রিন্সিপাল করা হয় ওখানে। সেই সুবাদে 'কমিউনিজম অ্যান্ড দ্য থার্ড ওয়ার্ল্ড' সহ কয়েকটি বইও লিখি।

পরে যখন এমার্জেন্সি সমর্থন নিয়ে রাজেশ্বর রাও ও এস এ ডাঙ্গের মধ্যে তর্ক শুরু হয়, আমি এস এ ডাঙ্গেকে সমর্থন করি। কিন্তু পার্টি মেশিনারির ওপর রাজেশ্বর রাও-র প্রভুত্ব থাকায় ডাঙ্গের বিরোধিতা টিকল না। ১৯৮০ সালে পার্টি থেকে তাঁকে তাড়িয়ে দেওয়া হল। অবশ্য রাজেশ্বর রাও আমাকে পছন্দ করতেন, কেননা প্রথম থেকেই আমি তাঁর ব্যক্তিগত সহযোগী ছিলাম। তবুও ধীরে ধীরে মতভেদ বাড়তেই থাকে। ১৯৮৬ সাল থেকে আমি কমিউনিস্ট পার্টি থেকে সরে আসি। এরপরই শুরু হয় কমিউনিস্ট কো-অর্ডিনেশন সম্পর্কে জনদরদি বিচারধারা প্রসারের কাজ। এতে ছিলেন কমরেড এস এ ডাঙ্গে, বি পাতিয়ন এবং রোজা দেশপাণ্ডে প্রমুখ।'

কমিউনিস্ট পোশাক ছেড়ে মোহিত সেন এবার তাঁর পরিবারে নেমে এলেন। স্মৃতির পর্দায় জেগে ওঠে বাংলার প্রতি দুরন্ত নস্টালজিয়া। বললেন, 'আমার পরিবারে এখন বাংলা আর তেলেগুর মিশ্রণ। তবুও বাঙালি সংস্কৃতির ওপর একটু বেশি নির্ভর করি। রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনি। বাংলা সিনেমাও দেখি। এমন কি সত্যজিৎ রায় ও মৃণাল সেন আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, সমরেশ বসু আর মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্য আমার মনের সাহিত্য রসের আধারটিকে আজও জাগিয়ে রেখেছে।'

আস্তে আস্তে মোহিত সেনের স্মৃতিতে ফুটে ওঠে কলকাতার ছবি। বালিগঞ্জ, হাঙ্গারফোর্ড স্ট্রিট, কলেজ স্ট্রিট..., তবু কলকাতা থেকে পালিয়ে বেড়ান তিনি। দূরে—আরও দূরে কোথাও। তখন পাখীর নীড়ের মত কলকাতা তার অলস দুটি চোখ ওপরে তুলে জিজ্ঞাসা করে—'বলো, কে কাকে ভালবাসে না—কলকাতাকে তুমি, না তোমাকে কলকাতা? সত্যি কি মোহিত কলকাতার কিছুই ভালো লাগে না তোমার?' মোহিত সেনের পালিয়ে বেড়ানো মন আবার থমকে দাঁড়ায়, স্মৃতি বিজড়িত মুখ থেকে বেরিয়ে আসে, 'হ্যাঁ লাগে, কলকাতার লেডিকেনি ভালো লাগে!'

বিকাশ কুমার ঝা

ছবি: দীপক কুমার

আজ রাতে নিভিও নাকো বাতি

আঁধারেতে আবেশের
রঙ যাবে হারিয়ে

কোহিনুর ফিয়েস্তা

লাল, সবুজ, নীল, বেগুণী বা কালোর বর্ণালী বাহারে পাওয়া যাচ্ছে।

 উৎপাদন

দলবীর সিংহ

পাঞ্জাব পুলিশের ভুল ও তার মাশুল

১৯ আগস্ট পাতিয়ালার খোদ সিভিল লাইন্স থানায় ঘটে গেল সেই মারাত্মক ঘটনা। পাঞ্জাব পুলিশ কৃত ভুলের মাশুল গুনতে এস·এস·পি· শীতল দাস এবং এস পি বরাড়ের শরীর লুটিয়ে পড়ল দলবীর-এর গুলিতে। কে এই দলবীর? পাঞ্জাব পুলিশের সঙ্গে কি তার সম্পর্ক? সমস্যা জর্জরিত পাঞ্জাবে শান্তি ফেরাতে সদা ব্যস্ত পাঞ্জাব-পুলিশ মহলে গা মিলিয়ে আছে আরো এমনি কত দলবীর? এসবের উত্তর নিয়েই এই বিশেষ আলোকপাত।

এস·পি·বলদেও সিংহ বরাড়

অপরাধচক্রের মক্ষীরাণী উষা

পাতিয়ালার সিভিল লাইন্স থানার মেন গেটের পাশে এই অফিস আকারে বেশ বড়। একটা বড় টেবিল, ছটি চেয়ার। টেবিলের পাশে থানা ইনচার্জের চেয়ারে বসে ছিলেন এস·এস·পি শীতল দাস। তাঁর রিভলবার টেবিলের উপর রাখা। টেবিলের সামনে তিনটি চেয়ারের প্রথমটিতে থানা ইনচার্জ ইন্সপেকটর হরদীপ সিংহ, মাঝের চেয়ারটি খালি এবং তৃতীয়টিতে এস·পি (গুপ্তচর) বলদেও সিংহ বরাড় বসে ছিলেন।

বেলা সওয়া এগারোটা নাগাদ ইন্সপেকটর গ্রেওয়াল হাজির হন। দলবীরের তিনজন গানম্যান গুরতেজ সিংহ, বিক্রমজীত সিংহ এবং পরমজীত সিংহকে সেখানে আনা হয়েছে। এদের কাছে ইন্সপেকটর গ্রেওয়ালের বিশেষ কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করার ছিল। থানা ইনচার্জের রুম থেকে প্রায় ৫০ মিটার দূরে একটা ঘর। এই ঘরেই মিঃ গ্রেওয়াল ওই তিনজনকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেন।

জিজ্ঞাসাবাদের ফলে গানম্যানেরা জানায় যে তারা দলবীরের সঙ্গে জম্মু থেকে পাঁচজনকে উঠিয়ে এনেছিল। তাদের দু'জনকে বলাচওরে নামিয়ে দিয়ে বাকি তিনজনকে পাতিয়ালায় নিয়ে এসেছিল। গুরুদ্বারের পাশে দলবীরের ভাড়া করা ঘরে তাদের দশ দিন রাখা হয়। তারপর দলবীর তাদের চণ্ডীগড় নিয়ে যায়। এরপরে তাদের কি করা হয়েছে গানম্যানেরা তা জানে না। গানম্যানেরা দলবীরকে এই কাজে সাহায্য করায় তারা দু'হাজার করে টাকা এবং জামাকাপড় পেয়েছিল।

জিজ্ঞাসাবাদের মধ্যে ইন্সপেকটর গ্রেওয়ালকে এস-এস-পি ডেকে পাঠালে তিনি থানা ইনচার্জের অফিসে চলে আসেন। ততক্ষণে দলবীরও সেখানে পৌঁছে গেছে। এস·পি· বরাড় ও ইন্সপেকটর হরদীপ সিংহের মাঝের চেয়ারে বসেছিল দলবীর। গ্রেওয়ালকে দেখেই সে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় এবং আঙুল দিয়ে তাঁকে দেখিয়ে সে এস·এস·পিকে উদ্দেশ্য করে বলে 'স্যার আপনি আমার গান-ম্যানদেরকে জোর করে মিথ্যা বয়ান নিতে বারণ করুন।'

একথা শুনে গ্রেওয়াল দলবীরের দিকে ঘুরে তাকিয়ে বলেন 'দলবীর আমি তোমার লোকেদের ওপর এখনো কোন জোর করিনি। তবে তারা সত্যকে লুকোনোর চেষ্টা করলে তা করতে বাধ্য হব।'

'জোর তোমার উপরও হতে পারে দলবীর, যদি

তুমিও সত্যকে চাপা দেওয়ার চেষ্টা কর।' –পাশে বসা ইন্সপেকটর হরদীপ সিংহ বলে ওঠেন। একথা শুনে দলবীরের চোয়াল শক্ত হয়ে ওঠে। সে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে হরদীপকে দেখতে থাকে। তার এই পরিবর্তন দেখে শীতল দাস বলেন 'নিজের চেয়ারে আরাম করে বস। শান্ত হও। আমাদের জিজ্ঞাসাবাদে সাহায্য কর। আজ পাঞ্জাবের সর্বত্র আতঙ্কবাদের সমস্যা। খামোকা আমাদের এবং তোমার সময় নষ্ট কোরো না।'

এস·এস·পি–র কথা শুনে দলবীর কিছুটা শান্ত হয়। চুপচাপ বসে থাকে। এস·পি· বরাড় বলেন, এস·পিকে সামলানোর জন্য এগিয়ে যান। কিন্তু শীতল দাস ততক্ষণে মেঝেতে পড়ে গেছেন। গ্রেওয়াল তাঁকে জড়িয়ে ধরে তুলতে গিয়ে দেখেন এস·পি· বরাড়ও নিজের চেয়ার থেকে গড়িয়ে পড়েছেন।

স্পষ্টতই দলবীর অস্ত্র সমর্পণের ছলে গুলি চালিয়েছে। কামরার এককোণে রক্তে মাখামাখি হয়ে পড়ে ছিল সেও। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ ভ্যানে করে হাসপাতালে নিয়ে যায় তাদের। হাসপাতাল তিনজনকেই মৃত ঘোষণা করল।

৩৫ বছর বয়সী দলবীর থাকত অমৃতসরে।

পাতিয়ালার এস·এস·পি·

এস·এস·পি· শীতল দাস

'তুমি এখনও আমাদের সাহায্য করবে না পণ করে রয়েছো! আবার তুমি বলছো তোমার লোকেদের জোর করা হচ্ছে। কিন্তু এখন তোমার উপরও ওই করা হবে।' একথা বলে তিনি গ্রেওয়ালকে নির্দেশ দেন–গানম্যানদেরকে সি·আই·এ–তে (পাঞ্জাবের গোয়েন্দা দপ্তরে) নিয়ে যেতে। দলবীরকে সেখানে তিনি নিয়ে যাবেন। ইন্সপেকটর গ্রেওয়াল পেছন ফিরে দরজা পর্যন্ত যেতে যেতে শুনতে পেলেন এস·এস·পি· বরাড় ইন্সপেকটর হরদীপকে বলছেন দলবীরকে ডিসআর্ম (অস্ত্রহীন) করতে। গ্রেওয়াল চলে যাওয়ার পর এস·পির কথা শুনে দলবীর বলে ওঠে, 'দাঁড়ান, আমি নিজেই আমার রিভলবার বার করে দিচ্ছি।'

হঠাৎই গ্রেওয়াল নিজের রুমে ঢোকার সময় ইন্সপেক্টর রুমে গুলির আওয়াজ শুনে পেছন ফিরে দাঁড়ান এবং পেছনে ছুটে আসেন। মাঝপথে একজন সিপাইয়ের মুখে শোনেন দলবীর এস·পি·কে গুলি করেছে। তিনি দ্রুত সেখানে পৌঁছালে দেখতে পান এস·এস·পি শীতল দাস ডান হাতে রিভলবার এবং বাঁ হাতে নিজের বুকের ছাতি চেপে আছেন বুকের উপর হাত থাকা সত্ত্বেও রক্তে তার জামা কাপড় ভেসে যাচ্ছে। গ্রেওয়াল দ্রুত সে নাম করা কবাডি খেলোয়াড়। খেলার জন্যই সে ১৯৭৯ সালে পাঞ্জাব পুলিশে চাকরী পায় এবং অমৃতসরেই তার পোস্টিং হয়। পুলিশে চাকরী পাওয়ার কিছু দিনের মধ্যেই অপরাধজনক কাজকর্মের অপরাধে ১৯৮৩তে অজনালা পুলিশ স্টেশনে ভারতীয় দণ্ডবিধি ৩০৭ ধারায় তার বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের হয়। এছাড়া পুলিশ অফিসারদের কাছে দলবীরের বিরুদ্ধে বেশ কিছু খবর ইতিমধ্যে পৌঁছোতে শুরু করেছিল। এই সমস্ত কারণে ১৯৮৪তে দলবীরকে চাকরী থেকে বরখাস্ত করা হয়। এসময় আদালতে তার নামে মোকদ্দমাও চলতে থাকে। কিন্তু প্রমাণের অভাবে পরে তাকে মুক্তি দেওয়া হলেও তাকে আর পুলিশের চাকরীতে ফিরিয়ে নেওয়া হয় না।

অমৃতসরেই ঐসময় দলবীরের যোগাযোগ হয় উষা রাণীর সঙ্গে। উষা রাণী অমৃতসরের অপরাধ চক্রের সঙ্গে জড়িত ছিল। ১৯৬৮তে নাভাল অফিসার বিজয় কুমারের সঙ্গে তার বিয়ে হয়। বিয়ের পর স্বামীস্ত্রীর মধ্যে অশান্তির কারণে উষা এরপর বিজয় কুমারকে ছেড়ে অমৃতসরে একাই থাকত। দলবীরের সঙ্গে আন্তরিকতা ক্রমশ গাঢ় হলে ১৯৮৩তে দলবীর উষা রাণীর বাড়ির কিছুটা ভাড়া নেয়। এসময় উষা রাণী অমৃতসরের অপরাধজগতের মক্ষীরাণী হয়ে ওঠে। তার সাহায্যেই দলবীর অপরাধ জগতের কুখ্যাত হরমিন্দর সিংহ সন্ধু, উপকার সিংহ সন্ধু, অমরজীত সিংহ চাওলা, হরজিন্দর সিংহ জিন্দা এবং রণজিত সিংহ রানার সঙ্গে পরিচিত হয়। শিখ উগ্রপন্থীদের সঙ্গে তার ওঠাবসা নিত্যনৈমিত্তিক হয়ে ওঠে। চাকরীর চিন্তা দলবীরের ছিল না এরপর আর।

আতঙ্কবাদীদেরকে শায়েস্তা করার জন্য পাঞ্জাব পুলিশ এসময় এক কৌশল অবলম্বন করে যে আতঙ্কবাদীদের গ্রুপের ভেতরের কাউকে কৌশলে পুলিশে চাকরী দিয়ে তাকে দিয়ে তাদের চক্রের অন্যান্যদের ধরা। কিন্তু এ কাজের জন্য বুদ্ধিমত্তার প্রয়োজন। এরপর পুলিশের একজন মানুষকে দলবীরের কাছে পাঠানো হয়। সে কৌশলে তাকে পরামর্শ দেয় যে আদালত তাকে যখন অপরাধী প্রমাণ করতে পারেনি–এখন সে পুনর্নিয়োগের জন্য পুলিশের উচ্চ আধিকারিকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারে। দলবীর এই ক্লেপ পেলে এবং এই পরামর্শ অনুযায়ী তার একটা আবেদনপত্র পুলিশের ডিরেকটর জেনারেল রিবেইরোর কাছে পাঠালে ১৯৮৭ সালে মার্চ মাসে তাকে চাকরীতে পুনর্নিয়োগ করা হয়। পুলিশ অফিসারেরা তাকে এরপর বলেন 'আমরা জানি কিছু অপরাধী ও আতঙ্কবাদীর সঙ্গে তোমার সম্পর্ক আছে। এও জানি পুলিশে চাকরী করে তুমি অনেক ভাল জীবন যাপন করতে পারবে, যা তুমি অপরাধী জীবনে থেকে পারতে না। আর এটা দেশেরও কাজ। আতঙ্কবাদীদের চলা ফেরা, আস্তানারও খবর তুমি জানো। আমাদের কথা মত তুমি এদের বিরুদ্ধে পুলিশকে সাহায্য কর। তাহলে চাকরীতে প্রমোশনও পেয়ে যাবে তাড়াতাড়ি।' বিভিন্ন চিন্তা ভাবনার পর দলবীর এই প্রস্তাবে রাজী হয়ে যায়। পাতিয়ালায় তার পোস্টিং হলে সে আতঙ্কবাদীদের নির্মূল করার প্রতিজ্ঞা নেয়। সে এমন কৌশলে তার

এবার পশম, সিল্ক, যাবতীয় দামী কাপড় ধোয়ার জন্যে আনুন ইজী
Godrej
Ezee
SUPER LIQUID DETERGENT FOR FINE GARMENTS
কারণ, পশম, সিল্ক, সিন্থেটিক ইত্যাদি দামী জামাকাপড় বাড়ীতেই পুরোপুরিভাবে পরিষ্কার করে ধোয়ার জন্যে ইজী সুপার লিকুইড ডিটারজেন্ট বিশেষ ফর্মুলায় তৈরী। এর কাঁওশানার জামাকাপড় নরম আর নতুনের মত সুন্দর রাখে!
আর জানেন তো — এটি পয়সাও বাঁচায় দারুণ!
মাত্র একটি ১৯ টাকা* দামের ৫০০ গ্রাম প্যাক দিয়ে ৫০ খানা শাড়ী বা ১০০টা পশমের জামা কিম্বা ১৫০টা শার্ট পর্যন্ত ধোয়া যায়।
ড্রাই ক্লীনারে একখানা সিল্কের শাড়ী ধোয়ার যা বিল হয় — তার সঙ্গে তুলনা করে দেখুন এতে কত পয়সা বাঁচে!
* স্থানীয় কর আলাদা।
বিক্রয়ব্যবস্থায়: গোদরেজ

অপারেশন শুরু করে সে উমা বা তার অন্য সঙ্গীদের সন্দেহ করেনি। অমৃতসরের কাছে তরন-তারণে দলবীর এক প্রথম শ্রেণীর আতঙ্কবাদী গুরমীত সিংহকে সংঘর্ষে নিহত করে এবং পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাস থেকে একজন আতঙ্কবাদী নেতা চরনজীতকে গ্রেপ্তার করিয়ে দেয়। এছাড়া ২য় শ্রেণীর আতঙ্কবাদী বলবিন্দর সিংহ ওরফে বিল্লাকে ও হরমিন্দর সিংহ বাপ্টিকে সে গ্রেপ্তার করায়। এরপর দলবীর মোহালি থেকে গুরুবচন সিংহকে গ্রেপ্তার করায় যে কিনা একাধিক হত্যা ও ডাকাতির অপরাধে অভিযুক্ত ছিল। গুরুবচন সিংহকে গ্রেপ্তার করার সময় তার কাছ থেকে দলবীর ব্যাঙ্ক ডাকাতির ৪০,০০০ টাকা, তিনটি ৩৮ রিভলবার, ও ২টি স্টেনগান উদ্ধার করে। এভাবে নিজের পরিশ্রমের সাফল্যে দলবীরকে পুলিশের সাধারণ জওয়ান থেকে হাবিলদার তারপর সহায়ক উপ নিরীক্ষক (এ এস আই) রূপে প্রমোশন দেওয়া হয়। এবং খুব তাড়াতাড়ি তাকে ইনস্পেকটরের প্রমোশনও দেওয়ার লোভও দেখানো হয়। এদিকে কিছু আতঙ্কবাদী একবার হঠাৎই তার উপর আক্রমণ করে। দলবীর গুরুতর আহত হয়ে হসপিটালে ভর্তি হয়।

উমা দলবীরের উপর অসন্তুষ্ট হয়ে তার বিরুদ্ধে বদলা নেবার জন্যই তার সমস্ত গোপন অপরাধের খবর পুলিশের ডি জির কাছে পাঠিয়ে দেয়। সেইসঙ্গে পাতিয়ালা, অমৃতসর, চণ্ডীগড় সহ বিভিন্ন শহরের ব্যাঙ্কে দলবীরের আটটি গোপন এ্যাকাউন্ট নম্বরও জানিয়ে দেয়।

ফেব্রুয়ারি '৮৮তে চণ্ডীগড়ে গোলাপ উৎসব উদ্বোধন করতে আসা রাজ্যপাল সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায়কে খুন করার জন্য এক কুখ্যাত আতঙ্কবাদী সুরিন্দর সিংহ ওরফে কে·সি· শর্মা চণ্ডীগড়ে আসে। সেই সকালেই লোকাল বাস স্ট্যান্ডে প্রকাশ্য দিনের আলোয় দলবীর তাকে গুলি করে হত্যা করে। এরপর থেকে দলবীর আর পেছন ফিরে তাকায়নি। উইপন্থীরা তাকে চিনে ফেলায় তার সুরক্ষা জোরদার হয়। এ সময় তাকে দুটি স্টেনগান, দুটি এস এল আর এবং দুটি এ·কে· ৪৭ চাইনিস এসল্ট রাইফেল সহ পাঁচজন গানম্যানও দেওয়া হয়। একই সঙ্গে একটা জীপ ছাড়া একটা মারুতি জিপ্সি ও একটা এ্যাম্বাসাডার তাকে ব্যবহারের জন্য দেওয়া হয়। তার সম্পর্কে এও শোনা যায় যে তার গাড়িতে বিভিন্ন নাম্বারের প্লেট থাকত তার চলাফেরার গোপনীয়তার জন্য।

একজন সামান্য এ·এস·আই হয়েও দলবীর প্রতিপত্তিতে কোনও বড় পুলিশ অফিসারের থেকে কম ছিল না। শুধু পাতিয়ালার পরিবর্তে সারা পাঞ্জাবই তার কর্মক্ষেত্রে পরিণত হয়েছিল এরপর। আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে সে সর্বত্র বিচরণ করে বেড়াত। তার দিকে চোখ তুলে তাকাবার সাহসও কারো ছিল না। উমাও পাতিয়ালা ছেড়ে চণ্ডীগড়ে এসে বসবাস শুরু করেছিল। দলবীরের সঙ্গে তার

রাজ্যপালের পরামর্শদাতা রিবেইরো

পুনরায় যোগাযোগ হয়ে যায়। ইতিমধ্যে শুধু উমার মেলামেশায় সন্তুষ্ট না হয়ে দলবীর পাতিয়ালা ও চণ্ডীগড়ে একাধিক মহিলার সঙ্গে মেলামেশা শুরু করে। এই সব শহরে বিভিন্ন বাড়িও ভাড়া করেছিল সে। এই সময় থেকেই দলবীর নিজের মূল উদ্দেশ্য থেকে সরে যায়। তার মধ্যে পুনরায় অপরাধ প্রবণতা জেগে ওঠে। নিজের ক্ষমতা দেখানোর জন্য ছোটি খাটো অপরাধ তো সে করতে শুরুই করেছিল এসময় আরো কিছু বড় অপরাধের মধ্যে সে ঝুঁকে যায়।

দলবীর চণ্ডীগড়ের সেক্টর ১৭এর 'স্টাইলো টেলার্স'–এর মালিক ২৫ বছর বয়সী সাগীর আহমদকে ডি·আই·জি· সাহেবের কাপড়ের মাপ নেওয়ার মিথ্যা কথা বলে প্রকাশ্যে অপহরণ করে আনে। এবং তার উপর অকথ্য অত্যাচার শুরু করে। দলবীরের মতে সাগীরের কাছে ৪০টি রিভলবার আছে তার সন্ধানের জন্যই তাকে এভাবে অত্যাচার করা হয়। বাস্তবিক সাগীর রিভলবার সম্পর্কে কিছুই জানতো না। সাগীরের কাছ থেকে কোন সন্ধান না পেয়ে দলবীর তাকে সিভিল লাইন্স থানায় নিয়ে যায়। এবং বলে যে তার কাছ থেকে তিনটি রিভলবার উদ্ধার করা হয়েছে। বলে থানা ইনচার্জের টেবিলে তিনটি রিভলবার রেখে দেয়।

সাগীরের বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনের ২৫। ২৭।৫৪ ও ৫৯ এবং ভারতীয় দণ্ডবিধি ৩৯২ ধারা অনুযায়ী মামলা দায়ের করা হয়। সাগীরের বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনের একটি মামলাও দায়ের করা হয় এবং তাকে হাজতে রাখা হয়। এদিকে চণ্ডীগড়ে মুসলিম ওয়েলফেয়ার সোসাইটি এবং টেলার মাস্টার এ্যাসোসিয়েশান সাগীর অপহরণের জন্য চণ্ডীগড়ে কেন্দ্রিয় পুলিশ স্টেশনে মামলা দায়ের করে। মামলার অনুসন্ধানের জন্য সোসাইটি ও এ্যাসোসিয়েশান প্রধানমন্ত্রীর কাছে পর্যন্ত আবেদন করে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের নির্দেশে পাঞ্জাব পুলিশের একজন উচ্চপদস্থ অফিসারকে এই মামলার অনুসন্ধানের জন্য পাতিয়ালায় পাঠানো হয়। তিনি সাগীরকে নির্দোষ দেখে মুক্ত করিয়ে দেন কিন্তু একটি অন্য রহস্য উদ্ঘাটন করে দেন যে দলবীর অন্য একজন দর্জির কাছ থেকে ৫০,০০০ টাকা নিয়ে তারই কথামত সাগীরকে অপহরণ করে শারীরিক যন্ত্রণা দিয়েছে এবং মিথ্যে মামলায় তাকে জড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

এ ঘটনার এক মাস আগের কথা। চণ্ডীগড়ের এক কুখ্যাত সমাজবিরোধী হরভজন সিংহ, জম্মুর ধর্ম সিংহ সহ কিছু সমাজবিরোধীর কাছে ৪৫ লাখ টাকা পেত। কিন্তু ধর্ম সিংহ সমস্ত অপরাধের রাস্তা ছেড়ে দিয়েছিল। হরভজনের ধারণা হয় ধর্ম সিংহ ৪৫ লাখ টাকা আত্মসাৎ করার জন্য এই অভিনয় করছে। সে দলবীরের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাকে সাত লাখ টাকা ফি হিসাবে দেবে বলে। দলবীর এই সাত লাখ টাকার জন্য ধর্ম সিংহকে না পেয়ে তার তিনটি ছেলে ও অন্য দু'জন সমাজবিরোধীকে তুলে আনে। এবং হরভজন সিংহের টাকা আদায় করে দেয়। ঐ পাঁচজনকে তুলে এনে দলবীর চণ্ডীগড়ে উমার বাড়িতে তাদের রাখে। এবং উমার সহায়তায়–ই সেই টাকা আদায় করে। পরে সাত লাখ টাকা দলবীর পেয়ে গেলে উমা তা থেকে সাড়ে তিন লাখ টাকা দাবি করে। কিন্তু দলবীর তাকে মাত্র এক লাখ টাকা দেয়। এর পরেই উমা দলবীরের উপর অসন্তুষ্ট হয়ে তার বিরুদ্ধে বদলা নেবার জন্যই তার সমস্ত গোপন অপরাধের খবর পুলিশের ডি জির কাছে পাঠিয়ে দেয়। সেইসঙ্গে পাতিয়ালা, অমৃতসর, চণ্ডীগড় সহ বিভিন্ন শহরের ব্যাঙ্কে দলবীরের আটটি গোপন এ্যাকাউন্ট নম্বরও জানিয়ে দেয়।

পাঞ্জাব পুলিশের আই·জি· বীরেন্দ্র নারায়ণ সিংহ দলবীরের এই সব অপকর্মের ব্যাপারে রাজ্যপালের পরামর্শ দাতা রিবেইরোর সঙ্গে কথা বলেন। রিবেইরোর কাছে দলবীরের সম্পর্কে বিভিন্ন অপরাধমূলক কাজকর্মের খবর আগে থেকেই আসছিল। এর মাধ্যমে তিনি দলবীরের সম্পর্কে গোপন তথ্য যা সংগ্রহ করেছিলেন তা থেকে জানতে

পারেন যে সে খুব তাড়াতাড়ি কিছু পুলিশের উচ্চ অফিসারদের খুনের ষড়যন্ত্র করছে।

এসময় দলবীর আত্মরক্ষার স্বার্থে আতঙ্কবাদীদের সঙ্গে একটা গোপন সমঝোতা করে যে সমস্ত পুলিশ অফিসারদের তার গুলির নিশানা করে রেখেছিল তার মধ্যে ছিলেন পুলিশ ইন্সপেক্টর সুরজিৎ সিংহ গ্রেওয়াল এবং ডি·আই·জি· আর ভগত। শ্রী ভগত দলবীরের বিরুদ্ধে অনুসন্ধান করছিলেন আর গ্রেওয়ালের অধীনে ছিল দলবীর সম্বন্ধে সরাসরি খোঁজখবর করা।

চাঁদা অপহরণ, এবং সমাজবিরোধী পদে জেম্মু থেকে পাঁচ ব্যক্তিকে অপহরণে দলবীরকে দোষী করা হয়। শ্রী রিবেইরো পাতিয়ালার এস·এস·পি শীতল দাসকে নির্দেশ দিয়েছিলেন দলবীরকে বরখাস্ত করার। ১৩ আগস্ট ১৯৮৮ দলবীরকে বরখাস্ত করা হয়। তার কাছ থেকে সব অস্ত্রশস্ত্র ফেরৎ নেওয়া হয়। তার পাঁচজন গানম্যানের মধ্যে গুরুতেজ, বিক্রমজীত এবং পরমজীতকে গ্রেপ্তার করা হয়। বাকি দু'জন আত্মগোপন করে। সমস্ত অস্ত্র নেওয়া হলেও দলবীরের জীবনও বিপদাপন্ন থাকায় তার সার্ভিস রিভলবার তখনও তার কাছে ছিল।

এতদিন প্রচণ্ড স্বচ্ছল ও ক্ষমতাসম্পন্ন জীবনযাপন করছিল দলবীর। কিন্তু এসময় তার সমস্ত সুবিধা বন্ধ করে তাকে একজন অপরাধীর চোখে দেখা হচ্ছিল। এমতাবস্থায় দলবীরও মানসিকভাবে অনেক দুর্বল হয়ে পড়ে। নিজে নিজে বিভিন্ন চিন্তা ভাবনার পর ১৮ আগস্ট সন্ধ্যাবেলা সে এস·এস·পি শীতল দাসকে টেলিফোন করে। এক সময় শীতল দাসের সঙ্গে তার খুব আন্তরিকতা ছিল। দলবীরকে শীতল দাস বলেন, "আগামী কাল তুমি এগার-সাড়ে এগারোটার সময় সিভিল লাইন্স থানায় এস এবং পুলিশকে সব কিছু খোলাখুলি জানিয়ে দাও। হয়তো তোমাকে বাঁচানো যাবে।"

শ্রী রিবেইরো দলবীর সম্পর্কে এক গোপন খবর পান যে সে তার সমস্ত সম্পত্তি বিক্রী করে বিদেশে চলে যাওয়ার চেষ্টায় আছে। তিনি এক গোপন আদেশও দেন এস·পি· বরাড়কে যে, দলবীরকে জিজ্ঞাসাবাদের আগে তার সার্ভিস রিভলবার ফেরত নিতে। এবং জিজ্ঞাসাবাদের পর রাষ্ট্রীয় সুরক্ষা অধিনিয়মে (নাসায়) তাকে গ্রেপ্তার করতে। তাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য পাঞ্জাব পুলিশের (গোয়েন্দা) দপ্তরের ইনচার্জ সুরজিত সিং গ্রেওয়ালকেও সেখানে আনানো হয়েছিল।

দলবীর সব খবর এভাবে জানতো না। তবে ভেতরে ভেতরে সে আশঙ্কায় ভুগে ছিল। সেদিন রাতে সে তার পুরনো প্রেমিকা কুলদীপ কাউরের সঙ্গে রাত কাটায়। কথায় কথায় সে তার আশঙ্কা প্রকাশও করে ফেলে। 'হয়তো তোমার সঙ্গে এটাই শেষ দেখা।' পরদিন সাড়ে এগারোটায় পুলিশ স্টেশনে পৌঁছে যায় দলবীর। প্রায় একঘণ্টা জিজ্ঞাসাবাদের পর এস·পি· বরাড় যখন ইন্সপেক্টর হরদীপ সিংহকে বলেন দলবীরকে ডিসআর্ম করার জন্য তখন দলবীর ভেতর থেকে কেঁপে ওঠে। নিজের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অনিশ্চিত বোধ করে সে নিজেই নিজের রিভলবার জমা দেওয়ার কথা বলে। রিভলবার বের করে টেবিলে রাখার সময় এক ভয়ানক সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে সে। নিজের রিভলবার রেখে টেবিলে রাখা শীতল দাসের রিভলবার তুলে নেয় এবং মিঃ বরাড়ের উপর গুলিবর্ষণ শুরু করে। হতচকিত শীতল দাস মুহূর্তে দলবীরের রিভলবার তুলে তাকে গুলি করেন। দলবীর পড়ে গিয়ে শীতল দাসকেও গুলিতে মৃত্যুর কোলে শুইয়ে দেয়।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই এই কাণ্ড হয়ে যায়। খবর পেয়ে তৎক্ষণাৎ পুলিশের অফিসারেরা ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন। এই ভয়ানক খবর সারা

ইন্সপেক্টর গ্রেওয়াল

শহরে ছড়িয়ে পড়ে। সারা পাঞ্জাব এই খবরে স্তব্ধ হয়ে যায়। ঘটনার দিনই খালিস্তান লিবারেশান ফোর্সের অবতার সিং ব্রহ্মা এবং লেফটেন্যান্ট গুরুবাহি সিংহ বুধসিংওয়ালা এক প্রেস বিবৃতিতে এস·এস·পি· শীতল দাস ও এস·পি· বরাড়ের মৃত্যুর দায় নিজেদের কাঁধে নেয় এবং সেই সঙ্গে ইন্সপেক্টর গ্রেওয়ালকেও হুমকি দেয়।

এই হত্যাকাণ্ডে ইন্সপেক্টর হরদীপ সিংহের বয়ান অনুযায়ী সিভিল লাইন্স পুলিশ স্টেশনে কেস নম্বর ১৪৭, তারিখ ১৯·৮·৮৮তে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ ধারা, অস্ত্র অধিনিয়ম ধারা ২৫, ৫৪ এবং ৫৯ এবং আতঙ্কবাদ নিরোধক আইন ৩।৪ ধারায় প্রথম রিপোর্ট দায়ের করা হয়।

২০ আগস্ট অমৃতসরের পুলিশ অধিক্ষক জে·পি· বিরদীকে পাতিয়ালার সিনিয়ার পুলিশ অধিক্ষক রূপে নিযুক্ত করা হয়। তিনি এই কেস নিজের হাতে নেন। এবং বিভিন্ন অনুসন্ধানের পর সিদ্ধান্ত নেন যে ঊষা রাণীকে গ্রেপ্তার করলে এই হত্যাকাণ্ডের মূলে পৌঁছানো যাবে। কিন্তু চেষ্টা করেও ঊষাকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয় নি। সে আত্মগোপন করে থাকায় আজও তার ঠিকানা পুলিশ উদ্ধার করতে ব্যর্থ।

এই হত্যাকাণ্ডকে পাঞ্জাব পুলিশের হঠকারী সিদ্ধান্তের কুফলও বলা যায়। একজন সমাজবিরোধী আতঙ্কবাদীকে পুলিশে চাকরী দিয়ে তাকে দিয়ে আতঙ্কবাদীদের কাজকর্ম বন্ধ করার এই সিদ্ধান্ত পুলিশী পদ্ধতিতে প্রচলিত হলেও দলবীরকে অত্যধিক সুযোগ সুবিধা দেওয়া ও বেশি বিশ্বাস করার পরিণামই এই হত্যাকাণ্ড। অভিযোগ পাঞ্জাবে প্রায় ১১০ জন পুলিশ কর্মচারী আছে যারা কোন না কোনভাবে আতঙ্কবাদীদের সঙ্গে যুক্ত বা তাদেরকে সহযোগিতা করে থাকে। এমন কর্মচারীদের বিরুদ্ধে এখন অবশ্য বিভাগীয়

রিভলবার বের করে টেবিলে রাখার সময় এক ভয়ানক সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে সে। নিজের রিভলবার রেখে টেবিলে রাখা শীতল দাসের রিভলবার তুলে নেয় এবং মিঃ বরাড়ের উপর গুলিবর্ষণ শুরু করে। হত চকিত শীতল দাস মুহূর্তে দলবীরের রিভলবার তুলে তাকে গুলি করেন। দলবীর পড়ে গিয়ে শীতল দাসকেও গুলিতে মৃত্যুর কোলে শুইয়ে দেয়।

অনুসন্ধান চলছে। পাঞ্জাবের সাধারণ মানুষ এই হত্যাকাণ্ডের অনুসন্ধানের জন্য সি·বি·আই–এর হস্তক্ষেপ দাবি করে চলেছে। তাদের ধারণা তাহলেই বোঝা যাবে যে এখনো কতজন "দলবীর" পুলিশের ছত্র ছায়ায় পালিত হচ্ছে।

নিরপেক্ষ এবং বিস্তৃত অনুসন্ধানেই ধরা যাবে যে একরকম দলবীর পুলিশে থেকে আতঙ্কবাদীদের নির্মূল করার প্রয়াস করে না পুলিশের বিভিন্ন প্ল্যান আতঙ্কবাদীদের কাছে ফাঁস করে দেয়। এটা তো স্পষ্ট, দলবীরের মত পুলিশ কর্মীরা নির্দোষ সাধারণ মানুষকে হয়রান করে তাদের কাছ থেকে পয়সা আদায় করে পাঞ্জাব পুলিশের ভাবমূর্তিকে সাধারণ্যে কলংকিত করেছে। আজ পাঞ্জাবের রাজনীতি, কেন্দ্রিয় রাজনীতি ও পুলিশ ব্যবস্থা এই সব সমাজবিরোধী কার্যকলাপে ও আতঙ্কবাদের জন্য এমনই ব্যতিব্যস্ত যে এদের নির্মূল না করলে পুলিশ বাহিনীতে বজায় রাখা সম্ভব নয়। আর একাজ যথেষ্টই কঠিন।

-মনোহর শুক্ল

সি পি এমের হাতে অস্ত্র!

দার্জিলিং-এ সি পি এমের অস্ত্রসমর্পণকে কেন্দ্র করে তিন কেন্দ্রিয় মন্ত্রী ও ত্রিপুরা এবং পশ্চিমবংগের চার রাজ্যমন্ত্রীর বক্তব্য ভবিষ্যৎ রাজ্য রাজনীতির ভীতিপ্রদ দিকটিরই আভাস দেয়। অস্ত্রসংগ্রহের অতীত ও ভবিষ্যতের দিকে একটি প্রতিবেদন।

১২ নভেম্বর শনিবার। মেদিনীপুর জেলার আদিবাসী অধ্যুষিত ঝাড়গ্রাম মহকুমা থেকে প্রাপ্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ সংবাদে চঞ্চল হয়ে উঠল কলকাতাস্থ কেন্দ্রিয় গোয়েন্দা দপ্তর। খবরটি হল: 'ঝাড়খণ্ড পার্টির সভাপতি বিষ্ণুপদ সোরেনের চিকিৎসা-সাহায্যের নাম করে মেদিনীপুর-বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া জেলা ব্যাপী ঝাড়খণ্ড সমর্থকরা যে চাঁদা আদায়ের অভিযান শুরু করেছে তা আসলে অস্ত্র কেনার জন্যই সাহায্য অভিযান।' সরকারি তৎপরতার সঙ্গে সঙ্গে সাংবাদিক তৎপরতাও বেড়ে যায়। ঝাড়গ্রাম শহরের ঝাড়খণ্ড অফিসে যোগাযোগ করলে দলীয় মুখপাত্র হিসাবে নিজের পরিচয় দিয়ে জয়চাঁদ সোরেন বলেন: 'আত্মরক্ষার কারণ দেখিয়ে যদি
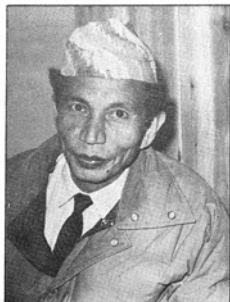
জি এন এল এফ প্রধান সুবাস ঘিসিং
ছবি: বিকাশ চক্রবর্তী

দার্জিলিংয়ে অস্ত্রসমর্পণ

ছবি: অশোক বসু

শাসকদল সি পি আই (এম) দার্জিলিঙে অস্ত্র আইনকে কলা দেখিয়ে অস্ত্র সংগ্রহ করতে পারে। এমন কি সেই অস্ত্র ব্যবহার করার পরও যদি তারা অস্ত্র আইন ভাঙার দায়ে অভিযুক্ত না হন এবং তাকে যদি রাজ্য সরকারের মন্ত্রীরা প্রকাশ্যে সমর্থন জানাতে পারেন তাহলে আমরা অস্ত্র সংগ্রহ করলে তা অপরাধ হবে কেন?' ঝাড়খণ্ড পার্টির মত একই বক্তব্য উত্তরবঙ্গের উত্তরাখণ্ড দলের লোকেদের মুখেও শোনা যাচ্ছে। এমন কি নবমনোনীত প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি বরকত গণি খানচৌধুরীর 'স্টেনগান হাতে তুলে নাও' স্লোগানের প্রতিক্রিয়ায় গ্রামাঞ্চলের একদল কংগ্রেস কর্মীও নাকি এধরনেরই বক্তব্য রাখছেন। আর এসবের ফলেই রাজ্যের রাজনৈতিক মহলা সরগরম হয়ে উঠছে একটি প্রয়োজনীয় প্রশ্নে, পশ্চিমবঙ্গ কি তবে অদূর ভবিষ্যতে এক রক্তাক্ত রাজনৈতিক হানাহানির আবর্তে পড়ে যাচ্ছে?

দার্জিলিং চুক্তি অনুযায়ী কথা ছিল, ২ অক্টোবর মহাত্মা গান্ধীর জন্মদিনকে শ্রদ্ধা

জ্যোতি বসু: দার্জিলিংয়ের সি পি এম নেতৃত্ব যাঁর নেতৃত্বে সম্পূর্ণ আস্থাশীল

জানাতে ওই দিন থেকেই সুবাস ঘিসিং-এর জি·এন·এল·এফ কর্মীরা এবং সি পি এমের প্রতিরোধী সদস্যরা ১৬ দিন ব্যাপী অস্ত্রসমর্পণ অনুষ্ঠান শুরু করবেন। সেইমত ৩রা অক্টোবর সি পি এমের ২০০ সমর্থক সোমবার বিকেলে দার্জিলিং জিমখানা ক্লাবে ১১৩টি পাইপগান, ১টি এস·এল·আর, ১টি স্টেনগান, ২টি কামান, ২টি দোনলা বন্দুক, ১টি একনলা বন্দুক এবং ৬৪টি বোমা, অজস্র কার্তুজ ও বোমা তৈরির মশলা জেলা প্রশাসনের কাছে সমর্পণ করেন। দার্জিলিং মহকুমার সোনাদা, রংবুধ, মিরিক, সিনার, মুডা, নয়াকামান, এলাকার এই ২০০ জন সি পি এম কর্মী দলীয় পতাকাসহ স্লোগান দিতে দিতে জিমখানায় পৌঁছান। এই উপলক্ষে সি পি এমের জেলা সম্পাদক ও সংসদ সদস্য আনন্দ পাঠক সাংবাদিক সম্মেলনে ঘোষণা করেন–'ঠিক সময়ে খবর দেওয়া যায়নি বলে এদিন অনেক সি পি এম সমর্থক অস্ত্র জমা দিতে পারেনি। তবে পাহাড়ে সি পি এম সমর্থকদের কাছে যা অস্ত্র জমা আছে, আস্তে আস্তে সবই সমর্পণ করা হবে। তবে এই সব অস্ত্র সি পি এম সমর্থকদের হাতে পার্টির পক্ষ থেকে তুলে দেওয়া হয়নি, আত্মরক্ষার স্বার্থে সি পি এম সমর্থকরা নানা সূত্র থেকে ওইসব অস্ত্র সংগ্রহ করেছে।'

এর পরের দিনই কলকাতায় বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রিয় বাণিজ্য দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সী। তখন পর্যন্ত তিনি রাজ্য কংগ্রেস সভাপতি। তিনি রাজ্য কংগ্রেস সভাপতি হিসাবেই জানতে চান, এত অস্ত্র যার মধ্যে অধিকাংশ আধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র, তা সি পি এম কোথা থেকে

> *শ্রী দাশমুন্সীর প্রশ্ন–স্টেনগান, সেলফ লোডিং রাইফেল প্রভৃতি অত্যাধুনিক আগ্নেয়াস্ত্রগুলি সি পি এম চোরা পথে বাইরে থেকে যোগাড় করেছে, নাকি রাজ্যের পুলিশী অস্ত্রাগার থেকে তুলে দেওয়া হয়েছে? উত্তেজিতভাবে শ্রী দাশমুন্সী আশংকা প্রকাশ করেন, 'দার্জিলিং-এর দিকে তাকিয়ে সংগ্রহ করা সব অস্ত্র সি পি এম জমা দিচ্ছে না। বরং ভবিষ্যৎ রাজ্য রাজনীতিকে হিংসাত্মকপথে প্যানিক ক্রিয়েট করে আয়ত্বে রাখার কৌশলে তা জেলায় জেলায় পাচার করে দিচ্ছে!'*

পেল? শ্রী দাশমুন্সীর প্রশ্ন–স্টেনগান, সেলফ লোডিং রাইফেল প্রভৃতি অত্যাধুনিক আগ্নেয়াস্ত্রগুলি সি পি এম চোরা পথে বাইরে থেকে যোগাড় করেছে, নাকি রাজ্যের পুলিশী অস্ত্রাগার থেকে তুলে দেওয়া হয়েছে? উত্তেজিতভাবে শ্রী দাশমুন্সী আশংকা প্রকাশ করেন, 'দার্জিলিং–এর দিকে তাকিয়ে সংগ্রহ করা সব অস্ত্র সি পি এম জমা দিচ্ছে না। বরং ভবিষ্যৎ রাজ্য রাজনীতিকে হিংসাত্মকপথে প্যানিক ক্রিয়েট করে আয়ত্বে রাখার কৌশলে তা জেলায় জেলায় পাচার করে দিচ্ছে!' পরে আলিপুর ভবানী ভবনে রাজ্য পুলিশের সদর দপ্তর অবরোধ সমাবেশে প্রিয়বাবু 'সি পি এম সমর্থকদের হাতে বে-আইনেপী আগ্নেয়াস্ত্র তুলে দেওয়ার দায়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু এবং সি পি এমের রাজ্য সম্পাদক সরোজ মুখার্জিকে অস্ত্র আইন ভঙ্গের দায়ে গ্রেপ্তার করার দাবি জানান। পরবর্তী দিনগুলিতে কেন্দ্রিয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বুটা সিংহ, কেন্দ্রিয় প্রতিরক্ষা দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী সন্তোষমোহন দেব এবং রাজস্বমন্ত্রী অজিতকুমার পাঁজা সি পি এম সমর্থকের হাতে অস্ত্র থাকার ব্যাপারটি নিয়ে রাজ্যব্যাপী বিতর্ক তোলেন। কেন্দ্রিয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক অস্ত্র যোগানের বিষয়টি নিয়ে রাজ্য সরকারের বক্তব্য চেয়ে পাঠায়।

এরই পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্য সরকারের পূর্ত এবং তথ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ১৪ অক্টোবর শুক্রবার মহাকরণে বলেন, 'দার্জিলিং–এ সি পি এম সমর্থকরা আত্মরক্ষার জন্যই অস্ত্র হাতে তুলেছিল এবং কাজটি অত্যন্ত সঠিক হয়েছে। সি পি এম সমর্থকরা কিভাবে এই অস্ত্র পেল বলে প্রশ্ন তুলেছেন প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সি। তিনি কি বলতে চান যে

সন্তোষমোহন দেব: অস্ত্র সমর্পণ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন

ছবি। অলোক বসু

আত্মরক্ষার অধিকারও আমাদের নেই। দার্জিলিং–এ একটি অস্বাভাবিক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল। গোর্খাল্যান্ড গোর্খাল্যান্ড আদায়ের জন্য প্রকাশ্যে লড়াই-এ নেমেছিল। সশস্ত্র লড়াই হয়েছে, আমাদের ৮২ জন কর্মীকে খুন করা হয়েছে। আত্মরক্ষা করতেই বাধ্য হয়ে সি পি এম সমর্থকরা অস্ত্র হাতে তুলে নেয়।' সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তরে সেদিন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য একথাও পরিষ্কারভাবে জানান, ত্রিপুরাতেও যদি পরিস্থিতি বাধ্য করে তাহলে সি পি এম কর্মীরা অস্ত্র হাতে তুলে নেবে। এবং নিছক আত্মরক্ষার জন্য যে অস্ত্র হাতে নেয় তা

বিশেষ প্রতিবেদন

নিশ্চয় আত্মরক্ষার অধিকারের মধ্যে পড়ে।

সি পি এমের হাতে অস্ত্র থাকার ব্যাপারটি নিয়ে এর আগে পশ্চিমবংগে কেউ প্রশ্ন না তুললেও ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সমীর বর্মন নির্বাচনের পর থেকেই অস্ত্র সমর্পণের দাবি করে আসছেন। এমন কি গত ১২ অক্টোবর দক্ষিণ ত্রিপুরার বিলোনিয়া মহকুমার বীরচন্দ্রমনুতে প্রকাশ্য দিবালোকে উত্তেজিত জনতার হাতে ১৪ জন সি পি এম কর্মীর নিহত হবার ঘটনাকে কেন্দ্র করে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার জানান, 'যেখানে তিনজন নিরাপত্তা রক্ষীর কাছে ২৪ রাউণ্ড করে ৭২ রাউণ্ড গুলি থাকার কথা সেখানে খবর আছে বীরচন্দ্রমনুতে ১,০০০ রাউণ্ডগুলি হয়েছে! এমনকি

ছবি : কল্যাণ চক্রবর্তী

প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি গণি খান চৌধুরী: কংগ্রেসীদেরও পাল্টা অস্ত্র তুলে নিতে বলছেন!

নিহত সি পি এম জেলা পরিষদ সদস্য শ্রীদাম পালও যে সেদিন রিভলবার থেকে গুলি চালিয়েছেন তারও প্রত্যক্ষদর্শী পাওয়া গেছে। আমরা তদন্ত করে দেখছি এসব গুলি কোত্থেকে এল? জনতা তো পিটিয়ে মেরেছে। তাহলে কাদের গুলিতে নিরীহ কংগ্রেসকর্মী দোকানের ভেতরে গুলি লেগে মারা গেল?'

এরপর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সমীর বর্মন একটি একান্ত সাক্ষাতকারে জানান, 'আমরা বহুদিন থেকেই বলে আসছি যে সি পি এম কর্মীদের হাতে বহু পরিমাণে অস্ত্র জমা আছে। পশ্চিমবঙ্গে দার্জিলিং–এ ওরা নিজেরা সমর্পণ করায় তা প্রমাণিত হয়েছে। আর এখানে আমরা উত্তর ও দক্ষিণ ত্রিপুরায় এক এস·এফ·আই জেলা সম্পাদকের বাড়ি থেকে বিদেশী ছাপ মারা রাইফেল পেয়েছি। এমনকি সুশীল চাকমা বলে এক পরিচিত সি পি এম নেতার বাড়ি থেকে উদ্ধার করা হয়েছে চীনা রাইফেল।'

আসলে পশ্চিমবংগ বা ত্রিপুরার সি পি এম সমর্থকদের কাছে অস্ত্র থাকা নিয়ে ভারতব্যাপী গুরুতর বিতর্ক হলেও সি পি এমের দলীয় লক্ষ্য বা তত্ত্ব অনুসরণে বলা যায় তত্ত্বগতভাবে সি পি এম সমর্থকরা এ ব্যাপারে মার্কসীয় থিয়োরিই ফলো করেছেন। ১৯৬২ সালে চীন কর্তৃক ভারত আক্রমণের পরই কারা আক্রমণ করেছে এবং মার্কসীয় রাজনৈতিক লাইন নিয়ে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি দুভাগে ভাগ হয়। সি পি আই বলে আক্রমণ করেছে চীন এবং এখনকার রাজনৈতিক লাইন হওয়া উচিৎ জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব। এই মতের বিরোধিতা করেনমুজফ্ফর আহমেদ, বি টি রনদিভে, প্রমোদ দাশগুপ্ত, ই এম এস নাম্বুদিরিপাদ, হরেকৃষ্ণ কোঙার প্রমুখ নেতারা সি পি আই (এম)–এর। তাদের বক্তব্য ছিল ভারত চীনকে

> ***১৯৬২ সালে চীন কর্তৃক ভারত আক্রমণের পরই কারা আক্রমণ করেছে এবং মার্কসীয় রাজনৈতিক লাইন নিয়ে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি দুভাগে ভাগ হয়। সি পি আই বলে আক্রমণ করেছে চীন এবং এখনকার রাজনৈতিক লাইন হওয়া উচিৎ জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব। এই মতের বিরোধিতা করেন মুজফ্ফর আহমেদ, বি টি রনদিভে, প্রমোদ দাশগুপ্ত, ই এম এস নাম্বুদিরিপাদ, হরেকৃষ্ণ কোঙার প্রমুখ নেতারা সি পি আই (এম)–এর।***

আক্রমণ করেছে এবং জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সময় পেরিয়ে এখন জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের সময় শুরু। তাই জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবই মূল লক্ষ্য এই ঘোষণা করে সি পি আই (এম) দলের যাত্রা শুরু হয়। আর মার্কসীয় বিপ্লবের পর্যায়গুলির মধ্যে এই 'জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব'–এর ডাক মানেই হল শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে সশস্ত্র সংগ্রামের ডাক, রক্তাক্ত সংঘর্ষের পথে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের ডাক। তাই 'জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব' যাদের ঘোষিত নীতি তারা যে অস্ত্র সংগ্রহ করবে এতো তাদের ঘোষিত নীতি। সুতরাং অস্ত্র সংগ্রহ করে অস্ত্র আইনের আওতায় পড়লেও সি পি এম সমর্থকরা মিথ্যাচারের দায়ে অভিযুক্ত হবেন না। তারা তো দলীয় দলিলে পরিষ্কার করেই বলেছেন, এই যে সংসদীয় ব্যবস্থায় অংশগ্রহণ এটা কার্যত কৌশল। যেদিন মনে করা হবে দল মেহনতী মানুষের রাজ কায়েম করতে সক্ষম সেদিনই লেনিন কথিত এই 'শুয়োরের খোঁয়াড়' পরিত্যাগ করে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের দিকে সশস্ত্র সংগ্রামের পথে এগিয়ে যাবে। এমনকি তত্ত্বগতভাবে 'জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব'-এ বিশ্বাসীরা যে ডিমিট্রিভ তত্ত্বের সুযোগ নিয়ে গোপনে গোপনে লালফৌজ তৈরি করার লক্ষ্যে এগোবে এতো তাদের রাজনৈতিক তত্ত্বস্বীকৃত। সংসদীয় ব্যবস্থায় তাদেরকে স্বীকৃতি দেওয়ার আগেই এসব কথা ভাবা উচিত ছিল, এমন ভেবে লাভ কি। হৈ চৈ করেও বৃথা কালহরণ।

আসল হৈ চৈ কিন্তু অস্ত্র সংগ্রহের কারণে নয়। তারা তো অস্ত্র সমর্পণ করছেই, তবে ভয়টা কিসের? আসলে সি পি এম তার সংগৃহীত সব অস্ত্র জমা দেবে কিনা তাই নিয়েই বিতর্ক। কারণ ত্রিপুরা ও পশ্চিবংগে সি পি এমের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী কংগ্রেস জানে সি পি এমের হাতে যদি অস্ত্র রয়ে যায় এবং সি

তথ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য: পরিস্থিতিই বাধ্য করেছে অস্ত্রধারণে

পি এম তা যদি জেলায় জেলায় জঙ্গী ক্যাডারদের হাতে তুলে দেয় তবে পশ্চিবংগে কংগ্রেসের ক্ষমতায় ফেরা বা ত্রিপুরায় সেনা সহয়তা বিনা রাজ্য সরকাকে টিকিয়ে রাখা দুটোই অসম্ভব। কেননা একদিকে যেমন ক্ষমতাসীন, মার্ক্সবাদীদের কাছে পৃথিবীর কোন দেশের কোন রাজনৈতিক মহল ফেয়ার ইলেকশন আশা করে না, তেমনি সশস্ত্র কমিউনিস্টদের সশস্ত্র জংগী আন্দোলনের সামনে সংসদীয় ভিত্তিতে টিকে থাকার সৌভাগ্য কটি সরকারই বা অর্জন করতে পেরেছে?

পশ্চিমবংগে সি পি এম ক্ষমতায় আসার পর রাজ্যের ভূমি ও ভূমিরাজস্বমন্ত্রী তথা সি পি এমের কৃষক সংগঠনের সভাপতি বিনয়কৃষ্ণ চৌধুরীর একটি বিবৃতিতে বছর দুই আগে সারা রাজ্য তোলপাড় হয়ে যায়। এই বিবৃতিতে ভূমিরাজস্বমন্ত্রী বিনয় চৌধুরী বলেছিলেন, যদি প্রয়োজন হয় তো পশ্চিমবংগে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়ে যাবে। মন্ত্রী বলেছেন বলে বিশাল হৈ চৈ শুরু হলেও কথাটির রাজনৈতিক

তাৎপর্য অল্পকিছুদিনের মধ্যেই ধামাচাপা পড়ে যায়। এবং কংগ্রেস নেতারাও এ নিয়ে তেমন সোরগোল তুলতে পারেন নি। অথচ তাত্ত্বিক বিশেষজ্ঞের দৃষ্টিতে খুঁজে দেখলে এই কথাটির মধ্যে সি পি এম সমর্থকদের কাছে অস্ত্র পাওয়ার ব্যাপারটি পরিষ্কার হয়। চিলি, ভিয়েতনাম, আফগানিস্তান, নিকারাগুয়া, চীন এমনকি খোদ সোবিয়েত রাশিয়ার প্রাক বিপ্লব পর্যায়ের দিকে তাকালেই কমিউনিস্ট কৌশলের গৃহযুদ্ধের হুংকার জিনিষটি কি তা সহজেই পরিস্ফুট হয়। আর বিনা প্রস্তুতিতে কোন বাজা পর্যায়ের মার্কসবাদী নেতা যে বালখিল্যের মত গৃহযুদ্ধের হুংকার দিতে পারেন তা মার্কসবাদের সঙ্গে ন্যূনতম পরিচয় থাকা বালকও তা মনে করবে না বা বিশ্বাস করবে না। আর এর

ভারতভাগের ফলে লক্ষ লক্ষ পূর্ব পাকিস্তান থেকে আগত হিন্দুউদ্বাস্তুরা আস্তানা গাড়ল ত্রিপুরার সর্বত্র। ফলত এখানকার আদি বাসিন্দা উপজাতিদের সঙ্গে বাঙালি উদ্বাস্তুদের স্বার্থের সংঘাত শুরু হল। এসময়ই অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির তরফ থেকে সংগঠন গড়তে নৃপেন চক্রবর্তী ত্রিপুরায় এসেছেন। বেআইনী পার্টির আবসকণ্ড লীডার হিসাবে তিনি কর্মক্ষেত্র হিসাবে বেছে নিলেন উপজাতি অধ্যুষিত ত্রিপুরার পাহাড়ি অঞ্চল।

তাৎপর্য বুঝতে পেরেছেন বলেই কি ইদানিং তাঁর প্রতিটি কর্মীসমাবেশে ও জনসভায় রাজ্যকংগ্রেস সভাপতি বরকত গণি খান চৌধুরী কংগ্রেসের চিরাচরিত ঐতিহ্যের পথ পরিবর্তন করে কংগ্রেস কর্মীদের হাতে সি পি এমের মোকাবিলায় স্টেনগান তুলে নেবার প্রকাশ্য আহ্বান জানাচ্ছেন?

ভারতের সঙ্গে সংযুক্ত হওয়ার আগে ব্রিটিশ সরকারের আবেদন মত ত্রিপুরার উপজাতীয় রাজা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ইংরাজদের সাহায্য করতে একটি সুদক্ষ সেনাবাহিনী পাঠান। তখন গোটা ত্রিপুরাই উপজাতি অধ্যুষিত। ফলত সেনারাও ছিল উপজাতি গোষ্ঠীভুক্ত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর যখন ভারত স্বাধীন হল, তদানীন্তন কেন্দ্রিয় মন্ত্রীসভার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আয়রনম্যান সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেলের আন্তরিক চেষ্টায় ভারত সংলগ্ন ছোট ছোট রাজ্যগুলির ভারতভুক্তি অনুষ্ঠিত হয়। সে সময়ই ত্রিপুরার ভারতভুক্তি সম্পন্ন হয়। ত্রিপুরা ভারতের অন্তর্ভুক্ত হওয়া মাত্র ভারতীয় সেনাবাহিনী সীমান্তে দখল নিল। কিন্তু সেসময় ত্রিপুরা রাজ্যের উপজাতি সেনাবাহিনী যা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ইংরেজদের পক্ষে ব্যবহৃত হয়েছিল তার একটা সুব্যবস্থা করার প্রয়োজনীয়তা কেউ উপলব্ধি করতে পারলেন না। আস্তে আস্তে অস্ত্র সমেতই সেইসব উপজাতি সেনারা বসে গেলেন। এইসময় থেকে ভারতভাগের ফলে লক্ষ লক্ষ পূর্ব পাকিস্তান থেকে আগত হিন্দুউদ্বাস্তুরা আস্তানা গাড়ল ত্রিপুরার সর্বত্র। ফলত এখানকার আদি বাসিন্দা উপজাতিদের সঙ্গে বাঙালি উদ্বাস্তুদের স্বার্থের সংঘাত শুরু হল। এসময়ই অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির তরফ থেকে সংগঠন গড়তে নৃপেন চক্রবর্তী ত্রিপুরায় এসেছেন। বেআইনী পার্টির আবসকণ্ড লীডার হিসাবে তিনি কর্মক্ষেত্র হিসাবে বেছে নিলেন উপজাতি অধ্যুষিত

'সি পি এম কি করে লাইসেন্সবিহীন অস্ত্র পেল!'
: প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সী

ত্রিপুরার পাহাড়ি অঞ্চল। সেখানে তখন উপজাতি গণমুক্তি পরিষদ গড়ে বর্তমান সি পি এম রাজ্য (ত্রিপুরা) সম্পাদক দশরথ দেব উপজাতিদের স্বার্থে ব্যাপক গণআন্দোলন গড়ে তুলেছেন। দুই নেতার সাক্ষাত এবং ত্রিপুরায় জোরদার কমিউনিস্ট পার্টির আত্মপ্রকাশ।

ত্রিপুরার বর্তমান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও প্রবীণ কংগ্রেস নেতা সমীররঞ্জন বর্মনের বক্তব্য–পূর্বতন ত্রিপুরারাজের বসে যাওয়া সেনাবাহিনীর গোপনে সংরক্ষিত অস্ত্রশস্ত্র দশরথ দেব ও নৃপেনবাবুর সমর্থকরা নিজেদের আয়ত্তে নিয়ে আসেন এবং সযত্নে সংরক্ষণ করতে থাকেন।

ত্রিপুরার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সমীররঞ্জন বর্মনের বক্তব্য কতটা বিশ্বাস্য তা বিচার করবেন ওয়াকিবহাল মহল বা সরকারি গোয়েন্দারা। তবে পশ্চিমবংগে বা ত্রিপুরায় নানা রাজনৈতিক সংঘর্ষে যে আকছার অত্যাধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহৃত হচ্ছে তাতো কিছুদিন একনাগাড়ে সংবাদপত্র পড়লেই নজরে পড়বে। আর এইসব বেআইনী অস্ত্র ব্যবহারের দায়ে পশ্চিমবংগে এ পর্যন্ত একজনও কংগ্রেসকর্মী গ্রেপ্তার হননি। বরং ত্রিপুরায় দুজন সি পি এম সমর্থক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর ভাষায়, 'গ্রেপ্তার হয়েছেন'। এদিক দিয়ে বিচার করলে সি পি এম সমর্থকদের হাতে অস্ত্র থাকার বিষয়টি যুক্তিযুক্ত ভাবে সমর্থিত হয়।

কেন্দ্রিয় প্রতিরক্ষা দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী নভেম্বর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে উত্তরবংগে সফরে আসেন। সেখানে তাঁর প্রতিটি সভাতেই মুখ্যবিষয় রূপে প্রতিভাত হয় সি পি এমের অস্ত্র সংগ্রহের ব্যাপারটি। সন্তোষমোহন দেব শিলিগুড়িতে এক সাক্ষাতকারে জানান, 'দুর্নীতি, স্বজনপোষণ ও সন্ত্রাসের দায়ে সি পি এমের রাজনৈতিক ভাবমূর্তি এখন মসীলিপ্ত। তাই সরকারে ফিরে আসার মরিয়া প্রচেষ্টায় তারা নির্বাচনের সময় যেকোন পথই নিতে পারে। তাই দার্জিলিং-এ যে বেআইনী অস্ত্রসম্ভার ওরা সমর্পণ করেছে তা সবটা দিয়েছে কিনা একটা সংশয় থেকেই যাবে। গোর্খা ফ্রন্ট নেতা সুবাস ঘিসিং জানিয়েছিলেন, 'পার্বত্য অঞ্চলের ৬ লক্ষ অধিবাসীর ৯৯.৯ শতাংশ মানুষের কাছে অস্ত্র আছে।' এখন পর্যন্ত অত অস্ত্র কিন্তু জমা পড়েনি। আবার জমা পড়া অস্ত্রের সিংহভাগই কিন্তু জি-এন-এল-এফের। সি পি এম সমর্থকরা যতটা অস্ত্র জমা দিয়েছেন তাতে করে ঘিসিং–এর দেওয়া তথ্য যথার্থ প্রমাণিত হয়নি। আর সি পি এম তো বরাবরই বলে আসছে, দাঁতে দাঁত চেপে তারা হাতাহাতি লড়েছে জি-এন-এল-এফের সঙ্গে। তা এই সামান্য পরিমাণ অস্ত্র দিয়ে গোর্খাফ্রন্টের জমা পড়া এইচ-ই–৩৬, স্বয়ংক্রিয় রাইফেল, কারবাইন, গ্রেনেড, জিলেটিন স্টিক, ডেটোনেটর, ল্যান্ডমাইন ও মর্টারের মোকাবিলা করেছে ভাবা শক্ত!

সি পি এমের হাতে অস্ত্র থাক বা না থাক এটাতো প্রমাণিত যে সি পি এম দার্জিলিং-এ অত্যাধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র সমর্পণ করেছে এবং ত্রিপুরায় বিদেশী ছাপ মারা রাইফেলসহ তাঁদের সমর্থক ধরা পড়েছে। একবার যে অস্ত্র ব্যবহারের স্বাদ পায়, সে লড়াই জেতার সহজ সশস্ত্র পথটি ছেড়ে দিয়ে কঠিন পরাজয়ের আশংকা থাকা গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পথ কেনই বা বেছে নেবে? কথাটির তাৎপর্য লক্ষ করার মত। গোর্খা ফ্রন্ট বা সি পি এম যদি সমস্ত অস্ত্র জমা দিয়েই দিত, তাহলে অস্ত্র সমর্পণ শেষ হওয়ার পর এই নভেম্বর মাসেও পাহাড়ে কি করে গোলাগুলির লড়াই চলে? আবার সি পি এম ও গোর্খা ফ্রন্টের দেখাদেখি রাজ্যের অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলির সমর্থকরাও যদি অস্ত্র হাতে তুলে নেয় তাহলে রক্তাক্ত রাজনৈতিক মানচিত্র তৈরির হাত থেকে রাজ্যকে বাঁচাবে কে? এই প্রেক্ষাপটে কাগুজের চাঁদা আদায় এবং বরকত গণি খান চৌধুরীর স্টেনগানের আহ্বান কি পশ্চিমবংগকে সেদিকেই নিয়ে যাবে! আমরা কি ভয়ংকরতম গৃহযুদ্ধের দিকে এগোচ্ছি!

-কলকাতা ব্যুরো

টেনিসকন্যা বিদ্যার ব্যথিত অধ্যায়

বাংলা টেবিল টেনিসে যখন আকাল চলছে তখন এক প্রতিশ্রুতিময়ী টেবিল টেনিস প্রতিভা নষ্ট হচ্ছে গৃহকোণের আড়ালে। খড়গপুরের টেনিসের প্রতিশ্রুতি বিদ্যা প্রিথিয়ানি কেন আগ্রায় গৃহবন্দী? কেন বারবার আত্মহত্যা করতে যাচ্ছে বিদ্যা? বিদ্যাকে ঘিরে কেন আসছে কংগ্রেসের চিফ হুইপ জ্ঞান সিং সোহন পালের নাম? কেনই বা পশ্চিমবঙ্গের এবং উত্তরপ্রদেশের পুলিশ প্রশাসনের নামে এক্ষেত্রে গুরুতর অভিযোগ উঠছে? টেনিস সম্ভাবনা বিদ্যার জীবনের অজানা অধ্যায়ের দিকে আলোকপাত।

বিদ্যা আর ববিতা

১২ অকটোবর ১৯৮৮। ডিরেকটর জেনারেল অব ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশের দপ্তরে একটি অভিযোগপত্র দাখিল করা হল। দরখাস্ত দাখিলকারীর নাম সুনীল দত্ত। চোখে চশমা, দোহারা গড়ন তবু উজ্জ্বল দুটি চোখ দেখে অন্য যে কারোর মধ্যে থেকে মুহূর্তে আলাদা করে নেওয়া যায়। দপ্তরে অভিযোগপত্রটি দাখিল করে এ বিষয়ে তদন্ত করার প্রার্থনা জানিয়ে বেরিয়ে গেলেন তিনি। যিনি দরখাস্তটি নিলেন তিনি একপলক তাকিয়ে দেখলেন সুনীল দত্তের দিকে তারপর নজর দিলেন আবেদনপত্রে। ৩ পৃষ্ঠার বিস্তৃত অভিযোগপত্রটিতে শ্রী দত্ত সরাসরি অভিযুক্ত করেছেন টাটা বিয়ারিংসে খড়গপুরের অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার মিঃ এন·আর প্রিথিয়ানিকে। অভিযোগ পত্রের সঙ্গে সংলগ্ন করা রয়েছে একটি হিন্দি হরফে লেখা চিঠির জেরক্স কপি। চিঠির লেখক জনৈক নানক। চিঠির প্রাপক হিসাবে 'নানক' সম্বোধন করেছেন দু'জনকে—'অশোক' এবং 'লচ্ছু,' ঠিকানা উত্তর প্রদেশের আগ্রা।

নানকের লেখা চিঠির বয়ান বিষয়েই আনীত অভিযোগে অভিযোগকারী সুনীল দত্ত জানান—১৮·৯·৮৮ তারিখের চিঠির লেখক নিঃসন্দেহে খড়গপুর টাটা বিয়ারিংস–এর অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার নানক রাম প্রিথিয়ানি। সম্বোধিত 'লচ্ছু' হলেন লক্ষ্মণ দাস, ঠিকানা বি–৮৬, কমলানগর, আগ্রা। চিঠিতে আরও যাদের নামোল্লেখ আছে তারা সুনীল দত্ত, বিদ্যা প্রভৃতি। বিদ্যা এবং সুনীলের মধ্যে যাতে কোন সম্পর্ক না থাকে তার বিষয় লক্ষ্য রাখার জন্য ও চিঠিতে উল্লেখ আছে। বিদ্যা যাতে সুনীলের সঙ্গে না পালাতে পারে সে বিষয়েও নজর রাখার কথা উল্লেখ আছে।

চিঠি বিষয়ে আনীত সুনীল দত্তের অভিযোগগুলি আবেদনপত্রে এভাবে সাজান হয়েছে—

১) অশোক আগেই নানককে পুলিশের সঙ্গে হার্দাতা গড়ে তোলার জন্য একজনকে নিযুক্ত করার কথা বলেছিলেন।

২) নানক অশোকের পরামর্শক্রমে খড়গপুরে ব্যবস্থা নিচ্ছেন। অশোককেও নানক পুলিশের কাছে একটি এফ·আই·আর করার পরামর্শ দেন।"

৩) নানক অশোককে এও পরামর্শ দেন যাতে অশোক পরিচিত পুলিশকে কিছু দেওয়ার হলে দিয়েও যাতে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেন। তিনি অশোককে এও বলে অভয় দেন যে অর্থের ব্যাপারে শংকিত হবার কোন কারণ নেই, তিনি তা অবশ্যই পাঠিয়ে দেবেন।

৪) নানক লচ্ছুকে চিঠিতে জানান তিনি যেন বিদ্যাকে দিয়ে জোর করিয়ে একটি দরখাস্ত লিখিয়ে

নেন, এবং তা অবশ্যই করতে হবে।

৫) নানক লক্ষ্মকে বিদ্যার বার্থ সার্টিফিকেটে একটি মিথ্যে তারিখ বসাবার পরামর্শ দেন। বিদ্যা ১৯৮৮ তে যেখানে সাবালিকা হচ্ছে, সেখানে আইনের আশ্রয় নিতে এবং বিদ্যাকে নাবালিকা প্রমাণ করতে এই জাল সার্টিফিকেট তৈরির পরামর্শ।

৬) বিদ্যা যেন কোনমতেই সুনীল দত্তের সঙ্গে পালাতে না পারে সেজন্য কঠোর নজর রাখা।

কোচ সুনীলের সঙ্গে বিদ্যা

লক্ষ্মকে নানকের দেওয়া এই নির্দেশের অর্থ বিদ্যার ইচ্ছার বিরুদ্ধে অভিভাবকের প্রভাব বিস্তার।

৭) বিদ্যা যাতে সুনীলের সাথে কোন পত্রযোগাযোগ না রাখতে পারে এবং কাউকেই তার করুণ কাহিনী শোনাতে না পারে এবং কোন স্টেটমেন্ট দিতে না পারে তার জন্য তাকে প্রায় নজরবন্দী করে রাখা হয়েছে।

৮) সুনীল দত্ত আবেদনপত্রে এও জানান যে, তিনি কোন মেয়ে বিক্রির পাপচক্রের সঙ্গে সংযুক্ত নন। বিদ্যা এবং তাঁর মধ্যেকার সুসম্পর্কটিকে বিষিয়ে তুলবার জন্যই বিদ্যার বাবা নানকরাম প্রিথিয়ানি এবং তার মামারা উদ্দেশ্য-প্রণোদিত এই ষড়যন্ত্র চালিয়ে যাচ্ছেন।

অভিযোগপত্রে সুনীলের ও বিদ্যার সম্পর্কের প্রশ্নটি অনিবার্য হিসেবে চলে এসেছে। অর্থাৎ একথা স্পষ্ট সুনীলের থেকে বিদ্যাকে সরিয়ে রাখতে বিদ্যার বাবা এবং মামারা একাধিকক্রমে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু সুনীলের কাছ থেকে বিদ্যাকে সরিয়ে রাখার কারণ কি? সুনীলের সঙ্গে ববিতার সম্পর্কই বা কি? কোন অধিকারে সুনীলই বা বিদ্যার বিষয়ে তার অভিভাবকদের বিরুদ্ধে পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করছেন?

সেদিনের তারিখ ছিল ৬ মে ১৯৮৮। ঘড়িতে সকাল সাড়ে নটা। খড়গপুর স্টেশনের পাশে 'বেঙ্গল সুইটস'-এ তখন জমাটি ভিড়। হঠাৎ বিদ্যা তার এক সঙ্গীর সঙ্গে দোকানে আসে। একটু পরেই আসেন সুনীল দত্ত। সুনীল দত্তকে এখানকার সবাই চেনে। টেবিল টেনিসের কোচ তিনি, খড়গপুরে রেলওয়েতে চাকরি করেন। রেলকর্মী বলে নয়, লোকে তাঁকে তার খেলার জন্যই ভালবাসে। কিন্তু সুনীলকে দেখামাত্রই দোকান থেকে ছুটে বেরিয়ে যায় বিদ্যা। সুনীল এবার বিদ্যার পেছনে ছুটে যান। বিদ্যাকে ধরে নিয়ে আসেন। এঘটনায় উপস্থিত কেউই বিচলিত বোধ করেনি, কারণ তারা সকলেই জানে টাটা বিয়ারিংস এর অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার প্রিথিয়ানির মেয়ে বিদ্যা কোচ সুনীল দত্তের কাছে টেবিল টেনিসের প্রশিক্ষণ নেয়। শুধু বিদ্যা নয় বিদ্যার ছোট বোন ববিতাও সুনীলের টেনিস ছাত্রী। সুনীল ধরে আনার অনেকক্ষণ পর পর্যন্ত বিদ্যা কাঁদছিল। তার মুখ থেকে একটা কথাই বেরিয়ে আসছিল—'আগ্রা থেকে ফিরে এসে তোর মুখ যেন না দেখি—আমার সৎমা যাবার সময় এই কথা বলে গেছে।'

সুনীল বিদ্যাকে অনেক করে বোঝায়, কিন্তু বিদ্যা কিছুতেই বাড়ি ফিরে যেতে চায় না। বলে, 'আমি তো চলন্ত ট্রেনের সামনে আত্মহত্যা করতে গেছিলাম স্যার, আমাকে আপনি বাঁচাতে গেলেন কেন। আমি আর বাঁচতে চাই না। এভাবে দিনের পর দিন সৎ মায়ের অত্যাচার আর লাঞ্ছনা সয়ে কোন মেয়ে বেঁচে থাকতে পারে না। প্রাণ থাকতে আমি বাড়ি ফিরে যাব না। আমাকে বাড়ির কেউ দেখতে পারে না। কি লাভ এভাবে বেঁচে থেকে!'

সুনীলের মনে পড়ে ১৯৮৭-র শেষের দিকের দিনগুলির কথা। সেন্ট অ্যাগনেস স্কুলের দুই ছাত্রী এল টেবিল টেনিসের কোচিং নিতে। ক'দিনে দুই বোন অন্যান্য ছাত্রীকে পেছনে ফেলে এগিয়ে গেল। কোচ সুনীল এবার বিশেষভাবে নজর দিলেন দু'বোনের উপর। দেখলেন ববিতার চাইতেও বিদ্যার ক্রীড়া প্রতিভা বেশি। অনেকেই কম্বিনেশন খেলে কিন্তু বিদ্যার মত র‍্যালির ব্যাট ঘোরানো অত সহজ নয়। ওর শরীরের গড়নটাই আলাদা। একেবারে মেসোফর্ম ধরনের। বিদ্যার কুড়ো আঙুলের গড়নও কিছুটা অসাধারণ। গঠন অনুযায়ী বিদ্যা পারফেক্ট কম্বিনেশনের খেলোয়াড়। র‍্যালির সময়ে তার প্রত্যুৎপন্নমতিত্বও তুলনায় অনেক বেশি। বিদ্যার প্রতিভায় মুগ্ধ কোচ সুনীল ওদের যাতে কোচিং-এর বিন্দুমাত্র অসুবিধে না হয় তার সব ব্যবস্থাই ঘাড়ে তুলে নিলেন।

৬ মে বিদ্যা, ববিতা সুনীলেরই আরেক টেবিল টেনিস ছাত্রী বাণী স্বামীর সঙ্গে বিমর্ষমুখে বাড়ি ফিরল। ২৫ এপ্রিল বিদ্যার পরীক্ষা শেষ হয়। তার আগে থেকেই তারা কোচিং-এ আসছিল না। বেশ কয়েকদিন প্র্যাকটিসে না আসায় সুনীল একদিন বাড়ি বয়ে জানতে আসেন বিদ্যা ববিতা কোচিং-এ যাচ্ছে না কেন। বাড়ি থেকে বলা হয়, সামনের পরীক্ষা মিটলেই ফের প্র্যাকটিসে যাবে। ২৫ এপ্রিল শেষ হওয়া পরীক্ষার রেজাল্ট নিয়ে ফিরল বিদ্যা। পরীক্ষায় ফেল করেছে সে। বাড়িতে তখন থাকার মধ্যে ছিল বোন ববিতা, দুই ভাই মহেশ ও নরেশ এবং বিদ্যা নিজে। পরীক্ষা চলাকালীনই ওর সৎ মা, বাবা, ছোট্ট বোন নিশা এবং ঠাকুরমা আগ্রা চলে যান। একদিকে পরীক্ষা অন্যদিকে বাড়ির জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ। হ্যাপা সামলেও যে রাত জেগে নিজের পড়া তৈরি করবে তার উপায় নেই। সৎমায়ের আদেশ রাতে বেশি কারেন্ট পোড়ানো চলবে না। এই পরিস্থিতিতে বিদ্যার পক্ষে পরীক্ষায় পাশ করা কঠিন। হয়তো বিদ্যার সৎ মা এটিই চাইছিলেন। হলও তাই।

পরীক্ষায় ফেল করার পর বিদ্যা নিজেকে ধরে রাখতে পারছিল না। সে জানত বাড়ি থেকে তাকে আর কোনও দিন টেবিল টেনিসে আসতে দেবে না। অথচ টেবিল টেনিসই তার কাছে একমাত্র স্বপ্ন। সুনীল এর আগেও লক্ষ্য করেছে স্টেট কম্পিটিশনে যাবার আগে বিদ্যা যখন প্র্যাকটিসে আসত তখন হাত হলুদরঙা। কোনও কোনও দিন এক আধ জায়গায় ফোস্কা। জিজ্ঞেস করলে বিদ্যা বলেছে, 'ও কিছু না, বাড়ির রান্না করতে গিয়ে হয়েছে।'

আসলে বিদ্যা একটু চাপা ধরনের মেয়ে। নিজের কথা সে জাহির করতে চায় না। কিন্তু শেষের দিকে সুনীল নজর করছিল বিদ্যা কেমন এক মানসিক চাপের মধ্যে পড়েছে! জিজ্ঞেস করলে বিদ্যার সংক্ষিপ্ত উত্তর, 'ও কিছু না'! কিন্তু আজ আর বিদ্যার কান্না থামে না। এক নাগাড়ে সে বলে যেতে থাকে, 'আমাকে আপনি আশ্রয় দিতে পারবেন না? পারবেন না স্যার, আমার একটা কাজের ব্যবস্থা করে দিতে?'

বিদ্যার যে-ক্রীড়া প্রতিভা বা সাফল্য তাতে সাউথ ইস্টার্ন রেলওয়েতে চাকুরি অর্জন করা আদৌ শক্ত নয়, কোচ সুনীলের চাইতে একথা কেউ ভাল জানত না। ১৯৮৮র সেপ্টেম্বরের প্রতিযোগিতায়

১. পাত্র ঢেকে রান্না করুন আর কেরোসীন তেল বাঁচান।

২. রান্না করার সময়ে যথার্থ পরিমান জল ব্যবহার করুন আর কেরোসীন তেল বাঁচান।

৩. প্রেসার কুকার ব্যবহার করুন আর কেরোসীন তেল বাঁচান।

অনুগ্রহ ক'রে আমাকে আরো কিছু ইন্ধন বাঁচানোর উপায় জানান এবং রন্ধনপ্রণালী পুস্তিকা পাঠান।

নাম ____________________

ঠিকানা ____________________

____

পিন ____________________

P C R A

পেট্রোলিয়াম কনজার্ভেশন রিসার্চ এ্যাসোসিয়েশন
পি-৮৩৫ ব্লক 'পি',
এক তলা, নিউ আলিপুর,
কলিকাতা-৭০০০৫৩

Mudra D.PCRA 1903

বিদ্যা যাতে সম্মানের শিরোপা তুলে আনতে পারে সেজন্য সুনীল যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কিন্তু বিদ্যা শেষের দিকে তাঁর কাছে আসতই না। তবু সুনীলের আত্মবিশ্বাস ছিল, দেশের হাজার হাজার টেনিস প্রতিভার তারিফ কুড়োনো বিদ্যা কখনোই পেছু হঠতে পারে না। এখনও প্র্যাকটিস করলে সে সেপ্টেম্বরের অল ইন্ডিয়া স্তরের প্রতিযোগিতায় কৃতিত্ব দেখাতে পারে। ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়ন টেবিল টেনিস মাস্টার ভি· শিবরামনের উচ্চপ্রশংসিত বিদ্যা অদূর ভবিষ্যতে মধুমিতা বা নিরুপমার মতোই একটি সবভারতীয় প্রতিভা হয়ে দাঁড়াবে এই ছিল কোচ সুনীলের বিশ্বাস।

বিদ্যাকে শেষ পর্যন্ত বাড়ি নিয়ে গেলেন সুনীল। ওদিকে বিদ্যার সঙ্গী বাপীর বাবা পি· এন· স্বামী বিদ্যা-ববিতার অনুশীলন কেন্দ্র রেলওয়ে ইনস্টিটিউটে খোঁজ নিয়ে এবং সুনীলের অফিসে সুনীলকে না পেয়ে সুনীলের বাড়িতে যান। শ্রী স্বামী টাটা বিয়ারিংস-এ বিদ্যার বাবা নানক রামের সহকর্মী। বিদ্যাকে তিনিই বাড়ি নিয়ে যেতে আসেন। কিন্তু বিদ্যা বাড়ি ফিরে যেতে কিছুতে রাজি নয়। বেলা আড়াইটে অব্দি বিদ্যাকে বাড়ি ফিরে যাওয়ার জন্য রাজি না করাতে পেরে তিনি ফিরে যান। সন্ধ্যায় আবার আসেন তিনি বন্ধু শ্রী সারীন এবং শ্রীমতী সারীণের সঙ্গে। শ্রী সারীণও নানক রামের সহকর্মী। বিদ্যার সঙ্গে তাঁদের রীতিমত বাকবিতণ্ডা চরমে ওঠে। সুনীল এসে ঝগড়া থামান এবং বলেন, বিদ্যাকে নিয়ে যেতে হলে আপনাদের বণ্ডে সই করতে হবে। প্রথমতঃ, এই পরিস্থিতিতে বিদ্যা যদি আত্মহত্যা করে তার দায় দায়িত্ব আপনাদের। দ্বিতীয়তঃ, আমি বিদ্যাকে পুলিশের হাতে তুলে দেব, আপনারা বেল দিয়ে ওকে নিয়ে যান। কিন্তু শ্রীস্বামী কিংবা শ্রী সারীণ কেউই সুনীলের প্রস্তাবে রাজি হলেন না। সে মুহূর্তে বিদ্যার বাবা ছিলেন আগ্রায়। শ্রী স্বামী এবং শ্রী সারীন সুনীলের প্রস্তাবে রাজি না হয়ে ফিরে গেলেন। এবার রাত সাড়ে ন'টায় বিদ্যাকে নিয়ে সুনীল লোকাল থানায় গেলেন। বিদ্যা থানায় তার বক্তব্য রাখে।

থানা থেকে বিদ্যাকে নিয়ে সুনীল নিজের বাড়িতে ফিরে আসেন। পরদিন বিদ্যাকে বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্য কেউ আসেনি। আট তারিখে সুনীল বিদ্যাকে নিয়ে স্থানীয় এম·এল·এ· এবং পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেসের চিফ হুইপ জ্ঞানসিং সোহনপালের কাছে যান। সোহন পাল বিদ্যাকে বলেন, 'যদি তোমার পারিবারিক অসুবিধে থাকে তাহলে পুলিশের সঙ্গে কথা বল। তোমার বাবার সঙ্গে এবিষয়ে কথা বলতে পারি। তোমার বাবা এলেই কথা হবে, তার আগে কিছু বলতে পারব না'

এদিকে ৯ তারিখে বিদ্যার বাবা নানক রাম আগ্রা থেকে ফিরে আসেন। সুনীল বিদ্যার বাবার কাছে প্রস্তাব দেন বিদ্যাকে যেন তিনি বাড়ি ফিরিয়ে না নিয়ে কোন হস্টেলে রেখে দেন। তাতে তার

বিদ্যা, কোচিং-এর একটি মুহূর্তে

মানসিক যন্ত্রণার লাঘব হবে। কিন্তু নানক রাম সুনীলের কথায় পাত্তা দেননি। শেষপর্যন্ত ঐ তারিখেই পুলিশ বিদ্যাকে বাবার সঙ্গে বাড়ি যেতে বলে।

কিন্তু ঘটনা এখানেই শেষ হল না। ৯ মে বিদ্যাকে তার বাবা স্তোক বাক্যে ভুলিয়ে হোক কিংবা পুলিশকে বুঝিয়েই হোক (রেফারেন্স-নানক রামের চিঠি তাং ২৮·৯·১৯৮৮) বাড়ি নিয়ে যান এবং সোজা কথায় গৃহবন্দী করেন। অন্যদিকে কোচ সুনীলের নামে যথেচ্ছ কুৎসা প্রচার করে বেড়ান। বিদ্যা এবং সুনীলের সম্পর্ক যাতে ভেঙে যায় সে বিষয়েও নাকি বিদ্যাকে প্রত্যক্ষ অপ্রত্যক্ষ বোঝান হয় যে সুনীলের চরিত্র বলে কিছু নেই, সে মদাপ, নিষিদ্ধ পল্লীতে যায়, স্ত্রী আছে, স্ত্রীর সঙ্গেও সদ্ভাব নেই, ডিভোর্সের মামলা চলছে ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু তাতেও বিদ্যা ববিতা বিচলিত হয় না। স্যারের নামে মিথ্যে কুৎসায় তারা প্রতিবাদ করে। বিদ্যার বাবা এবারে মুশকিলে পড়েন। বিদ্যা-ববিতাকে সামাল দেওয়া নানক রামের পক্ষে অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। ১২ মে ১৯৮৮। বিদ্যা ববিতাকে নিয়ে ওদের বাবা শ্রী গ্রিথিয়ানি মানসিক ডাক্তার এস·কে সেনগুপ্তর কাছে যান। ডাক্তার সেনগুপ্ত দেখলেন বিদ্যা ববিতা মানসিক হতাশার রুগী। সেইমতই তিনি প্রেসক্রাইব করেন। নিউরোটিক ডিপ্রেসনের জন্য তিনি যে যে ওষুধ দেন তাহল—এমিট্রিপ্টাইলিন ২৫ মিলিগ্রাম, নিওপাম প্লাস সারাবকম। উক্ত মেডিক্যাল হল থেকে ক্যাশমেমো নং—০০৪৩৮৪ তাং ১২·৫·৮৮ অনুযায়ী বিদ্যা ববিতার ওষুধ কেনা হয়। অভিযোগ সুস্থ বিদ্যা ববিতার উপর মানসিক রোগের ওষুধ চাপানো হচ্ছে থাকে। অথচ এই অভিযোগ মানসিক রোগের চিকিৎসা করাতে এসে গ্রিথিয়ানি ডাক্তারের কাছে ৬·৫·৮৮ তারিখের ঘটনা, জি·ডি· নং ২৭৮ খড়গপুর লোকাল থানায় লিখিত অভিযোগ ইত্যাদি পুরোপর সব কিছুই এড়িয়ে যান।

'গৃহবন্দী' অবস্থায় থাকায় বিদ্যা ও সুনীলের সঙ্গে যোগাযোগ হয়নি। শেষে ২০ জুন বিদ্যা সুনীলকে একটি চিঠি লেখে, 'স্যার প্লীজ ফরগিভ মি। সে সার ফোরসিং মি টু টেক দা পেপার হুইচ আই রোট ইন পোলিশ স্টেশন। আমি আপনার কাছে চলে যেতে চাই স্যার। ৪ জুলাই আমি আপনার কাছে যাবো।...'

সুনীল এবার এস·পি·কে এবং লোকাল থানাকে উঠতি টেবিল টেনিস খেলোয়াড় বন্দী বিদ্যাকে উদ্ধার করার জন্য আবেদন জানান। কিন্তু যে কোন কারণেই হোক পুলিশ খুব একটা সক্রিয় হয় না, বলে সুনীলের অভিযোগ। সুনীলের বক্তব্য অনুযায়ী ১২ জুলাই সুনীল দত্তর কাছে পুলিশ এসে বলে সে বিদ্যার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছে, এরপর নানাভাবে সুনীলকে হয়রানির পর তারা ফিরে যায়। এদিকে ১৩ জুলাই বিদ্যাকে জোর করে তার মামা বাড়ি বি-৮৬, কমলা নগর, আগ্রায় দুই মামা অশোক এবং লক্ষ্মণের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সুনীলের কাছে যখন এ খবর এসে পৌঁছয় জানা যায় ইতিমধ্যে বিদ্যা এবং ববিতাও দু'বার মানসিক যন্ত্রণায় আত্মহত্যা করতে যায়। বিদ্যা বলেছিল, 'স্যার, ক্যান ইউ সিভ মি শেলটার, ক্যান ইউ গিভ মি ফুড?' সুনীলের চোখের সামনে পৃথিবীটা অন্ধকার মনে হয়। ৩ আগস্ট, সুনীল বিদ্যার ঘটনাসমূহ বিস্তৃতভাবে জানিয়ে ডি·জি· ওয়েস্টবেঙ্গল পুলিশের কাছে বিদ্যার উদ্ধারের চেষ্টা করবার আবেদন জানায়।

আগ্রা থেকে এবার চিঠি আসে সুনীলের কাছে, 'এসড মি স্যার, রেসকিউ মি।' ২১ আগস্ট সুনীল আগ্রা রওনা হয়ে যান। বাওয়ালি টেম্পল রোডে বিদ্যা সুনীলের দেখা হয় মাত্র কয়েক মিনিটের জন্য। সেখানে বিদ্যা কান্নায় ভেঙে পড়ে। কিন্তু সেদিন আর বেশি কথা হবার উপায় ছিল না। বিদ্যার মামা তত্ক্ষণে বিদ্যার সামনে এসে পড়েছেন। সুনীলের চোখের সামনে দিয়েই বিদ্যাকে নিয়ে চলে গেলেন বিদ্যার মামা। কিছুক্ষণ বিমূঢ়ভাবে তাকিয়ে থাকার পর সুনীল বুঝলেন, তাঁর সারা শরীর হিম হয়ে গেছে।

৫০ আগস্ট ১৯৮৮। আগ্রার ডি·এম· এবং এস·এস·পির সঙ্গে দেখা করেন সুনীল। বিদ্যার ঘটনাগুলি বিশদ জানালেন তাঁদের কাছে। কিন্তু এরপরও তেমন কোন প্রতিক্রিয়া দেখা গেল না। বাধ্য হয়ে সুনীল খড়গপুরে ফিরে এলেন। ২২ অক্টোবর ১৯৮৮। সুনীল এবার ডি·জি· ওয়েস্টবেঙ্গল পুলিশের কাছে একটি চাঞ্চল্যকর চিঠি জমা দিলেন অভিযোগপত্রের সঙ্গে। চিঠিটিতে নানক রাম সহকর্মীদের যে যে নির্দেশ পাঠিয়েছেন বিদ্যা এবং সুনীল বিষয়ে, তার সত্যতা নিশ্চিত শুধু তাই নয়, চিঠিটিতে পশ্চিমবাংলার

কোচ সুনীলকে লেখা বিদার চিঠি

পুলিশের কাছে সুনীল দত্তের অভিযোগপত্র

পুলিশ এবং উত্তর প্রদেশের পুলিশকে অর্থের লোভে বশ করানোর প্রস্তাব ইঙ্গিত রয়েছে। আর রয়েছে সুনীলকে মিথ্যে কেসে ফাঁসিয়ে দেওয়ার কথা। বিদার বার্থ সার্টিফিকেট জাল করে সাবালিকা বিদ্যাকে ফুসলিয়ে বাড়ি ছাড়া করার অভিযোগে কোচ সুনীল দত্তকে ফাঁসিয়ে দেওয়া। অথচ বিদার স্কুল সেন্ট আগনেস স্কুলের অ্যাডমিশন রেজিস্টারে বিদার জন্ম তারিখ ১৪·২·৭০ অর্থাৎ বিদা এখন ১৯৮৮ তে আঠার বছরের সাবালিকা।

হঠাৎই ২ নভেম্বর রাত্রে ঘটে গেল এক অভাবিত ঘটনা। রাতে খেয়ে দেয়ে বাড়ি ফিরছেন সুনীল। পেছন থেকে হঠাৎই একটি অ্যামবাসাডর ধাক্কা মারে সুনীলকে। রাস্তার ধারে ছিটকে পড়েন সুনীল। সুনীল দেখেন অ্যামবাসাডরটির হেড লাইট নেভানো। অ্যামবাসাডর থেকে ছ'জন লোক সুনীলের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। সুনীল প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তাদের মোকাবিলা করেন। অ্যামবাসাডরটি আবারও সুনীলের পেছু ধাওয়া করে। অ্যামবাসাডর থেকে কথা ভেসে আসে-'ব্যাটা শেষ করতেই···খুব চাল খেলতে শিখেছে!'

খড়্গপুরের পুলিশে বারংবার অভিযোগ করেও কোন সাহায্য পেলেন না সুনীল। বাধ্য হয়ে ৩ নভেম্বর ডি-জি-র কাছে এফ-আই-আর লেখান।

কোচ সুনীল, টেনিস ছাত্রী বিদাকে নিয়ে সমস্যার জট এখন চরমে। খড়্গপুর টাটা বিয়ারিং-এর অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার নানক রাম প্রিথিয়ানি থেকে শুরু করে ঘটনা গড়িয়েছে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ এবং উত্তরপ্রদেশের পুলিশের হাতে। ঘটনার সঙ্গে জড়িয়েছে কংগ্রেসের মুখ্য সচেতক জ্ঞান সিং সোহনপালের নামও। এদিকে প্রিথিয়ানির পুলিশকে প্ররোচিত করার চেষ্টা, জাল বার্থ সার্টিফিকেট প্রভৃতির ষড়যন্ত্রে পড়ে বাংলার প্রতিশ্রুতিময়ী টেনিস খেলোয়াড় বিদার প্রাণ ওষ্ঠাগত।

প্রিথিয়ানি এবং তাঁর পরিচিতবর্গ সুনীলের নামে ক্রমাগত অপপ্রচার চালিয়ে যাচ্ছেন, সুনীল বিদাকে প্রলুব্ধ করেছেন, নিজের স্ত্রীকে ডিভোর্স করেছেন, সুনীল দুশ্চরিত্র, প্রলোভন দেখিয়ে বিদাকে নিজের দিকে টানছেন। একটি মেয়ের জীবন নিয়ে তিনি ছিনিমিনি খেলতে চাইছেন। যদি শুধুমাত্র কোচ এবং ছাত্রীর সম্পর্কই থাকত দু'জনের মধ্যে তাহলে একজন ছাত্রীকে তার পরিবার খেলতে না দিলে কোচের এত মাথা ব্যথা থাকবে কেন?

এদিকে সুনীল জানান তিনি চেন বিদাকে ইন্ডিয়ায় একটি ফিগার তৈরি করতে। অন্য কোন কিছুই চান না তিনি।

অথচ একথাও ঠিক, সুনীল এবং বিদার সম্পর্কে নিশ্চয়ই ঘনিষ্ঠতা এসেছে। না হলে একটি কোচ শুধু এক ছাত্রীকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে বলে টাটা বিয়ারিং এর টপ অফিসারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে যাবে কেন?

ঘটনা যাই হোক না কেন, এবার চাঞ্চল্য সৃষ্টি হচ্ছে এই বিষয় যুদ্ধে কে জিতবেন? প্রিথিয়ানি না টেবিল টেনিস কোচ সুনীল দত্ত? কিন্তু বিরোধের মধ্যে থেকে বিদার মত একটি টেবিল টেনিস প্রতিভা ঝরে না গেলেই হয়। আমরা তাকিয়ে আছি সেই শুভক্ষণের দিকে যেদিন বিদা আবার টেবিল টেনিসে ফিরে এসে বাংলাকে একটি মানে পৌঁছে দেবে। টাটা বিয়ারিংস-এর নানক রাম প্রিথিয়ানি কিংবা কোচ সুনীল দত্তের বিরোধে যাতে বিদার মত সম্ভাবনা এবং প্রতিশ্রুতিরা না হারিয়ে যায় প্রশাসনের কাছে সাধারণ মানুষেরা এটুকুই আশ্বাস প্রার্থনা করে।

গুরুপ্রসাদ মহান্তি

আল্লাহ'র নীরব প্রহার

থরথরিয়ে কেঁপে উঠল বৃদ্ধা। তার সেই পাখির পায়ের চিহ্ন আঁকা মুখের দিকে তাকিয়েও এক কালের বাঘা পুলিশ অফিসার হায়াৎ সাহেবের নিশ্চিৎ মনে পড়ছিল অনেক বছর আগের সেই সম্ভ্রান্ত উচ্ছল তরুণী-বধূ জমিলার কথা। কিন্তু কেন আজ জমিলা পেন্সিল ফেরি করে বেড়ায়? তার মুখে আজ কোন পাপের স্বীকারোক্তি?

তারিখটা ছিল ১৯৮৫'র ২০শে নভেম্বর। আমি আমার নাতিকে নিয়ে কিছু কেনাকাটা করবার জন্য বাজারে গিয়েছিলাম, একটা দোকান থেকে বেরিয়ে দেখি এক বৃদ্ধা কলম পেন্সিল ফেরি করে বেড়াচ্ছে। বৃদ্ধাটি আমাকে অনুরোধ করল নাতির জন্য ওর কাছ থেকে কিছু কেনবার জন্য।

বৃদ্ধার দিকে ভাল করে তাকালাম। সাদা চুল, জীর্ণশীর্ণ চেহারা, ময়লা পোশাক এবং তার পায়ে পুরনো রবারের চটি। এক হাতে ময়লা একটা থলি, আরেক হাতে ধরা রয়েছে কয়েকটা কলম, পেন্সিল। আমি কিছু কিনব না বলে চলে যেতে উদ্যত হলাম। কিন্তু আমার পঞ্চদশবর্ষীয় নাতিটির আগ্রহে দু'একটা পেন্সিল কিনতেই হল। হঠাৎ লক্ষ্য করলাম বৃদ্ধাটি আমার দিকে সাগ্রহে তাকিয়ে আছে। ইতস্তত করে সে আমাকে প্রশ্ন করল, 'সাহেব, একটা কথা জিগ্যেস করবো?' এবার তার মুখটা আমার যেন সামান্য চেনাচেনা লাগলো। অনুমতি দিলাম।

'আপনি কি থানার বড়বাবু ছিলেন কখনো?' বৃদ্ধার প্রশ্ন।

আমার নাতি সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধাকে জানালো, 'নানাজী খুব কড়া পুলিশ অফিসার ছিলেন, লোক খুব ভয় পেত, জানো।'

বৃদ্ধা প্রশ্ন করল, 'আপনি কি মালিক হায়াৎ সাহেব?'

আমি একটু বিস্মিত হয়ে বললাম, 'তুমি কি ভাবে চিনলে আমায়?'

বৃদ্ধা উত্তর দিল, 'আমার নাম জমিলা, শেখুপুরা জেলায় আমার বাড়ি।'

দেশবিভাগের পর কিছু সময়ের জন্য শেখুপুরায় একটি ছোট্ট অঞ্চলে আমার পোস্টিং হয়েছিল। দু'এক মুহূর্ত ভাবলাম, মনে পড়ল, একটা খুনের কেসে জমিলা জড়িয়ে পড়েছিল।

'তুমি চৌধুরী ফজল মহম্মদের মেয়ে জমিলা?'

'না সাহেব, উনি আমার চাচা, আমার বাবা ছিলেন চৌধুরি ফৈজ মহম্মদ।'

আমার স্মৃতিতে সেদিনের সব ঘটনা ধীরে ধীরে ফুটে উঠতে থাকে। আমি বিস্মিত কণ্ঠস্বরে বৃদ্ধাকে প্রশ্ন করলাম, 'তুমি সেই সুন্দরী জমিলা! এ-ও কি সত্যি? কি করে হল এ অবস্থা তোমার, এত বড় ঘরের মেয়ে তুমি?'

বিষণ্ণ কণ্ঠে জমিলা বলল, 'হ্যাঁ সাহেব আমি সেই হতভাগিনী। জমিলা। এ অবস্থা কেন হল সে

৫৫ পৃষ্ঠায় দেখুন

জ্যোতি বসু, পাঁচ দশকের রাজনৈতিক ইতিহাস

আক্রমণের মুখে জ্যোতি বসু ও তাঁর পরিবার!

সংবাদ মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গের ফার্স্ট ফ্যামিলি আক্রান্ত

পরিবারের লোকজনের সঙ্গে: অন্তরঙ্গ জ্যোতি বসু

পশ্চিমবঙ্গের 'ফার্স্ট ফ্যামিলি' অর্থাৎ হিন্দুস্থান পার্কের বসু পরিবারের প্রায় প্রতিটি সদস্য এবং তাঁদের আত্মীয় স্বজনদের বিরুদ্ধে কয়েকজন সাংবাদিক এবং কয়েকটি পত্রপত্রিকা ধারাবাহিক ভাবে দুর্নীতির অভিযোগ সম্বলিত আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছেন। বামফ্রন্টের ছোট শরীকেরা, সি পি এম এবং খোদ জ্যোতি বসু বলছেন 'এসব সাংবাদিক আমলাদের নিয়ে কংগ্রেসের চক্রান্ত', অন্যদিকে বামশরীক আর এস পি-র নেতা, সাংবাদিককুল এবং কংগ্রেস নেতৃত্ব বলছেন 'জ্যোতি বসুর ধবধবে হাত এখন দুর্নীতির পাঁকে ময়লা।' আসলে কারা সত্যি বলছেন? কিসেরই বা চক্রান্ত? আগামী সাধারণ নির্বাচনের আগে এ বিষয়ে কংগ্রেসেরই কোনও ভূমিকা আছে কি? পশ্চিমবঙ্গের জনমানসে জ্বলন্ত এইসব প্রশ্নগুলির উত্তর সন্ধানে বিশ্লেষণাত্মক আলোকপাত।

উত্তাপটি ক্রমেই পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক মহল্লা থেকে সারা ভারতবর্ষের জনমানসে সঞ্চারিত হচ্ছিল। ১৩ বছর ধরে সৎ ও পরিচ্ছন্ন প্রশাসনের কথিত নায়ক জ্যোতি বসু হঠাৎই পশ্চিমবঙ্গের সাত সাংবাদিকের কল্যাণে চলতি বছরের সেপ্টেম্বর মাস থেকে সম্মুখীন হলেন সাতটি মারাত্মক দুর্নীতির অভিযোগের। আলিপুর ট্রেজারি তছরূপ, রতন স্কোয়ার নির্মাণ, বেঙ্গলল্যাম্পকে অর্ডার পাইয়ে দেওয়া, ট্রাম-কোম্পানির বিদেশি মালিকদের স্বার্থরক্ষা করা, ফ্লোটেল হোটেল নির্মাণ, গ্যাস টারবাইন আনয়ন এবং টেক্সম্যাকোকে রোড রোলার দেওয়ার বিষয় নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তোলেন সাংবাদিক বরুণ সেনগুপ্ত, কান্তি চৌধুরী, প্রণয় শংকর হালদার, শুভ্রাংশু গুপ্ত, তাপস গঙ্গোপাধ্যায়, এস·এম·এন· আবদি এবং সঙ্গীতা ভট্টাচার্য। এরপর এই অভিযোগের স্রোত গড়াতে গড়াতে জ্যোতি বসুর পরিবারের লোকজনদেরও আক্রমণ করে। আক্রান্ত হন পত্নী কমল বসু, পুত্র চন্দন বসু, পুত্রবধূ ডলি বসু, শ্যালিকা মঞ্জুলা রায়, শ্যালক বি·এন· বসু এমনকি দুই ছোট্ট নাতনী কোয়েল পায়েলও। কিন্তু ঠিক ১৩ বছরের মাথায় জ্যোতি বসু সহ তাঁর পুরো পরিবার বর্গের প্রতি সংবাদ জগতের কেনই বা এই ধারাবাহিক আক্রমণ? এই প্রশ্নটি সুকৌশলে তুলে দিয়ে রাজ্য সি পি এম নেতৃত্বের বিমান বসু—সরোজ মুখার্জিরা খুঁজে পেয়েছেন 'সাংবাদিক-আমলা-কংগ্রেসী চক্রান্তের' গন্ধ। সি পি এম-এর তরফে উত্থিত এই চক্রান্তের বক্তব্যকে ইদানীং সমর্থন করছেন বামফ্রন্টের ছোট শরিক সোসালিস্ট পার্টি এবং মার্ক্সবাদী ফরোয়ার্ড ব্লক। আবার এই বিষয়েই আশ্চর্যজনক ভাবে চুপ করে আছে

মুখ্যমন্ত্রীজায়া শ্রীমতী কমল বসু

বামফ্রন্টের তিন বড় শরিক সি পি আই, ফরোয়ার্ড ব্লক এবং আর এস পি। সি পি এম নেতৃত্বের কেউ কেউ আরও এক কাঠি উপরে চড়ে গিয়ে শরিক দল আর এস পি-রও কাউকে কাউকে এই চক্রান্তের অংশীদার বলে মার্ক করে দিচ্ছে। ফলত জ্যোতি বসুর সমর্থকবৃন্দ এবং জ্যোতি বসুর বিরোধীদের দুই বিপরীতমুখী বক্তব্যের মাঝখানে পড়ে সাধারণ মানুষ সত্যের সন্ধানে নেমে হাবুডুবু খাচ্ছেন রাজনৈতিক ধন্ধে। ট্রামে-বাসে, কাফে রেস্তোরাঁয়, অফিস–কাছারিতে, অহরহ প্রশ্ন উঠছে সত্যি কি জ্যোতি বসু দুর্নীতিপরায়ণ? সত্যি কি সাংবাদিকরা চক্রান্তকারী? কংগ্রেস কি সত্যি সত্যি পেছন থেকে কলকাঠি নাড়ছে? কোন কোন আমলা অফিসার জ্যোতি বসুর বিরুদ্ধে চক্রান্তে জড়িত? জ্যোতি বসুর পুত্র, পুত্রবধু, স্ত্রী, শ্যালিকা, শ্যালক সাংবাদিক কথিত এইসব কেলেংকারিতে যুক্ত? কিসের জন্যই বা এত সাবধানে গড়ে উঠল চক্রান্তের বুনিয়াদ?—বর্তমান প্রতিবেদনে আলোকপাত সেই সংশয়েরই অবসান করে প্রকৃত সত্য সন্ধানের চেষ্টা করছে।

১৮ সেপ্টেম্বর বামফ্রন্ট মন্ত্রীসভার পূর্তমন্ত্রী যতীন চক্রবর্তীর কনফিডেনশিয়াল নোটটি সংবাদপত্রে প্রকাশ হয়ে যাওয়া মাত্রই জ্যোতি বসুর বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ নিয়ে হইচই শুরু হয়ে যায়। আসলে এটি কিন্তু জ্যোতিবাবুর বিরুদ্ধে সাংবাদিকদের তৃতীয় রাউণ্ডের লড়াই। প্রথম দু'টি রাউণ্ড হয়ে গিয়েছে ১৯৮৭ সালের ২০ মে এবং ১৯৮৭ সালের ১ সেপ্টেম্বর তারিখে। প্রথমটিতে কোলফিল্ড টাইমস পত্রিকায় প্রলয় শংকর হালদার প্রতিবেদন পেশ করেন তথ্যসহ যে, আলিপুর ট্রেজারি থেকে পাঁচটি ডুপ্লিকেট কার্বন রিসিট বুকের সাহায্যে জ্যোতি বসুর রাজনৈতিক সচিব অশোক বসু কোটি টাকা নয়ছয় করেছেন। (আলোকপাত: জুলাই '৮৭ সংখ্যা দ্রষ্টব্য) পরে টেলিগ্রাফের সম্পাদক এম·জে· আকবর তা নিয়েই হইচই করেন। আর দ্বিতীয়টি কেন্দ্রিয় বাণিজ্য দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সী ১, ২ এবং ৫ সেপ্টেম্বর '৮৭ তারিখগুলির সাংবাদিক সম্মেলনগুলিতে রঙন স্কোয়ারসহ পার্ক প্লট ডিলে ৫০০ কোটি টাকা কাটমানি খাওয়ার অভিযোগ করেন (আলোকপাত: নভেম্বর '৮৭ সংখ্যা দ্রষ্টব্য)।

এই দু'টি মারাত্মক অভিযোগ উঠলেও

রাজ্য সি পি আই এম-এর উঁচুমহল: জ্যোতি বসু ও সরোজ মুখার্জি

ছবি: গোপাল দেবনাথ

তদানীন্তন জনমানস ৫০ বছরের পরিচিত সততার প্রতিমূর্তি জ্যোতি বসুর সম্পর্কে এসব কথাকে খুব একটা আমল দেয় নি। কিন্তু জ্যোতি বসু মন্ত্রীসভার পূর্তমন্ত্রী যতীন চক্রবর্তীর ওই ফাঁস হয়ে যাওয়া নোটে যখন দেখা গেল যে 'মুখ্যমন্ত্রী পুত্র চন্দন বসু যখন বেঙ্গল ল্যাম্পে চাকরি করতেন তখন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর নির্দেশেই পূর্তদপ্তর বেঙ্গল ল্যাম্পকে বেশি অর্ডার দেন। বেঙ্গল ল্যাম্পের ম্যানেজিং ডিরেক্টর তপন রায়কে সঙ্গে নিয়ে একদিন চন্দন বসু পূর্তমন্ত্রী যতীন চক্রবর্তীর কাছে আসেন। এবং তপনবাবু পূর্তমন্ত্রীকে অনুরোধ করেন রাজ্য সরকার যেন প্রয়োজনীয় সব বাল্ব তাদের কোম্পানি থেকেই কেনেন। পূর্তমন্ত্রী বিষয়টি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করেন। মুখ্যমন্ত্রী তাঁকে বলেন ওই কোম্পানি থেকেই যত বেশি সম্ভব বাল্ব কেনা হোক। তবে এ সম্পর্কে কোন ফাইলে যেন কিছু উল্লেখ না থাকে।

অভিযোগ এরপর হঠাৎই মুখ্যমন্ত্রী ১৯·৮·৮৮ তারিখে একটি কনফিডেনশিয়াল নোটে পূর্তমন্ত্রীর কাছে জানতে চান যে কেন তিনি অন্যান্য কোম্পানিকে যতখানি সুবিধা দিচ্ছেন তার চেয়ে বেঙ্গল ল্যাম্পকে বাড়তি সুবিধা দিচ্ছেন? মুখ্যমন্ত্রী আরও জানান, বাইরে থেকে সরকারি জিনিস কেনা সম্পর্কে বামফ্রন্ট সরকারের যে পরিচ্ছন্ন নীতি আছে পূর্তদপ্তর অবশ্যই তা যেন মেনে চলে। জবাবে ২৬·৮·৮৮ তারিখে পূর্তমন্ত্রী নোটে উপরিউক্ত কথা লেখেন। এরপর ১৮ সেপ্টেম্বর সাংবাদিক কান্তি চৌধুরী আনন্দবাজারে উক্ত নোট দু'টি সহ বেঙ্গল ল্যাম্প কেলেংকারিটি প্রকাশিত করেন। এবং রাজ্য জুড়ে হইচই শুরু হয়। নানান তদন্তের দাবির প্রেক্ষাপটে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে অর্থমন্ত্রীকে দিয়ে তদন্ত করানো হয়। তদন্ত রিপোর্টে অর্থমন্ত্রী লেখেন 'নিজের অপকীর্তি চাপা দিতেই পূর্তমন্ত্রী এই ধরনের বিতর্কিত নোট দেন। এবং উদ্দেশ্যমূলকভাবে, মুখ্যমন্ত্রীর চরিত্রহনন করেন' (তদন্ত রিপোর্টের কপি সংলগ্ন করা হল)। এরপর পূর্তমন্ত্রী অর্থমন্ত্রীর তদন্ত রিপোর্টকে উদ্দেশ্য প্রণোদিত বলে বর্ণনা করেন এবং নিজের স্ট্যাণ্ডে অটুট থেকেও মন্ত্রীসভা থেকে পদত্যাগ করেন।

এরপরই নভেম্বর মাসের তৃতীয় সপ্তাহে 'দা ইলাসট্রেটেড উইকলি'র বিশেষ সংবাদদাতা এস এম এন আবদি একযোগে 'ইলাসট্রেটেড উইকলি' এবং 'আজকাল' পত্রিকায় পদত্যাগী পূর্তমন্ত্রী যতীন চক্রবর্তীর চাঞ্চল্যকর ইণ্টারভিউয়ের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে পূর্তদপ্তর থেকে টেক্সম্যাকো কোম্পানিকে ৬টি রোড রোলারের অর্ডার দেওয়ার বিষয়টি সরকারি নোটের তথ্যসহ প্রকাশ করেন। এই সাক্ষাৎকারে পদত্যাগী পূর্তমন্ত্রী যতীনবাবু জানান, 'মিথ্যার সঙ্গে আপোষ করতে পারেন নি

BELTEK

জ্যোতি বসু : সালতামামি

১৯১৪ সালের ৮ জুলাই, মহাত্মা গান্ধী রোডের বসু পরিবারে জ্যোতি বসুর জন্ম। ডাল নাম জ্যোতি কিরণ। বাবা ডাঃ নিশিকান্ত বসু, মা হেমলতা দেবী। ঠাকুরদার চাকরিসূত্রে বাবা কাকারা আসামের ধুবড়িতে বসবাস করলেও পৈত্রিক বাড়ি ছিল ঢাকা জেলার 'বারদি'তে।

শিক্ষার জন্য কৃতী ছাত্র জ্যোতি বসু প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বি এ পাস করার পরই চলে যান বিলেতে।ICS-এর সদস্য হতে। কিন্তু পরে মিডল টেম্প'লে ব্যারিস্টারি পড়া শুরু করেন।

লণ্ডনে থাকাকালীন তাঁর মনে রাজনৈতিক রেখাপাত হয়। ইণ্ডিয়া লীগের সক্রিয় সদস্য ভি·কে· কৃষ্ণমেনন, ব্রিটিশ কম্যুনিস্ট পার্টির নেতা রজনী পাম দত্ত ও হ্যারি পলিট, ক্লিমেন্স দত্ত, বেন ব্রাডলি প্রমুখের সংস্পর্শে এসে তাঁর মনের সুপ্ত রাজনৈতিক বাসনার অঙ্কুরোদ্গম ঘটে।

১৯৪০ সাল, দেশে ফিরলেন জ্যোতি বসু। বাবার ইচ্ছায় বিখ্যাত ব্যারিস্টার বি এন দত্তরায়ের জুনিয়র হিসেবে কাজও শুরু করেন। কিন্তু জ্যোতি বসুর মনে তখন অসহায় জনগণের পাশে দাঁড়ানোর টান। মন বসল না কাজে। লুকিয়ে পার্টির কাজ চালালেন পুরোদমে। শুরু হল রেলওয়ে ট্রেড ইউনিয়ান সংগঠনের মধ্য দিয়ে। বহু ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্যেও তার উদ্দাম প্রচেষ্টা পশ্চিমবঙ্গের জনমানসের সামনে কম্যুনিস্ট আন্দোলনকে অব্যাহত রাখে। ১৯৪৮ সালে স্বাধীন ভারতবর্ষে কম্যুনিস্ট পার্টি বে আইনি ঘোষিত হলেও জ্যোতিবাবু গোপনে সংগঠনের কাজ চালিয়ে গেছেন। নির্দ্বিধায় সহ্য করেছেন শাসক শ্রেণীর অত্যাচার, জেল। ১৯৫০ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি কম্যুনিস্ট পার্টি বৈধ বলে ঘোষিত হলে জ্যোতিবাবুর উদ্যোগেই কম্যুনিস্ট পার্টি নির্বাচনে অংশ নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। এরপরই শুরু হয় পার্টির মধ্যেকার নানান টানাপোড়েন, বহু ত্যাগ, তিতিক্ষা ও দীর্ঘ সংগ্রামের বহু চড়াই উৎরাই পথ পেরিয়ে অবশেষে জয় হলো জ্যোতিবাবুরই। ১৯৭৭-এ এলো পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্টের সুদিন। ততদিনে জ্যোতি বসু পশ্চিমবঙ্গের জনমানসে এক দুর্লভ ব্যক্তিত্ব।

প্রকৃতপক্ষে ভারতের রাজনৈতিক মঞ্চে তিনি অদ্বিতীয় আত্মমর্যাদা সম্পন্ন মানুষ। সাহসী, স্পষ্টবক্তা এবং অবশ্যই অনুকরণীয় রাজনৈতিক সততার অধিকারী। জীবনে একবার যা সত্য বলে জেনেছেন কোন প্রলোভন বা উত্থান পতনেও তার বিচ্যুতি ঘটেনি। বর্ণচোরা নন তিনি, এই বৃদ্ধ বয়সেও যুবকের মত টানটান ঋজু। সত্য সে যতই নিষ্ঠুর এবং কঠিন হোক তাকে স্বীকার করার মানসিকতা তাঁর বরাবর। তাই বিরোধী দলের বিতর্কিত কংগ্রেস বিধায়ক সুব্রত মুখার্জিও বলেছিলেন, 'আসলে জ্যোতি বসু জ্যোতি বসুই। দি জ্যোতি বসু।' সংসদীয় রাজনীতির সরকারপক্ষ বিরোধীপক্ষের সকলেই তাঁকে একডাকে চেনে।

শুধু বিরোধী নেতারাই কেন, সাংবাদিক, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবীরাও জ্যোতি বসুর প্রশস্তিতে মুখর। তা না হলে রাজনৈতিক প্রতিবেদক হিসেবে যারা দাপটে চষে বেড়ান, জ্যোতি বসুর সামনে এলে সমস্ত দাপট কেনইবা নিতান্ত বেসুরের বালখিল্য সুলভ মনে হয়? তাবড় তাবড় মন্ত্রী রাজনৈতিক নেতা যেখানে খবরের কাগজে নিজেদের পাবলিসিটির জন্য সাহায্য চান, সেখানে জ্যোতি বসু কিন্তু তার ঠিক উল্টোটাই। তিনি যে আদপেই তার পক্ষপাতী নন তা তাঁর চাঁছাছোলা ব্যবহারই প্রমাণ করে। দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে সংবাদপত্রের দ্বারস্থ হওয়ার কথা স্বপ্নেও কল্পনা না করেই তিনি প্রাত্যহিক সংবাদপত্রের শিরোনাম। সোজা কথায় বড় কাগজের মাতব্বরকেও তিনি অনায়াসে শুনিয়ে দিতে পারেন–'আপনারা তো কাল মিথ্যে লিখবেন। তা লিখুন, কিন্তু মানুষ আপনাদের কথা বিশ্বাস করে না।' ১৯৮৭-র বিধান সভা নির্বাচন তারই প্রমাণ। দীর্ঘ ৫০ বছরের রাজনৈতিক ইতিহাসে তিনি অনেক ঝড়ঝাপটা সহ্য করেছেন, হয়তো সাম্প্রতিক অভিযোগ প্রত্যাভিযোগের মধ্যে তিনি অবিচল দাঁড়িয়ে থাকবেন তাঁর ঋজুতা নিয়ে।

বলেই পদত্যাগ করেছেন।'

এর মধ্যে ৪ নভেম্বর 'বর্তমান' পত্রিকায় বরুণ সেনগুপ্ত এবং 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় কান্তি চৌধুরী লেখেন, 'অফিসারদের তীব্র আপত্তি সত্ত্বেও জ্যোতি বসুর নির্দেশে ট্রাম কোম্পানির বৃটিশ মালিক ও বিড়লার জামাই এস কে পোদ্দারকে ১ কোটি ৩২ লক্ষ টাকা পাইয়ে দিয়েছেন।' এবং এর ফলে অধিগ্রহণ আইনকে অগ্রাহ্য করা হল ও ভারতীয় অংশীদাররা বঞ্চিত হয়ে যাবার সম্ভাবনা রইল। আরও আশ্চর্যের বিষয় আদালত ও আইনজীবী-দের ভূমিকা কি নেওয়া হবে তা ঠিক করার বিষয়ে মন্ত্রী বা সচিব পদমর্যাদার ব্যক্তি ব্যতিরেকেই নির্দেশ দিলেন তদানীন্তন পরিবহন মন্ত্রীর পি এ দীপ্তেন্দু মল্লিক।

একদিকে যখন জ্যোতি বসুকে জড়িয়ে সংবাদ মাধ্যমে একের পর এক দুর্নীতির খবর চাউর হচ্ছে তখন অন্যদিকে গঙ্গায় ভাসমান নির্মীয়মান ফ্লোটিলা হোটেলকে কেন্দ্র করে চন্দন বসু এবং পূর্ণদাস রোডের ৩৮ নং বাড়িকে কেন্দ্র করে পুত্রবধূ ডলি বসুর বিরুদ্ধে প্রতিবেদন পেশ করলেন 'দ্য উইক' পত্রিকার তাপস গঙ্গোপাধ্যায় এবং 'বর্তমান' পত্রিকার সঙ্গীতা ভট্টাচার্য। ফ্লোটিলা হোটেল প্রসঙ্গে অভিযোগে বলা হল যে মানবেন্দ্র নাথ পালের সঙ্গে পুত্র চন্দন বসু এবং শ্যালিকা মঞ্জুলা রায়ের যৌথ মালিকানাতে এই হোটেল করার জন্য মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু নাকি ওয়েস্ট বেঙ্গল ফিনানসিয়াল কর্পোরেশনকে দিয়ে প্রায় ১২ কোটির মত সরকারি লোন পাইয়ে দিয়েছেন ক্ষমতার অপব্যবহার করে! অন্যদিকে ২ ডিসেম্বর সঙ্গীতা ভট্টাচার্য লিখলেন, 'জ্যোতিবাবুর পুত্রবধূ ডলি বসু গড়িয়াহাট এলাকায় ৩৮ নং পূর্ণদাস রোডে কলকাতা কর্পোরেশনের অ্যাসেসমেন্ট দপ্তরকে এড়িয়ে পুর আইন ভেঙে 'মল্লিকা' নামের একটি শাড়ির দোকান করেছেন! অ্যাসেসমেন্ট দপ্তরের নথিতে উক্ত নাম্বারের বাড়িটি 'ডোয়েলিং' পার্পাসে (রেসিডেনশিয়াল পাপার্সে) ব্যবহৃত। প্ল্যান স্যাংশন নং ১০৬ (১৯৮০-

৮১) তারিখ ৩·১·৮১। সংশোধিত প্ল্যান স্যাংশন নং ২০৯ (১৯৮১-৮২) তারিখ ৩০·১১·৮১। আসলে অনুমোদিত প্ল্যানের এই পার্কিং প্লেসটিকে ব্যবহার করা হচ্ছে শাড়ির দোকান হিসাবে ব্যবসায়িক স্বার্থে। অথচ পুরসভার বিল্ডিং দপ্তরের এ প্রসঙ্গে বক্তব্য যে 'বসত বাড়ির জন্য কোন প্ল্যান অনুমোদিত হলে সেই বাড়িটিকে কমার্শিয়াল বা ব্যবসায়িক কাজে ব্যবহার করা যায় না। কমার্শিয়াল কাজে তাকে ব্যবহার করতে হলে পুরসভার অনুমোদন নিতে হয়। কারণ, বাড়ির মালিক তার বাড়িটিকে কমার্শিয়াল কাজে লাগালে সেই বাড়ির অ্যাসেসমেন্ট বসত বাড়ির অ্যাসেসমেন্টের তুলনায় অনেক বেশি হবে। এক্ষেত্রে বসত বাড়ি দেখিয়ে অ্যাসেসমেন্ট চার্জ কম করে দেখানো হয়েছে।'

'বর্তমান' পত্রিকায় সঙ্গীতা ভট্টাচার্যের জ্যোতি বসুর পুত্রবধূকে জড়িয়ে ওই প্রতিবেদনটি প্রকাশিত হওয়ার পরদিনই আসরে নামে 'দ্য টেলিগ্রাফ'। ৩ ডিসেম্বর সংখ্যায় শুভাংশু গুপ্ত প্রকাশ করেন, সরকারি টেণ্ডার নিয়ম অগ্রাহ্য করে এবং রাজ্য সরকারের ৬ কোটি টাকা ক্ষতি করে একটি অধিগৃহীত সরকারি সংস্থা 'এসেনসিয়াল কমোডিটিস সাপ্লাই কর্পোরেশন (ই সি এস সি)' উত্তর কোরিয়ার একটি সংস্থার সঙ্গে ৩৬ কোটি টাকা সিমেন্ট ডিল করে, অভিযোগ এ ব্যাপারে মধ্যস্থতা করেন জ্যোতি বসুর শ্যালক মিঃ বি·কে· বসু। ইতিমধ্যেই এ বিষয়ে তদন্তের আদেশ দিয়েছেন সি·এ·জি· আই। জ্যোতি বসুর শিবির থেকে বলা হয়েছে ওই নামে তাঁর কোন শ্যালকই নেই।

প্রথিতযশা সাংবাদিকদের প্রতিবেদনে যখন জ্যোতি বসু এবং তার পরিবারের একেকজন জড়িয়ে যাচ্ছেন তখন মুখ্যমন্ত্রী পত্নী শ্রীমতী কমল বসুর তারকেশ্বর যাত্রা নিয়ে বর্তমান পত্রিকা এক বিতর্কিত বিষয়ের অবতারণা করল। কলকাতা থেকে ট্রেন যোগে তারকেশ্বর মন্দির যাওয়ার সময় মুখ্যমন্ত্রী পত্নীর কামরায় নাকি পুলিশ লাঠিচার্জ করে সাধারণ যাত্রীদের হটিয়ে দেয়। এ নিয়ে কংগ্রেসী বিধায়ক সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় তদন্তের দাবি জানালেন। মুখ্যমন্ত্রীপত্নী এবং পুলিশ কর্তারা সংবাদে প্রকাশিত বিবরণের সত্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুললেন। বিতর্ক তবু চলতেই লাগল।

কিছুদিন আগে মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর দুই নাতনী কোয়েল বসু ও পায়েল বসু একটি বিস্কুট কোম্পানির হয়ে মডেলিং করেছিল। এটি ছিল নেহাৎই সখের ব্যাপার। বিষয়টি মোটেই ব্যবসায়িক ভিত্তির উপর সম্পৃক্ত ছিল না। অথচ বিভিন্ন সংবাদপত্রের পাতায় তাকেই ফলাও করে দিনের পর দিন ছাপা হতে শুরু করল।

১৯৮৭-৮৮, এই দু বছর ধরেই জ্যোতি বসু তথা তার পরিবার পরিজন ধারাবাহিকভাবে সংবাদমাধ্যমের মধ্য দিয়ে বিতর্কিত হয়ে উঠতে লাগলেন। বাধ্য হয়ে বিব্রত জ্যোতি বসু মুখ খুলতে

চন্দন বসু: দুই মেয়ের সঙ্গে ছবি: প্রদীপ দাস

শুরু করলেন সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে। এবং সি পি আই (এম) নেতারা সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে বিবৃতির লড়াই-এ আরও এক কাঠি এগিয়ে গেলেন। সরোজ মুখার্জি হুংকার দিলেন 'আনন্দবাজার ও বর্তমানকে দেখে নেব।' জ্যোতি বসু স্বয়ং ভদ্র ও সৌম্য ভাবে জানালেন, 'আনন্দবাজার পত্রিকা' আমার বিরুদ্ধে কুৎসা রটিয়ে এবং মিথ্যা সংবাদ ছাপিয়ে বামফ্রন্ট সরকারকে ভাঙতে পারবে না। ওরা চুরি করে এখান ওখান থেকে কাগজপত্র ছাপছে। সমস্ত মিথ্যা কথা। আমরা ওদের দয়ায় ক্ষমতায় আসি নি।' মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, 'কংগ্রেস যা পারছে না, 'আনন্দবাজার' সেই দায়িত্ব নিয়েছে। 'আনন্দবাজার' ভাবছে, বামফ্রন্ট এবং সি পি এম-এর নেতা মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে কুৎসা রটিয়ে সরকার ভেঙে দেবে। আমি বলি, অত সহজে কি ভেঙে দেওয়া যায়? আমরা মানুষের ভোট পেয়ে এসেছি। কুৎসা ও মিথ্যা দিয়ে কি আমাদের সরকারকে হটানো যায়? কংগ্রেস ভাবছে ছ'মাস পরে লোকসভার ভোট হচ্ছে। তাই এখন এই ছ'মাস ধরে আমাদের বিরুদ্ধে কুৎসা ওরা চালিয়েই যাবে।'

সি পি আই (এম) সম্পাদকীয় মণ্ডলীর সদস্য বিমান বসু প্রকাশ্য ভাবে জানান, 'রাজীব গান্ধীর চুরি ঢাকতে কংগ্রেস পেটোয়া সংবাদপত্র ও পেটোয়া সাংবাদিকদের দিয়ে এসব কুৎসা রটাচ্ছে। এ আই সি সি হাইকমাণ্ডে এরকম সিদ্ধান্ত হয়েছে। সাধারণ মানুষকে ভুল বোঝাবার জন্য কংগ্রেসের হাতে দূরদর্শন, আকাশবাণী রয়েছে। এখন-তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আনন্দবাজার গোষ্ঠী।

প্রকৃতপক্ষে রাজ্য সি পি আই (এম) জ্যোতি বসু এবং তাঁর পরিবার পরিজন সম্পর্কিত অভিযোগগুলিকে চক্রান্ত এবং রাজনৈতিক আক্রমণ বলেই ব্যক্ত করেছে। এই চক্রান্তের শরীক হিসাবে তারা কংগ্রেসের সঙ্গে সাংবাদিক ও একশ্রেণীর আমলা অফিসারদের চক্রকে দায়ী করছে।

চন্দন আর চন্দনের স্ত্রী ডলি বসু ছবি: অশোক বসু

এখন দেখা যাক ওইসব বিতর্কিত প্রতিবেদনগুলির সংগ্রাহক ও পরিবেশক যেসব সাংবাদিক তাঁদের প্রেক্ষাপটটি কি ধরনের। তাহলেই সংশ্লিষ্ট সাংবাদিকদের মোটিভ এবং চক্রান্তের শরীক হওয়ার নেপথ্যপটটি ভাল ভাবে প্রমাণিত হবে। তবে একটি প্রশ্ন স্বভাবতই ওঠে, এই যে ঘটনাগুলি এগুলো হঠাৎ ৯০-এর সাধারণ নির্বাচনের বছরখানেক আগে থেকেই সাংবাদিকদের কলমে উন্মোচিত হতে শুরু করল কেন? এতদিন তাঁরা এতটা অনুসন্ধানী হননি কেন? তবে 'দ্য উইক' পত্রিকার কলকাতা ব্যুরো প্রধান তাপস গঙ্গোপাধ্যায় জানালেন, তিনি গত ৫/৬ বছর ধরে 'দ্য উইক' এবং অন্যত্র জ্যোতি বসু এবং তার কয়েকজন আত্মীয়ের বিরুদ্ধে নিরবচ্ছিন্নভাবে নানান অভিযোগ পেশ করে চলেছেন।

সাংবাদিকতায় আসার আগে তাপসবাবু ছিলেন অধ্যাপক। জানালেন, ১৯৬১ সাল পর্যন্ত বামপন্থী ছাত্র রাজনীতি করতেন। তিনি তখন অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির ছাত্রসংগঠন 'অল ইন্ডিয়া স্টুডেন্টস ফেডারেশন'-এ সক্রিয় সদস্য ছিলেন। এবং সি পি এম শিক্ষাফ্রন্টের নামকরা নেতা সত্যপ্রিয় রায় এবং অনিলা দেবীর সঙ্গে বামপন্থী দলের প্রতিনিধি হিসাবে তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর কাছে ডেপুটেশনও দিতে গেছিলেন। এছাড়াও ১৯৬৮ থেকে ১৯৭২ সাল পর্যন্ত অধ্যাপকদের দাবীদাওয়ায় ডনবসক আন্দোলনে তাপসবাবুরা জ্যোতি বসুর সমর্থনে দীর্ঘমেয়াদী আন্দোলন চালিয়ে ছিলেন। এছাড়া ১৯৫২, ১৯৫৭ এবং ১৯৬৭র তিনটি নির্বাচনে তাপস গঙ্গোপাধ্যায় বিশিষ্ট মার্ক্সবাদী নেতা জ্যোতিষ জোয়ারদার, সোমনাথ লাহিড়ি এবং নিরঞ্জন সেনগুপ্তর বুথ এজেন্ট হিসাবে কাজ করেছেন।

বামপন্থী রাজনীতি থেকে উঠে আসা সাংবাদিক তাপস গঙ্গোপাধ্যায় এই সব জ্যোতি বসু বিরোধী চক্রান্তের কথিত অভিযোগ প্রসঙ্গে 'আলোকপাত'কে বলেন, 'একমাত্র চক্রান্তকারীরাই অন্যের কাজে চক্রান্তের গন্ধ খুঁজে পায়। কারণ

বেঙ্গল ল্যাম্প নোটের ড্রাফট যে আই·এ·এস অফিসারের
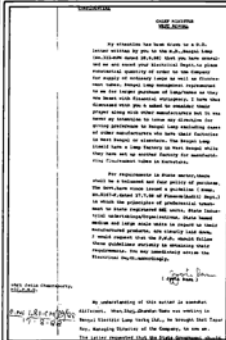
বিতর্কিত সেই চিঠিটি

সংক্ষিপ্ত যথার্থ চিঠি লেখার ক্ষমতাই মুস্তাক মুর্শেদকে জ্যোতি বসুর একান্ত কাছের মানুষে পরিণত করে। সরকারি গোপনীয় অনেক চিঠি তিনি লিখেছেন। প্রায় দু'দশক জ্যোতি বসু ও মুস্তাক মুর্শেদ পরস্পর পরস্পরের একান্ত কাছে থাকার পর এখন দু'জনেই দুজনের থেকে বিচ্ছিন্ন।

বেঙ্গল ল্যাম্প কেলেঙ্কারি সংক্রান্ত চিঠিটি পূর্ত ও আবাসন দপ্তরের মন্ত্রী যতীন চক্রবর্তীর নামে হলেও আদতে এই কেলেঙ্কারির সঙ্গে যে দু'টি নাম জড়িয়ে পড়েছে তাঁরা হলেন—জ্যোতি বসু ও চন্দন বসু। সি·পি·আই (এম) এ সম্পর্কে মোটামুটিভাবে ওয়াকিবহাল যে, এই নোটটির ড্রাফট মুস্তাক মুর্শেদেরই হাতের ফসল।

একান্ত গোপনীয় বেঙ্গল ল্যাম্পের এই নোটটি ফাঁস হয়ে যাওয়ায় হতবিহ্বল হয়ে পড়েন জ্যোতি বসু, ফাটল ধরল বামফ্রন্ট মন্ত্রিসভায়। সঙ্গে সঙ্গে কর্মভারহীন পদে মুর্শেদের বদলি আর সেইসঙ্গে সরকারি চাকরি থেকে মুর্শেদের পদত্যাগ রাইটার্স বিল্ডিং—এর সচিব বিভাগে এক চমক সৃষ্টি করে।

১৯৬৭ সাল। মুর্শেদ যুক্তফ্রন্ট সরকারে উপমুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর (জয়েন্ট) সেক্রেটারি। সেইসময়ে ওই পদের পক্ষে মুর্শেদ নিতান্তই জুনিয়র। বলতে গেলে জ্যোতি বসুই তাঁকে ওই পদে নিয়োগ করেন। আসলে, ব্রিটিশ শিক্ষায় শিক্ষিত জ্যোতি বসুকে অভিভূত করেছিল মুর্শেদের সচিব স্তরের দক্ষতা। বিশেষ করে চিঠি লেখায় মুর্শেদের পারদর্শিতা প্রশংসার দাবি রাখে। যুক্তফ্রন্ট দ্বিতীয়বার মন্ত্রীসভায় আসে ১৯৬৯–৭০ এ। সেই সময়ের দুই প্রধান অর্থাৎ মুখ্যমন্ত্রী অজয় বসু ও উপমুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর মধ্যে চিঠি সংক্রান্ত যে টাগ অফ ওয়ার চলে—সেইসব তীক্ষ্ণ মর্মভেদী সব চিঠির রূপকার এই মুর্শেদ সাহেব!

পঞ্চাশের দশকের কেরিয়ারের একেবারে প্রথমদিকে মুর্শেদকে অনেক বাধা অতিক্রম করতে হয়েছে। মুর্শেদ তখন মেদিনীপুর জেলার কাঁথি মহকুমার এস·ডি·ও। সেইসময়ে পশ্চিবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন প্রফুল্ল সেন। মুখ্যমন্ত্রী সেন সমস্ত জেলার ম্যাজিস্ট্রেট ও সাবডিভিশনাল অফিসারদের রাজ্যসরকার খাদ্যভাণ্ডার মজুত করায় ও সেইসঙ্গে গোপনে কালোবাজারিদের ওপর সতর্ক দৃষ্টি রাখার নির্দেশ দিলে তৎক্ষণাৎ মুর্শেদ কালোবাজারি মজুতদারদের বিরুদ্ধে দৃঢ় পদক্ষেপ নেন। সঙ্গে সঙ্গে গ্রেপ্তার হলেন বিভিন্ন মহকুমার বহু মজুতদার। তাদের মধ্যে একজন ছিলেন নাকি প্রভাবশালী কংগ্রেস দলের। নিজেকে মুক্ত করতে তিনি নানাভাবে চাপ সৃষ্টি করেন মুর্শেদের ওপর। মুর্শেদ কিন্তু তাঁর নীতিতে অবিচল। ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ চাকরি জীবনের শুরু এইভাবে। তারপর অনেক দিন অতিবাহিত হয়েছে। কংগ্রেসী জমানা বদলে গিয়ে নতুন শক্তি সি·পি·এম এরাজ্যে ক্ষমতায় আসে। ডঃ বিধান চন্দ্র রায়ের পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী পি·সি সেনের কথা অক্ষরে অক্ষরে তিনি পালন করেছিলেন। তা সত্ত্বেও বামপন্থী নেতাদের শ্রদ্ধার চোখে ছিলেন মুর্শেদ। জ্যোতি বসু ১৯৬৭ সালে উপমুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পরে অর্থ ও পরিবহন দপ্তরের ভার নেন। এই সময়ে ব্রিটিশ অধিকৃত কলকাতা ট্রাম কোম্পানি রাজ্য সরকার অধিগ্রহণ করে। সেইসঙ্গে মুর্শেদও বদলি হলেন। সি·টি·সি·—র প্রথম শাসন বিভাগীয় অধিকর্তা হয়ে এলেন মুস্তাক মুর্শেদ।

প্রথম যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের আয়ুষ্কাল মাত্র ন'মাস। পরে ডঃ পি·সি· ঘোষের নেতৃত্বে কিছু দলছুট কংগ্রেস ও বাংলা কংগ্রেসের সমর্থন পেয়ে কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গড়ে ওঠে। সেই মন্ত্রিসভার আয়ুষ্কাল ছিল মোটে এক মাস। তারপরেই পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রপতির শাসন শুরু হয়। সেইসময়ে যে সব আমলাদের দপ্তর পরিবর্তন করা হয়েছিল তাঁদের মধ্যে সবার প্রথমে বদলি হন মুর্শেদ। ক্যালকাটা ট্রাম কর্পোরেশান থেকে তাঁকে হাওড়া ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্টের চেয়ারম্যান করে পাঠান হয়। কিন্তু ১৯৬৯–এ যুক্তফ্রন্টের রাজত্বকালে উপ মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু স্বরাষ্ট্র বিভাগের দায়িত্বে থাকাকালীন মুর্শেদকে পুনরায় রাইটার্সে ডেকে পাঠান। মুখ্যমন্ত্রীর জয়েন্ট সেক্রেটারি হিসেবে তিনি নিযুক্ত হন। কিন্তু ১৯৭০–এ যুক্তফ্রন্ট শাসনের অবসানের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে মুর্শেদকে দিল্লিতে বদলি করা হয়। সেখানে দীর্ঘ সাড়ে পাঁচ বছর মিনিস্ট্রি অফ ইনফর্মেশন অ্যাণ্ড ব্রডকাস্টিং ডিপার্টমেন্টে জয়েন্ট সেক্রেটারি হিসেবে কাজ করেন। 'কিসসা কুর্সি কা' ছবিটি নিয়ে ভি·সি· শুক্লার সঙ্গে তখন তাঁর বিরোধ বাধে। মুর্শেদের কোন সুপারিশ কিংবা পরামর্শ কিছুই শুক্লার পছন্দ হয়নি। পরবর্তী পদক্ষেপ হিসেবে মুর্শেদের কলকাতায় বদলি খুব স্বাভাবিক ঘটনা। কিন্তু শুক্লা সম্পর্কে মুর্শেদের কোন তিক্ত অনুভূতি নেই। তিনি বলেন 'ভি পি শুক্লা ছিলেন মন্ত্রিসভার একটি রত্ন বিশেষ।' ইতিমধ্যে জ্যোতি বসুর নেতৃত্বে বামফ্রন্ট পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতায় এসেছেন। প্রথম বামফ্রন্টের শাসনে মুর্শেদ আবার সেক্রেটারি পদে ফিরে আসেন।

চারবছর আগে পি·ডবলু·ডি বিভাগে সেক্রেটারি হিসেবে তাঁকে বদলি করা হয়েছিল। সেই সময়ে বিভাগীয় মন্ত্রী যতীন চক্রবর্তী তাঁকে যে ক্ষমতা দিয়েছিলেন তার সদ্‌ব্যবহার তিনি করেছিলেন। তিনি একাই সামলে ছিলেন বিভাগীয় ইঞ্জিনীয়রদের ধর্মঘট। তখন থেকে সি·পি·এম· —এর প্রভাব থেকে তিনি নিজেকে বিচ্ছিন্ন রাখতে শুরু করেন। বেঙ্গল ল্যাম্প কেলেংকারি শুরু হ'লে মুর্শেদ সি·পি·এম·—এর লক্ষ্যবস্তু হ'য়ে ওঠেন। সেইসঙ্গে জ্যোতি বসুরও। তাই নির্দিষ্ট সময়ের আগেই মুর্শেদ চাকরি থেকে ইস্তফা দেন। কেউ কেউ অবশ্য বলেন, মুর্শেদের নাকি চিফ্ সেক্রেটারি হওয়ার কোন সম্ভাবনাই ছিল না, এবং পদত্যাগের কারণটা মুখ্যত তাই।

১৯৮৮–র ডিসেম্বরে মুখ্যসচিব আর এন সেনগুপ্তের রিটায়ার করার কথা। এই চেয়ারে বসার পক্ষে যে আই এ এস অফিসারেরা তাঁরা—টি পি দত্ত, টি এস ব্রোক, জে কে কোহলি, মুর্শেদ ও অরুণ সেন। প্রত্যেকেই সার্ভিসে আসেন ১৯৫৬–এ। দিন তারিখের হিসেব দিয়ে বলতে গেলে বলতে হয় মিঃ সেন ও কোহলি মুর্শেদ—এর থেকে কিছুদিনের জুনিয়র। রাজনৈতিক মহলের মতে পাঁচজনের মধ্যে সি পি আই (এম)—এর সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ হলেন মিঃ দত্ত। এই সুযোগে তাই মুর্শেদও দিল্লিকে জানিয়ে দেওয়ার কারণ যে তিনি মার্কসবাদীদের কাছের মানুষ নন। আসলে মুর্শেদ চেয়েছিলেন, দিল্লির অনুকূলে থাকতে যাতে সরাসরি দিল্লিতেই নিযুক্ত হতে পারেন।

কোন 'গণশক্তি' বা 'পিপ্‌ল্‌স ডেমোক্রেসি' বা কোন মার্কসিস্ট বা কম্যুনিস্ট পত্রপত্রিকা বা তাঁদের সাংবাদিক কুল বোফর্স কেলেংকারির রহস্য উম্ঘাটন করে নি। সুইডিস রেডিও তাদের দৃষ্টিতে তো পুরোপুরি বুর্জোয়া সংস্থাই। 'দ্য হিন্দু' আদি অকৃত্রিম ভারতীয়' পত্রিকা, আর রামনাথ গোয়েংকার 'ইণ্ডিয়ান এক্সপ্রেস' যদি বুর্জোয়ার কাগজ না হয় তাহলে বুর্জোয়া শব্দটির আভিধানিক অর্থ নতুন করে লিখতে হবে। এইসব সংবাদ মাধ্যম মারফৎ বোফর্স কেলেংকারির কথা জানতে পেরেই জ্যোতি বসুরা রাজীব গান্ধীর পদত্যাগ দাবি করেছিলেন!'

তথাকথিত বুর্জোয়া কাগজের অভিযোগেই মার্ক্সবাদীরা এবং জ্যোতি বসুও প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগ দাবি করেন। রাজীব গান্ধী এইসব সংবাদের মধ্যে বৈদেশিক চক্রের হাত খুঁজে পেয়েছিলেন। অনুরূপ ভাবে আজ জ্যোতিবাবু রাজীব গান্ধীর মতই চক্রান্ত খুঁজে বেড়াচ্ছেন সংবাদপত্রের মধ্যে। শুধু তফাৎ হল রাজীবের পিছনে বৈদেশিক হাত দেখেছিলেন, জ্যোতি বসু দেখছেন দিশী হাত!

তাপসবাবু বলেন, 'জ্যোতিবাবুর কেন্দ্রা বুর্জোয়া সংবাদ মাধ্যম না ছেপে কি গণশক্তি বা পশ্চিমবঙ্গ বা বসুমতী ছাপবে? অনিল বিশ্বাস (গণশক্তি) বুদ্ধদেব ঘোষ ('বসুমতী') আর প্রীতিন্দ্রকৃষ্ণ ভট্টাচার্য ('পশ্চিমবঙ্গ') এঁদের সাহস আছে না ক্ষমতা আছে যে প্রভুর অঙ্গে বস্ত্রের বড় অভাব, এই সত্য কথাটি ফাঁশ করেন?' তাপস গাঙ্গুলি বলেন, 'জ্যোতিবাবু যদি সাচ্চা মার্ক্সবাদী হন দয়া করে গালাগাল বন্ধ রেখে চক্রান্ত না খুঁজে তাঁর পুত্র, পুত্রবধূ, ভায়রা, শালিকা, ভাগ্নে ইত্যাদি আত্মীয় গোষ্ঠীরা গত ১২ বছর কি করেছে তা নিজেই তদন্ত করে দেখুন। রিপোর্ট আমাদের দিতে হবে না, পেয়ে যাবেন!'

এসবের প্রত্যেকটা স্তর জ্যোতি বসু জানেন। আর জানেন বলেই যাতে কখনও এসব ফাঁশ না হয় তাই বাছাই করা চরিত্রহীন, মেরুদণ্ডহীন অসৎ আমলা ও দলীয় নেতাদের দিয়ে নিজেকে ঘিরে রেখেছেন।

'দ্য টেলিগ্রাফ' পত্রিকার সিনিয়ার করসপন-ডেন্ট শুভ্রাংশু গুপ্তও অধ্যাপনার পেশা থেকে সাংবাদিকতার পেশায় আসেন। তাঁর স্কুল জীবন থেকে এ পর্যন্ত তিনি কোন রাজনৈতিক দল বা তাদের ফ্রন্টাল অর্গানাইজেশনে সক্রিয়ভাবে কাজ করা তো দূরের কথা মেলামেশা পর্যন্ত করেন নি বলে শ্রী গুপ্ত জানালেন। বামফ্রন্ট সরকার তথা মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর বিরুদ্ধে সংবাদপত্র ও সাংবাদিকদের চক্রান্তের বিষয় সম্পর্কে জানতে চাইলে, শুভ্রাংশুবাবু বলেন, 'কেউই কোন চক্রান্ত করছে না। দীর্ঘ বছর ধরে ওঁরা ক্ষমতাতে রয়েছেন কই তখন তো তাঁরা এমন অভিযোগ করেন নি। এতদিন বলে এসেছেন কেন্দ্র তাদের ফেলে দেবার ষড়যন্ত্র করছে।

'টেলিগ্রাফ'-এর শুভ্রাংশু গুপ্ত

'দ্য উইক'-এর তাপস গঙ্গোপাধ্যায়

পদত্যাগী মন্ত্রী যতীন চক্রবর্তী ছবি: সুধাংশু পাল

শুভ্রাংশুবাবু বলেন, 'আসলে ওঁদের ক্যাডাররা আর ওঁদের কনট্রোলে নেই। যারা নিচুতলার কর্মী তারা ওপর মহলকে থোড়াই কেয়ার করে। এর আগে সরোজবাবু অনেক বারই কর্মী, নেতাদের দাম্ভিকতা, অহংকার-এর সমালোচনা করেছেন। ক্ষমতায় উঠে তাদের লাইফ স্টাইল বদলে গেছে। আগে যারা নিতান্তই সাধারণ মাপের জীবন যাপন করতেন, আজকে তাদের লাইফ স্টাইল দেখুন। আকাশ পাতাল পার্থক্য। প্রমোদবাবু থাকতে তিনিও সমালোচনা করেছিলেন। সাধারণ মানুষের আশাভঙ্গ ঘটছে।'

মজাটা এখানেই, মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর ছেলে চন্দন অনিয়ম করলে কিছু হয় না, কিন্তু কোন কংগ্রেসী মুখ্যমন্ত্রীর ছেলে দুর্নীতি করলেই হলো!—জ্যোতিবাবু এইসব দুর্নীতিতে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত না থাকলেও তার ছেলে চন্দন বসু, দাদার জামাই দিলীপ রায়চৌধুরী, ভাগ্নে অমল দত্ত, আত্মীয় বিজন নাগ, ভায়রা জয়ন্ত রায়, শালিকা মঞ্জুলা বসু, সৌমিত্র সেনগুপ্ত এইসব লেনদেনে জড়িত এসব অভিযোগ তো বিভিন্ন মহল থেকে উঠছে। ১৯৭৭ সালে ওদের সম্পত্তির পরিমাণ কতছিল, ১৯৮৮ সালে কত হয়েছে—হিসেব করে দেখুন, তাহলেই তো বোঝা যেতে পারে গণ্ডগোলটা কোথায়। কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী রামকৃষ্ণ হেগড়ে টেলিফোন ট্যাপিং-এর নৈতিক দায়িত্ব মেনে নিয়ে পদত্যাগ করেছেন। অথচ জ্যোতিবাবু কোন তদন্ত কমিশানের মুখোমুখি হতে চাইছেন না কেন?

'আজ লোকে জানতে চাইছে, কাগজ জনস্বার্থের প্রয়োজনে তা ফ্ল্যাশ করেছে। এতে ষড়যন্ত্র কোথায়? জ্যোতিবাবুর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছেন তাঁর ছেলে চন্দন বসু ও আত্মীয় স্বজনেরা। তারাই মুখ্যমন্ত্রীর পলিটিকাল কেরিয়ার শেষ করে দেবার ষড়যন্ত্র করেছেন।'

'বর্তমান' পত্রিকায় মুখ্যমন্ত্রীর পুত্রবধূ ডলি বসুর বেআইনী শাড়ির দোকান শীর্ষক সংবাদ পরিবেশন করেন সঙ্গীতা ভট্টাচার্য। মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু কথিত সাংবাদিক ষড়যন্ত্রের কথা তুলতে সঙ্গীতা দেবী বললেন, 'জ্যোতি বসু তথা বামফ্রন্টের এই অভিযোগ কোনভাবেই সত্যি নয়। কারণ সংবাদপত্রের দায়িত্ব ঘটনাকে যথাযথভাবে প্রকাশ করা। ঘটনাকে তুলে ধরলেই ষড়যন্ত্র হবে কেন? তাহলে রাজীব গান্ধীও বলতে পারেন। যতদিন বাড়ছে, ফ্রন্টে দুর্নীতি বাড়ছে। সেগুলো প্রকাশ হলেই তা চক্রান্ত বললে মেনে নেওয়া যায় না। দেখুন, যদি বেঙ্গল ল্যাম্পের ব্যাপারে খবর ভুল থাকত তাহলে যতীন চক্রবর্তীকে পদত্যাগ করতে হত না। দেখতে হবে, কি এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল যাতে করে তাঁকে পদত্যাগ করতে হলো? যতীনবাবুর নোটটা কিন্তু থেকেই গেল। ১৯৭৭ সালের তুলনাতে বামফ্রন্টে এখন দুর্নীতি ক্রমাগত বাড়ছে।

সঙ্গীতা বলেন, 'তবে নির্বাচন হলে বামফ্রন্ট আবার আসবে। কারণ মেশিনারি ওদের হাতে। ৪৬ নং ওয়ার্ডের পুর নির্বাচনে আমরা দেখলাম কিভাবে আপাদমস্তক ওরা ম্যানিপুলেট করছে। 'ওটা সুষ্ঠু নির্বাচন হয় নি।' মোট কথা, বামফ্রন্টের সঙ্গে সংবাদপত্রের কোন বিরোধ নেই। অন্যায় করলে তা প্রকাশ হবে। যদি এটা ষড়যন্ত্র হয়, তবে বুঝতে হবে ফ্রন্ট চালে ভুল করছেন।'

জ্যোতি বসু বিরোধী চক্রান্তের নেপথ্য নায়ক হিসাবে সি পি আই (এম) নেতৃত্ব কংগ্রেসকেই দায়ী করেছেন। বিচ্ছিন্নভাবে কোন কোন কংগ্রেস নেতা গ্রুপগত ভাবে জ্যোতি বসু বিরোধী কোন পদক্ষেপ নিলেও নিতে পারেন। কিন্তু দলগতভাবে কংগ্রেস পশ্চিমবঙ্গে এতটাই বিশৃংখল যে চক্রান্ত করা তো দূরের কথা গত দুবছরে কলকাতার ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউণ্ডে একটা সমাবেশ করারও হিম্মত তাদের হয় নি। তার উপর বর্তমান প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি সভাপতি এ বি এ গণিখান চৌধুরী তো সভাপতি হওয়ার আগে পর্যন্ত বারংবারই প্রকাশ্যে ঘোষণা করে বলেছেন, 'জ্যোতি বসু দুর্নীতিপরায়ণ-এ তিনি বিশ্বাস. করেন না।' অন্যদিকে রাজ্য কংগ্রেসের শক্তিশালী গোষ্ঠী (ইনটাক, ছাত্রপরিষদ এবং যুব কংগ্রেস সম্বলিত) প্রিয়—সুব্রত গ্রুপের প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সী জ্যোতি বসুর দুর্নীতি নিয়ে চার বছর ধরে ধারাবাহিক রামায়ণ পর্ব করলেও তস্যশিষ্য সুব্রত মুখার্জি বরাবরই বলেছেন 'জ্যোতি বসু আমাদের রাজনৈতিক অভিভাবক। তিনি কখনোই দুর্নীতি

করতে পারেন না।' কাজে কাজেই এ হেন কংগ্রেস চক্রান্ত করবে কি করে?

রাজ্য কংগ্রেস সভাপতি বরকত গনিখান চৌধুরীকে যখন জ্যোতি বসু তথা রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে চক্রান্তের সম্পর্কে আলোকপাত প্রশ্ন করে তখন গণি সাহেব পরিষ্কার জানান, 'কংগ্রেস গণতান্ত্রিক পথে সরকার বদলের কথা বলে। চক্রান্তকে আমরা সব সময়ই ঘৃণা করি। সেই সঙ্গে আমরা এও বিশ্বাস করি যে সংবাদপত্র ও সাংবাদিকরা তাদের মত করে লিখবেন। তাদেরকে হুমকি বা মারধোর দিয়ে থামিয়ে রাখা যাবে না। তবে সব সংবাদপত্রের কথাই যে ধ্রুব সত্য আমরা তা বলছি না। তাই আমরা জ্যোতি বসুর কাছে দাবি জানাচ্ছি পরিষদীয় তদন্তের। কিন্তু পরিষদীয় তদন্ত তো দূরের কথা, উল্টে জ্যোতিবাবুর দল.চিরাচরিত নিয়মে বিধানসভার যে শীতকালীন অধিবেশন হয়, এবার তাও হতে দিচ্ছে না এখনও পর্যন্ত। সে অধিবেশন ডাকার ব্যবস্থা পর্যন্ত নেওয়া হয় নি। বরং কেউ কেউ মনে করছেন যে বিধান সভার শীতকালীন অধিবেশন ডাকলে জ্যোতিবাবুর দল বিপাকে পড়ে যাবে, তাই সুকৌশলে বানচাল করার চেষ্টা চলছে সেটা। এরপরে জনগণ যদি জ্যোতি বসুকে সংবাদপত্রে প্রকাশিত দুর্নীতিগুলির দায়ে দোষী সাব্যস্ত করে বসেন, তাহলে কি তারা ভুল করেছেন বলে মনে করা যাবে? আর আমরা যদি চক্রান্ত করতাম, তাহলে এই দুর্নীতির দায়েই আমরা প্রধানমন্ত্রীর কাছে এই রাজ্য সরকারকে বরখাস্ত করার দাবি করতাম। কিন্তু তা করিনি। কারণ আমরা জানি যে জন সাধারণকে প্রবঞ্চিত করে জ্যোতিবাবু ও তাঁর দলবল স্বার্থের রাজনৈতিক পাশা খেলা খেলছেন সেই জনগণই তাদেরকে বঙ্গোপসাগরে ছুঁড়ে ফেলবে। আমরা বিশ্বাস করি জনগণই শেষ কথা বলবেন, অন্য কেউ নয়।' বঙ্গোপসাগরে ছুঁড়ে ফেলার উপমাটা অবশ্য গনিখানের মুখে জ্যোতি বসুর এইসব দুর্নীতি প্রকাশ পাবার আগে থেকেই ছিল।

একথা খুবই সত্যি যে, ১৩ বছরের লাল দুর্গে একদিকে অভিযোগের কালির আঁচড় পড়েছে, অন্যদিকে লাল দুর্গের দেওয়ালে ধরেছে ফাটলও। পূর্তমন্ত্রী যতীন চক্রবর্তী পদত্যাগ করেছেন। আর এস পি, সি পি এম-এ চলছে টাগ অব ওয়ার। সেইসঙ্গে স্বেচ্ছা অবসর নিয়েছেন পূর্তসচিব মুরসেদ সাহেব, একসময় যিনি পর্যটন ও বিদ্যুৎ সচিবও ছিলেন। কাজেই শুধু সাংবাদিকদের দায়ী করলেই তো চলবে না। সরষের মধ্যে যে ভুত আছে তার কথাও ভাবতে হবে। সি পি এম নেতৃত্বেরও আত্মবিশ্লেষণটা এখন জরুরী।

সাংবাদিকরা তো তাদের কাজ করবেনই। পূর্ত দপ্তরের ফাইল, বিদ্যুৎ দপ্তরের ফাইল, স্বাস্থ্য দপ্তরের ফাইল, পর্যটন দপ্তরের ফাইল হারিয়ে গেল। তাই থেকেই তো নথিসহ প্রতিবেদন ছাপাচ্ছেন সাংবাদিকরা। নতুবা আর কোথায় পাবেন? সরকারকে ভেবে দেখতে হবে, এইসব ফাইল হাওয়া হয়ে গেল কাদের হাত সাফাই-এ? কেনইবা ফাইলের বক্তব্য এত বিতর্কিত। সেদিকটাও ভেবে দেখতে হবে রাজ্য সরকারের কর্ণধারদের। আর শীতকালীন বিধানসভার অধিবেশন না হলে সন্দেহ আরও বাড়বে, পরিষদীয় তদন্ত কিংবা বিচার বিভাগীয় তদন্তের নির্দেশ না দিলে। মনে রাখা দরকার, সংবাদপত্রের অভিযোগের থেকেও অনেক বেশি গুরুত্ব সহকারে মানুষ বিশ্বাস করছে পদত্যাগী পূর্তমন্ত্রী যতীন চক্রবর্তীর অভিযোগগুলি। তার দায় থেকে মুক্ত হতে গেলে জ্যোতিবাবুকে অতি অবশ্যই নিরপেক্ষ তদন্তের মুখোমুখি হতে হবে। এ পর্যন্ত জ্যোতিবাবু তাঁর ও তাঁর আত্মীয়স্বজনদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগগুলির একটিরও নিরপেক্ষ তদন্তের ব্যবস্থা করেন নি। অথচ এমন কি রাজীব গান্ধীও যেমন তেমন করে হলেও বোফর্সের ব্যাপারে সংসদীয় তদন্তের ব্যবস্থা করেছিলেন। তাই জ্যোতি বসু যদি আগামী দিনে পরিষদীয় বা বিচার বিভাগীয় তদন্তের ব্যবস্থা না করেন এবং নিয়মমত বিধানসভার মুখোমুখি না হন তাহলে এ পর্যন্ত কলংকের যে সব দাগ তাঁর শ্বেতশুভ্র ধুতি-পাঞ্জাবীতে লেগেছে তা তোলা দুষ্কর হয়ে পড়বে। আর তারই ছায়া দেখা দেবে আগামী নির্বাচনে।

-রমাপ্রসাদ ঘোষাল

দক্ষিণ ভারতীয়রাই কি কেন্দ্রের সরকার চালায়!

পি· চিদাম্বরম ছবি: গিরীশ শ্রীবাস্তব

রাষ্ট্রমন্ত্রকের পার্সোনেল দপ্তরের মন্ত্রী পি চিদাম্বরম কি কেন্দ্রীয় সচিবস্তরে দক্ষিণ ভারতীয় লবি গড়ে তুলতে চান? সম্প্রতি নিযুক্ত ন'জন সচিবের মধ্যে ছ'জনই তামিল ব্রাহ্মণ, বর্তমানের মোট ছেচল্লিশজন সচিবের মধ্যে কুড়ি জনই দক্ষিণ ভারতের। চিদাম্বরম নিজেও দক্ষিণ ভারতীয়, প্রধানমন্ত্রীর ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি। তাঁর বিরুদ্ধে গুঞ্জন উঠছে কংগ্রেসদলের ভেতরেই, সিনিয়র আমলাদের অভিযোগ তো রয়েছেই। পদ্মা শাস্ত্রী এবং সুধা ভাটিয়া'র বিশদ প্রতিবেদন।

ভারতবর্ষের সিভিল সার্ভিসের উঁচু-তলার প্রাদেশিকতার যে অভিযোগটি বারবার উঠে থাকে, সেটি কিন্তু বেশ পুরনো। জওহরলাল নেহেরু'র মতন ব্যক্তির প্রধানমন্ত্রীত্বের আমলেও এই অভিযোগ উঠেছে, অবশ্য তাঁকে তাঁরই কন্যা শ্রীমতী ইন্দিরার তুলনায় এ ব্যাপারে অনেক কম মনে করা হয়। প্রয়াত ইন্দিরা গান্ধীর আমলটি স্পষ্টতই প্রাদেশিকতার দোষে বেশ দুষ্ট, জনৈক সিনিয়র আমলার মতে, শ্রীমতী গান্ধীর সময়

কাশ্মীরী পণ্ডিতদের একটি গোষ্ঠী প্রভূত ক্ষমতা ভোগ করে থাকতেন, নীল রক্তের লোক ছিলেন তাঁরা সব। এম·ও·মাথাই তাঁর 'মাই ডেজ উইথ নেহেরু' বইটিতে বলেছেন, 'ইন্দিরা গান্ধী তাঁর প্রধানমন্ত্রিত্বের আমলে কাশ্মীরী লোকজনদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে থাকতেন প্রায়ই। একটা সময়ে, দিল্লীর অনেকে ভারত সরকারকে কাশ্মীরী পঞ্চায়েত বলে ঠাট্টা করতেন। আমি একজনকে জিগ্যেস করেছিলাম, এই পঞ্চায়েতে কে কে আছেন? তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, ফুলটাইম মেম্বাররা হচ্ছেন ডি পি ধর, পি এন হাকসার, টি এন কল, পি এন ধর, পার্ট টাইম যাঁরা তাঁদের নাম আর এন কাও, ('র'–এর প্রধান), ওম মেহেতা আর করণ সিংহ।'

মুসৌরি'র আই এ এস অ্যাকাডেমি 'লাল বাহাদুর শাস্ত্রী অ্যাকাডেমি'র প্রাক্তন জয়েন্ট ডিরেকটর এন এস সাকসেনা এসব অভিযোগ স্বীকার করেন না। তাঁর মতে, 'এটা তো ওঁদের (কাশ্মীরী পণ্ডিতদের) শিক্ষাদীক্ষারই ফসল। যোগ্যতা না থাকলে ধর, কল এসব এমনি তো দেখে না কেউ।' ইন্দিরা গান্ধীর আমলে যিনি তথ্য ও প্রচার মন্ত্রী ছিলেন, সেই আই কে গুজরাল উল্টে মাথাই সম্পর্কেই বলেন, উনি নিজেই নাকি নেহেরুর বাজার সরকার হিসেবে বিভিন্ন মন্ত্রকে ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণের একটা চক্র গড়ে তুলেছিলেন।

জনতা পার্টির এম পি সুব্রহ্মনম স্বামীর মতে, মোরারজী দেশাই এসে আমলাদের প্রাদেশিকতার চক্রটি ভেঙে ফেলতে চেষ্টা করেছিলেন। জনৈক প্রাক্তন সচিবের বক্তব্য, সেসময় যেহারে ট্রান্সফার শুরু হয়েছিল, তাতে বহু আমলা ভাবছিলেন, নিছক বদলা নেবার জন্যই যেন সংশ্লিষ্ট সচিবকে ট্রান্সফার করা হচ্ছে। ইন্দিরা গান্ধী ফিরে এসে ফের আরেক দফা নিজের মতন করে সব রদবদল করলেন। প্রধানমন্ত্রী হওয়ার ছ'মাসের মধ্যে রাজীব গান্ধীও অন্তত আঠাশজন কেন্দ্রীয় সচিব বদলেছেন। তবে তাঁর ক্ষেত্রে অবশ্য বলা হয়ে থাকে, তিনি এক্ষেত্রে আঞ্চলিকতার কথা ভাবেননি। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল নাকি তরুণতর আমলাদের হাতে ক্ষমতা দেওয়া। গোপীকৃষ্ণ আরোরাকে যখন প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয়ে নিয়ে আসা হল, সেটা তাঁর কর্মদক্ষতার জন্যেই, রাজীব গান্ধীর ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি বলে নয়, এরকমই বলা হচ্ছে। আরোরার তথ্য ও

প্রচার মন্ত্রকে বদলিটার অবশ্য প্রকারান্তরে ডিমোশন বলা হলেও, আসলে এটা তো প্রমোশনই। নির্বাচনের সময় এই বিভাগটির গুরুত্ব যে কতটা বৃদ্ধি পায়, সবাই জানেন।

গুজরাল–এর বক্তব্য, 'সময় সময় ব্যক্তিগত প্রতিদ্বন্দ্বিতাকেও প্রাদেশিকতা কিংবা আঞ্চলিকতার দোষে দুষ্ট করে দেখানো হয়ে থাকে। বর্তমানে একজন আমলার কাছে প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয়ের কাজটাই চূড়ান্ত ক্ষমতালাভের পর্যায়ে পড়ে, রাজীব গান্ধীর আমলে এটা আরও বেশি। শুরু হয়েছিল ইন্দিরা গান্ধীর আমল থেকেই। গুজরালের মতে, প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয়ে প্রতিটি দপ্তরেরই সমান ক্ষমতাসম্পন্ন এক একজন আমলা রয়েছেন। অন্য দপ্তরের একজন সচিবের সিদ্ধান্তকে প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয়ের একজন সহকারী সচিব নাকচ করে দিতে পারেন। মোট কথা প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের স্টাম্পটাকে সব আমলাই মনে মনে সমীহ করে চলেন। তো মোটেই প্রেস্টিজিয়াস নয়!'

কে সি শিবরামকৃষ্ণণ ঐ ব্যাচেরই, তিনি ছিলেন ষষ্ঠ স্থানাধিকারী, তাঁকে নগর উন্নয়নের সচিব করা হয়েছে। তিনি ইতিপূর্বে গঙ্গা ডেভেলপমেন্ট অথরিটি'র ডিরেক্টর এবং বিশ্ব ব্যাঙ্কের নগর উন্নয়ন দপ্তরের দায়িত্বেও ছিলেন। জনৈক দক্ষিণ ভারতীয় আমলা জিগ্যেস করলেন, 'হতাশ ও অসন্তুষ্ট ঐ সব যারা এসব বলে বেড়াচ্ছে তাঁদের ইচ্ছেটা কি–শিবরামকৃষ্ণণকে তাঁর যাবতীয় দক্ষতা সত্ত্বেও নগর উন্নয়নের দায়িত্ব দেওয়া ঠিক হবে না…?'

১৯৫৫ সালের ব্যাচে ছিলেন বিহার ক্যাডারের এস আর শ্রীনিবাসন। বিহারের, দক্ষিণ ভারতের কোনও রাজ্যের নন। তিনি সম্প্রতি স্বাস্থ্যমন্ত্রকের সচিব নিযুক্ত হয়েছেন। তাঁর ব্যাচে তিনি ছিলেন একাদশ স্থানাধিকারী। পূর্বে তিনি ছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রকে যুগ্ম সচিব, পরে বিহারের মুখ্য সচিব হয়েছিলেন। জনৈক আমলার মতে, শ্রীনিবাসন সম্পর্কে একটা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দেওয়া একটা

আজকের মতোই, আমলা মহলে ভারতীয়দের বিশেষত তামিল ব্রাহ্মণদের একটা সংখ্যাগরিষ্ঠতা দেখা গিয়েছিল, অর্থাৎ এই যে তামিল প্রাধান্য এটা আসলে আকস্মিকতাই–পরিকল্পিত ঘটনা।

আসলে মূল ব্যাপারটার দিকে লক্ষ রাখলে অন্যরকম ছবিই প্রতিফলিত হবে। ১৯৫১ সালে ১৪ জন আই এ এস অফিসারের মধ্য নজন ছিলেন দক্ষিণের, ১৯৫২তে ১৪ জনের মধ্যে সাতজন, ১৯৫৩–তে কুড়ি জনের মধ্যে ছয়, ১৯৫৪তে ৩৪ জনের মধ্যে ছিলেন মাত্র ১৩ জন। প্রখ্যাত সাংবাদিককে আর সুন্দররাজন বললেন, 'একটা সময়ে দক্ষিণ ভারতীয় এবং বাঙালীরা সরকারী চাকরিতে ছিলেন সংখ্যাগরিষ্ঠ, এল ডি ক্লার্ক থেকে সচিব পর্যন্ত।' প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয়ের মুখপাত্র জি পার্থসারথি'র মতে, 'প্রাক-স্বাধীনতা যুগে মাদ্রাজ এবং বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা-কেন্দ্র।'

সেসময় রসিকতা চালু ছিল, সরকার চালায় 'ম্যাড্রাসিস অ্যান্ড চাপরাসিস,' আর অডিট

প্রখ্যাত সাংবাদিককে আর সুন্দররাজন বললেন, 'একটা সময়ে দক্ষিণ ভারতীয় এবং বাঙালীরা সরকারী চাকরিতে ছিলেন সংখ্যাগরিষ্ঠ, এল ডি ক্লার্ক থেকে সচিব পর্যন্ত।' প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয়ের মুখপাত্র জি পার্থসারথি'র মতে, 'প্রাক-স্বাধীনতা যুগে মাদ্রাজ এবং বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা-কেন্দ্র।'

কংগ্রেস–ই'র সাধারণ সম্পাদক হিসেবেই আমলাদের মধ্যে ৯২টি রদবদলের জন্য রাজীব গান্ধীকে দায়ী করা হয়েছিল। বর্তমানে রাজীব প্রধানমন্ত্রীত্বে আসার পর আমলা মহলে দক্ষিণ ভারতীয় লবি গড়ে ওঠার যে একটা প্রবণতা দেখা দিয়েছে, ব্যাপারটি কি নিতান্তই ঘটনাচক্রেই ঘটছে?

বর্তমানে ৪৬ জন কেন্দ্রীয় সচিবের মধ্যেই ২০ জনই দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের। অবশ্য একটা রাজ্য থেকে সবচেয়ে বেশি সচিবের সংখ্যা ১২, রাজ্যটি হল উত্তরপ্রদেশ। জনৈক দক্ষিণ ভারতীয় সচিব ক্ষোভ প্রকাশ করে বললেন, 'কই, কেউ তো উত্তরপ্রদেশ নিয়ে কথা বলেন না? তাছাড়া, কোন নিয়োগই অন্যায্য বা নিয়ম বহির্ভূত ভাবে ঘটেনি। যেমন দেখুন, কে পি গীতকৃষ্ণণ ১৯৫৮ আই এ এস ব্যাচের শীর্ষস্থানে ছিলেন। তাঁকে দেওয়া হয়েছে পরিবেশ মন্ত্রকের দায়িত্ব, পোস্টিংটা কনফিডেনসিয়াল রিপোর্ট দেওয়া হয়েছিল বলেই এত উন্নতি। অর্থাৎ যেন ভদ্রলোকের আগের কৃতিত্বগুলো কিছুই নয়। ১৯৫৫ ব্যাচের আরেক ব্যক্তিত্ব জে এ কল্যাণকৃষ্ণণকে স্বরাষ্ট্র দপ্তরের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল, পরে তিনি কেন্দ্র সমাজকল্যাণ দপ্তরের সচিব এবং তারপরে হন উত্তরপ্রদেশের মুখ্য সচিব। এসব ব্যাপারে যা দেখা যাচ্ছে তাতে প্রাদেশিকতার চেয়ে তো প্রশাসনিক দক্ষতাই বেশি মান্য হচ্ছে।

কিন্তু চিদাম্বরমকে প্রাদেশিক-মনোভাবাপন্ন বললে জাতপাতের বিচার-সম্পন্ন এক সংকীর্ণচেতা ব্যক্তিত্ব তো তাঁকে বলতে হয়। কারণ তামিল চেতনায় জাতিগত ভাবনা চিন্তার একটা বিশিষ্ট স্থান আছে। তবে চিদাম্বরমের ক্ষেত্রে এ অভিযোগ ততটা জোরালো নয়, তিনি তামিল-ব্রাহ্মণদের গুরুত্ব দেবেন কেন, নিজে যখন একজন 'চেট্টিয়ার' বৈশ্য সম্প্রদায়ের। পঞ্চাশের দশকেও, ঠিক সার্ভিসকে বলা হত 'আয়ার অ্যান্ড আয়েঙ্গার সার্ভিসেস।' পরবর্তীকালে উত্তরভারতে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা-কেন্দ্র রূপে গুরুত্ব অর্জন করে, পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে সেখান থেকে যে বিশাল সংখ্যক শিক্ষিত তরুণ বেরিয়ে আসেন, তারই প্রতিফলন ঘটেছে আজকের সিভিল সার্ভিসে, সেখানকার বারো জন আই এ এস সচিব পদে রয়েছেন। দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় ও জে এন ইউ বর্তমানে যেভাবে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাকেন্দ্র রূপে গড়ে উঠেছে, তাতে পরবর্তীকালের আই এ এস–রা যদি বেশির ভাগ সেখান থেকেই উঠে আসেন, বিস্ময়ের কিছু নেই। এ ব্যাপারে জনৈক যুগ্ম সচিব একটি ভাল কথা বলেছেন, 'ঐসব শিক্ষাকেন্দ্রগুলির চরিত্র এত কসমোপলিটান, এমন কি, বর্তমানে কোন প্রার্থী কোন রাজ্যের ক্যাডার ঠিক করতে বেশ মুস্কিলে পড়তে হয়। প্রার্থীর জন্ম এক রাজ্যে, শিক্ষা অন্য রাজ্যে, বসবাস অন্য আরেক রাজ্যে।'

মনে হয়, এটাই তো ভাল। প্রাদেশিকতার অভিযোগ তাহলে তো আর সমস্যা হয়ে ওঠে না। প্রাক্তন বিদেশ সচিব এ পি ভেঙ্কটেশ্বরণ জানালেন, 'সচিবপদে সাম্প্রতিক নিয়োগগুলি যদি যোগ্যতানুসারে না ঘটে থাকে, এঁরা তাহলে পূর্ববর্তী পাঁচ পাঁচটি বাধা টপকে এলেন কি করে? সব কটা ক্ষেত্রেই রাজনৈতিক প্রভাব কাজ করছে, এটা বিশ্বাস করা অতি–সরলীকৃত ব্যাপার হয়ে যায়। এই প্রথম দক্ষিণ ভারতের লোকজন আমলা মহলে প্রাধান্য পাচ্ছে এটাই কি এত বিতর্কের মূল, এতদিন তো উত্তরভারতেরই প্রাধান্য ছিল, তখন তো এত হৈ চৈ ওঠেনি।' আরেকজন দক্ষিণ ভারতীয় আমলার বক্তব্য 'এ যেন আব্রাহাম লিঙ্কনের আমলের আমেরিকা, দেশটা সেসময় উত্তর ও দক্ষিণে চিহ্নিত হয়ে গিয়েছিল। এ সবের কোনও মানে হয়!'

তবে বর্তমান নিয়োগগুলির পেছনে যাই কারণ থাকুক, যোগ্যতার মাপকাঠিতে সেগুলিকে কিছুতেই অস্বীকার করা যাবে না। সব আমলারাই তো রাজনৈতিক গডফাদার কেউ না কেউ থেকেই থাকেন, এটা তো এমনিতেই সত্যি।

যাঁরা পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ আনেন, তাঁরা কারণ হিসেবে জাতপাত, আঞ্চলিকতা, ধর্ম–এসবের উল্লেখ করে থাকেন। সুন্দররাজন বলেছেন, 'যে কোন স্তরে যখনই কোন অফিসারকে অন্যকে সুপারসীড করে অন্যায়ভাবে নিয়োগ করা হয়–তার পেছনে থাকে কোন মাফিয়া বা সাব-মাফিয়া গোষ্ঠের প্রভাব।' যে ব্যাচ বর্তমানে 'আন্ডার রিভিউ', সেগুলি বাদ দিয়ে যখন সিনিয়র ব্যাচকে প্রাধান্য দেওয়া হয়, সাম্প্রতিক নিয়োগ-গুলির কিছু কিছু ক্ষেত্রে যা ঘটেছে, তখনই আসলে অভিযোগ ওঠে। পছন্দ না হলে নিজস্ব ক্ষোভ প্রশমনের একটা সহজ সমাধান হচ্ছে, সম্মানের সঙ্গে বিদায় গ্রহণ করা।

জুনিয়ার ব্যাচের কাউকে যখন সচিব-স্তরে নিয়োগ করা হয়, তখন বহুক্ষেত্রেই অভিযোগ ওঠে। জে সি জেটলে বনাম অনিল বোরদিয়া'র কেসটি এক্ষেত্রে স্মরণ করা যেতে পারে। জেটলে'র মত সিনিয়রকে অতিক্রম করে ১৯৫৭ ব্যাচের অনিলকে শিক্ষা দপ্তরের সচিবরূপে নিয়োগ করা হয়েছিল। জেটলে গেলেন 'সেন্ট্রাল অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ট্রাইবুনাল' বা সংক্ষেপে 'ক্যাট'–এর কাছে। 'ক্যাট' কেসটি বিচার করে দেখলেন, জেটলের অভিযোগের সঙ্গত কারণ আছে। তাঁরা সরকারকে নির্দেশ দিলেন, সচিবস্তরে প্রমোশনের ব্যাপারে গাইডলাইন ঠিক করুন। সরকার সুপ্রীম কোর্টে আপীল করলেন। সুপ্রীম কোর্ট ক্যাট–এর রায় খারিজ করে দিয়ে বললেন, সরকারি কর্মচারী হিসেবে বাছাই–এর ব্যাপারে সরকার তার নিজস্ব পছন্দসই কাজ করবে। এদিকে 'ক্যাট'–এর ক্ষমতা প্রায় হাইকোর্টের সমান। আই এ এস লবি এই রায়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন।

একজন কেন্দ্রীয় সচিব নিয়োগের ব্যাপারে সাধারণত সিনিয়ারিটি এবং মেরিট, এ দুটো জিনিস বিবেচিত হয়ে থাকে। শেষোক্ত বিষয়টি অধিক গুরুত্ব পায়। ভেঙ্কটেশ্বরণ–এর মতে,

জুনিয়ার ব্যাচের কাউকে যখন সচিব-স্তরে নিয়োগ করা হয়, তখন বহুক্ষেত্রেই অভিযোগ ওঠে। জে সি জেটলে বনাম অনিল বোরদিয়া'র কেসটি এক্ষেত্রে স্মরণ করা যেতে পারে। জেটলে'র মত সিনিয়রকে অতিক্রম করে ১৯৫৭ ব্যাচের অনিলকে শিক্ষা দপ্তরের সচিবরূপে নিয়োগ করা হয়েছিল। জেটলে গেলেন 'সেন্ট্রাল অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ট্রাইবুনাল' বা সংক্ষেপে 'ক্যাট'-এর কাছে। 'ক্যাট' কেসটি বিচার করে দেখলেন, জেটলের অভিযোগের সঙ্গত কারণ আছে। তাঁরা সরকারকে নির্দেশ দিলেন, সচিবস্তরে প্রমোশনের ব্যাপারে গাইডলাইন ঠিক করুন।

তামিল প্রাধান্য: অস্থায়ী ঘটনা

প্রকৃত অবস্থা যা, ১৯৪৮ থেকে ১৯৫৮–র মধ্যে সিভিল সার্ভিসে দক্ষিণ ভারতীয়দের যে প্রাধান্যটা দেখা দিয়েছিল, তুলনায়-বর্তমানে সেটা ঘাটতির দিকে। ১৯৮৬ সালে ১,৭২৫ জন সফল প্রার্থীর মধ্যে মাত্র ৩৫০ জন ছিলেন দক্ষিণ ভারতীয়। ১৯৮৫–তে ১,৬২৫ জনের মধ্যে ছিলেন মাত্র ২৪০ জন। এই হারটা বজায় থাকলে, জনতা এম পি সুব্রহ্মণ্যম স্বামীর মতে, পরবর্তী পাঁচ কি ছয় বছরের মধ্যে সিভিল সার্ভিসে দক্ষিণ ভারতের প্রতিনিধিত্ব বোধহয় শূন্যেই পৌছোবে।

এই অবনতির মূলে কয়েকটি কারণ আছে। প্রথমত, উত্তর ভারতে শিক্ষার ক্রমবর্ধমান অগ্রগতি। ফলত, সিভিল সার্ভিসে বৃদ্ধি পাচ্ছে প্রতিযোগিতা। দ্বিতীয়ত, তামিলনাডু–তে ব্রাহ্মণ-বিরোধী আন্দোলনের একটা হাওয়া তৈরি হয়েছিল, তা ক্রমশ কমে আসায় বর্তমানে সেখানকা শিক্ষিত লোকজনের একটা বড় অংশ চাকরির জন্য আর রাজ্যের বাইরে যেতে চাইছেন না। শেষে, বলা যায়, সিভিল সার্ভিসের কদরও আর আগের মতো নেই, এখন সে তুলনায় অন্য আরো অনেক আকর্ষণীয় পেশা ও চাকরির সৃষ্টি হয়েছে প্রাইভেট সেকটরে।

দক্ষিণ ভারতের লোকেদের সিভিল সার্ভিসে ক্রমহ্রাসমান সংখ্যার জন্য রাজ্য শিক্ষানীতিও অনেকাংশে দায়ী। যেমন, পি চিদাম্বরম–এর একটি বিবৃতি অনুযায়ী, সম্প্রতি সিভিল সার্ভিসের জন্য ঘোষিত প্রার্থীদের মধ্যে মাত্র তিনজন তামিল, আরও আশ্চর্য এদের একজনও তামিলনাডুতে লেখাপড়া করেননি। রাজ্য-সরকার সরকারী স্কুলের ছাত্রদের উৎসাহ দেন প্রাইভেট স্কুলগুলির নয়। এই নীতিটা তাঁদের ক্ষেত্রে বুমেরাং হয়ে দেখা দিয়েছে। সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় রাজ্যের ছাত্ররা পিছিয়ে পড়ছেন।

প্রাক্তন বিদেশসচিব এ পি ভেঙ্কটেশ্বরণ
ছবি: গিরীশ শ্রীবাস্তব

'সিনিয়ারিটি হচ্ছে মাতৃত্ব আর মেরিট হলো পিতৃত্ব।' স্বভাবতই, প্রথমটি বাস্তব, দ্বিতীয়টি মতামত। আর, মতামতের গরমিল তো ঘটেই থাকে। আরেকটা ব্যাপারও আছে, একজন আমলার দক্ষতা তাঁর নিকট–প্রভু অর্থাৎ মন্ত্রীমহোদয়ের বিশ্বাসভাজন হওয়ার উপরেও নির্ভর করে। ১৯৭৭ সালে ইন্দিরা অনুগত সন্দেহে বহু অফিসারকে জনতা সরকার চিহ্নিত করেন। আজও, কোন 'গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রকে নিয়োগের আগে সংশ্লিষ্ট অফিসারকে নিখুঁতভাবে পরীক্ষা করা হয়ে থাকে।

এন কে সিংহের কথা ধরা যাক। প্রণব মুখার্জী যখন বাণিজ্য মন্ত্রী ছিলেন–সিংহ ছিলেন তাঁর স্পেশাল অ্যাসিস্ট্যান্ট। প্রণববাবুর পতনের পর সিংহ–কে নির্বাসন দেওয়া হয় টোকিও–য়। পরে অরুণ নেহেরু যখন ক্ষমতার শীর্ষে, তিনি এন কে সিংহ–কে কেন্দ্রে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেন, অন্যানাদের প্রবল বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয় তাঁকে তখন। প্রতিটি মন্ত্রী চান তাঁর সচিব অনুগত ও বিশ্বস্ত হবেন। অর্জুন সিংহকে যখন পাঞ্জাবের রাজ্যপাল করে পাঠানো হয়, তিনি সঙ্গে নিয়ে যান দু'জন মধ্যপ্রদেশ ক্যাডারকে। অতীতেও এ ঘটনা ঘটেছে। গোবিন্দবল্লভ পন্থ তাঁর কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকে প্রচুর অফিসার আনিয়েছিলেন উত্তরপ্রদেশ থেকে। এসব ঘটনাই ধীরে ধীরে মেরিটের স্থানে স্বজনপোষণ-এর মানসিকতাকে প্রশ্রয় দিয়েছে।

এবার রাজ্য-স্তরের প্রসঙ্গ। ১৯৬১ ব্যাচের আর কে ঠক্করকে যখন জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যসচিব করে পাঠানো হল, দেখা গেল, তিনি বহু সহকর্মীকে সুপারসীড করে এসেছেন। কিন্তু যখন তাঁকে আবার কেন্দ্রে ফিরিয়ে আনা হল, দেখা গেল তিনি ফুড কর্পোরেশনের সামান্য জয়েন্ট সেক্রেটারি রূপে নিযুক্ত। ১৯৬০ ব্যাচের বি কে গোস্বামীকে জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যসচিব করে পাঠানো হয় ওভাবেই, পরে কেন্দ্রে যখন তিনি ফিরে এলেন তাঁকে করা হল পর্যটনের ডিরেক্টর, পদটি অতিরিক্ত সচিব পর্যায়ের। এই সেদিনও ১৩ জন অফিসারকে ডিঙিয়ে ১৯৫৯ ব্যাচের অরুণ পাঠক বিহারের নতুন মুখ্যমন্ত্রী ভগবত ঝা আজাদ–এর সঙ্গে গেলেন সে রাজ্যের মুখ্যসচিব হয়ে। সচিব–পর্যায়ের মাইনের প্যাকেটে করে নাকি অবহেলিত আমলাদের উৎকোচ প্রদান করা হয়েছিল সে সময়, এমন কথাও শোনা যায়।

কেন্দ্রে, সান্ত্বনা দেবার মত কিছু পদ রাখা হয়েছে, সেগুলি ক্ষুব্ধ অফিসারদের দেওয়া হয়ে থাকে। যেমন–মেম্বার-সেক্রেটারি: ফিনান্স কমিশন, মেম্বার-সেক্রেটারি: অ্যাডভাইসারি বোর্ড অন এনার্জি, সেক্রেটারি: সিডিউলড ট্রাইব কমিশন, সেক্রেটারি: মাইনরিটিজ কমিশন, কো-অর্ডিনেশন সেক্রেটারি অথবা অফিসার অন স্পেশাল ডিউটি (ক্যাবিনেট সেক্রেটারির অধীনে) প্রভৃতি।

প্রতিবছর সচিবপদে প্রমোশনের জন্য গোপন প্যানেল তৈরি হয়। ক্যাবিনেট সচিবের অধীনে তিন-চারজন সচিব এটি তৈরি করে প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদনের জন্য পদ্ধতি–অনুযায়ী পাঠিয়ে থাকেন। বহু সিনিয়র আমলাই মনে করেন, রাজনৈতিক কারণে ঐ প্যানেলে মাঝপথে অদলবদল করা হয়ে থাকে।

যুগ্ম সচিব পদে প্রোমোশনের জন্য ১৯৮৬ সাল থেকে সিভিল সার্ভিসেস বোর্ড কাজ করে আসছেন। ওদের সুপারিশ অনুমোদনের জন্য যায় 'মিনিস্টার অফ স্টেট ফর পারসোনেল' অবধি। ঐ দপ্তরের জনৈক যুগ্ম সচিব জানালেন, ঐসব সুপারিশ সচরাচর গ্রহণ করা হয়ে থাকে। কিন্তু কখনো কখনো কোন নাম খারিজ করে সেখানে নতুন নাম চাওয়া হয়, এটা নিশ্চয়ই রাজনৈতিক কারণে ঘটে। গুজরাল–এর মতে, '১৯৭২ থেকে ঐ পার্সোনেল দপ্তরটি প্রধানমন্ত্রীর অফিসেরই প্রক্সি দিয়ে চলেছে।' চিদাম্বরম সমালোচিত হচ্ছেন সম্ভবত একারণেই।

সেন্ট্রাল অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ট্রাইবুনাল (ক্যাট)

সিনিয়রিটি এবং প্রমোশন-সংক্রান্ত যেসব বিতর্ক সরকারী চাকরিতে দেখা দেয়, সেগুলি এই ট্রাইবুনাল বিচার করে থাকেন। সেন্ট্রাল অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ট্রাইবুনালকে সংক্ষেপে 'ক্যাট' বলা হয়ে থাকে। দেখা যাচ্ছে, দিন দিন ট্রাইবুনালে কেসের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। ১৯৮৮'র মার্চ মাসেই এই ধরনের কেসের সংখ্যা ছিল ২৩,৫০৫ টি। 'ক্যাট' অবশ্য এই ব্যাপারে বিস্তৃত তথ্য দিতে চাননি। তাঁদের বক্তব্য, এ রকম তথ্য দেওয়া যায় না। প্যানেলের সুপারিশ কেন্দ্র বা রাজ্য সরকার কতটা গ্রহণ করেন, এ তথ্যও তাঁরা দিতে চান না।

'ক্যাট' অবশ্য কেসগুলি তাড়াতাড়ি মিটিয়ে ফেলতে চান, কিন্তু অভিযোগকারীদের বক্তব্য, হয়রান করাবার উদ্দেশ্যে 'অন্যপক্ষ' অর্থাৎ সরকার অনর্থক বিলম্ব ঘটান, যেমন, তাঁদের প্রতিনিধি হয়তো শুনানীর তারিখে উপস্থিত থাকলেন না, কিংবা জবাবদিহির কাগজপত্র জমা দিতে অযথা দেরি করছেন। প্রায় ক্ষেত্রেই অভিযুক্ত পক্ষটি হয়ে থাকেন হয় রাজ্য অথবা কেন্দ্রের সরকার।

লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, অভিযোগকারীর পক্ষে যখন রায়টা যায়, সংশ্লিষ্ট বিভাগ বিষয়টিকে 'প্রেস্টিজ ইস্যু' তৈরি করে ঐ রায় কার্যকর করতে নানারকম গড়িমসি শুরু করে। দেখা যায়, বহু ক্ষেত্রে অভিযোগকারীকে ফের সেই ট্রাইবুনালের কাছেই 'কনটেম্পট প্রসিডিংস' ফাইল করতে হচ্ছে। ফল যা দাঁড়ায়, শেষমেষ আরো বিলম্ব, আরো হয়রানি। যোগাযোগ মন্ত্রকের জনৈক সিনিয়র আমলার মতে, অনেক ক্ষেত্রে অভিযোগকারীর নাম কালো-তালিকাভুক্ত হয়ে যায়, তাঁকে জুনিয়র ও নাতি-গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রীদের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

যুগ্ম সচিব পদে প্রোমোশনের জন্য ১৯৮৬ সাল থেকে সিভিল সার্ভিসেস বোর্ড কাজ করে আসছেন। ওদের সুপারিশ অনুমোদনের জন্য যায় 'মিনিস্টার অফ স্টেট ফর পারসোনেল' অবধি। ঐ দপ্তরের জনৈক যুগ্ম সচিব জানালেন, ঐসব সুপারিশ সচরাচর গ্রহণ করা হয়ে থাকে। কিন্তু কখনো কখনো কোন নাম খারিজ করে সেখানে নতুন নাম চাওয়া হয়, এটা নিশ্চয়ই রাজনৈতিক কারণে ঘটে।

চিদাম্বরম প্রধানমন্ত্রীর ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি, ফলে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বিরা চাউর করে বেড়াচ্ছেন, সাম্প্রতিক নিয়োগগুলিতে রাজনৈতিক প্রভাব রয়েছে! প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টাগণ মনে করতে পারেন, চিদাম্বরম দক্ষিণ থেকে অফিসার আনাতেই পারেন, কারণ বর্তমানে আমলাদের মধ্যে উত্তরভারতের যাঁরা রয়েছেন তাঁরা হয়তো ভি পি সিংহ, দেবীলাল অথবা চন্দ্রশেখরের ক্রমবর্ধমান প্রভাবান্বিত হয়ে উঠতে পারেন। সেক্ষেত্রে, দক্ষিণ অনেক নিরাপদ!

সূক্ষ্মভাবে বিচার করলে দেখা যাবে সাম্প্রতিক ছ'জন তামিল সচিব নিয়োগের ব্যাপারে কিছুটা রাজনীতি আছেই এই ধারণা বা গুজব, পরবর্তীকালে আমলাদেরও তো ক্ষতি করবে। আজ, মন্ত্রীরা 'ইয়েস ম্যান' দিয়ে কাজ চালাবেন, হঠাৎ সরকার বদলে গেলে ঐ আমলাদের কি হবে?

এন ডি তিওয়ারি যখন শিল্প মন্ত্রী ছিলেন, তাঁর দপ্তর ছিল তিওয়ারি আর শর্মায় ভর্তি। বেঙ্গল রাও যখন ঐ পদ পেলেন, অফিসার্ সব এলেন রাও আর শাস্ত্রীরা। ভি পি সিংহ অর্থমন্ত্রী থাকার সময় তাঁর দপ্তরের অফিসাররাও সব উত্তরপ্রদেশের লোক ছিলেন। জনৈক সিনিয়র আমলার মতে, অচেনা বন্ধুর চেয়ে চেনা শত্রুও ভাল! এই নীতিই সম্ভবত মন্ত্রীরা মেনে চলেন।

অরুণ নেহেরুর আস্থাভাজন অফিসার পি কে কল–১৯৮৫তে ক্যাবিনেট সচিব পদে নিযুক্ত হন, আট থেকে দশ জন অফিসারকে ডিঙিয়ে তিনি ঐ পদে যান। অরুণ নেহেরুর পতনের পর কল–কে পাঠিয়ে দেওয়া হয় রাজদূত করে সুদূর ওয়াশিংটনে। ভুরেলাল এবং বিনোদ পাণ্ডে ছিলেন ভি পি সিংহের খুব আস্থাভাজন অফিসার। ভি পি সিংহের প্রস্থানের পর যথারীতি উক্ত অফিসারদ্বয়ের ভাগ্যেও যথেষ্ট লাঞ্ছনা জুটেছে।

মজার ব্যাপার হচ্ছে, ইন্দিরা গান্ধী নিজেই ১৯৮৩ সালে একটি নির্দেশ জারি করেছিলেন, কোন মন্ত্রকে একটি বিশেষ রাজ্যের অফিসারদের যেন বেশি সংখ্যায় নিয়োগ না করা হয়, অথচ, এই ইন্দিরা গান্ধীকেই প্রাদেশিকতার অভিযোগে সবচেয়ে বেশি অভিযুক্ত করা হয়ে থাকে। ফলস্বরূপ, কোন মন্ত্রকে যখনই বিশেষ কোন রাজ্যের অফিসারদের সংখ্যাধিক্য ঘটে থাকে, অন্তত কাগজপত্রে সেই সংখ্যাটি কমিয়ে রাখার চেষ্টা করা হয়। জনৈক যুগ্ম সচিব জানালেন, রাজ্যান্তরেও এই নির্দেশ পালিত হয়, সেখানে কোন দপ্তরে সাধারণত এক-তৃতীয়াংশ পদে সেই রাজ্য-ক্যাডারদের রাখা হয়, বাকি দুই-তৃতীয়াংশ অন্য রাজ্য ক্যাডারদের জন্য রাখা থাকে।

প্রমোশনের ব্যাপারে এইসব অনিয়মের জন্য এন এস সাকসেনা একটা ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তাঁর মতে, 'রাজনৈতিক নেতা ও আমলা এই উভয়শ্রেণীই হচ্ছেন অনুৎপাদক শ্রেণীভুক্ত, এঁরা সবসময়েই সমাজের উৎপাদক শ্রেণীভুক্ত লোকজনদের উপর প্রভুত্ব বিস্তারের চেষ্টা করে থাকেন। এই উদ্দেশ্যপূরণ করতে গিয়ে উক্ত দুই শ্রেণীকে কখনো কখনো কিছু অনিয়মকে প্রশ্রয় দিতেই হয়। এই ব্যবস্থায় স্বভাবতই একটা নিম্নস্তরের দক্ষতা তৈরি হয়–'এই দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে বিচার করলে সব 'ম্যানিপলেশন'–এরই ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া যাবে।

কথাটা সত্যি। একজন সিনিয়র সচিব তিন তিনজন মন্ত্রীর আমল পার করে এখনো টিকে রয়েছেন। তাদের মধ্যে দুজন মন্ত্রীকে নিয়ে কিছু বিতর্কও আছে। অন্য কয়েকজন আমলার বক্তব্য, ওই সচিব মহাশয়ের সরাসরি প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয়ে ঢোকার একটা ক্ষমতা আছে কিনা–তাই, এ ব্যাপারে আরেকজন সিনিয়র অফিসার ভদ্রলোককে খুব সাহায্য করে থাকেন। সংশ্লিষ্ট আমলাটি নাকি এই সিনিয়র অফিসারের দুই ছেলেকে আমেরিকায় ভাল চাকরি ও স্কলারশিপের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন।

কিন্তু এইসব ঘটনায় নির্দিষ্ট কোন আমলাকে অভিযুক্ত করাটা ভুল। সামগ্রিকভাবে, পচনটা শুরু হয়েছে শীর্ষ থেকেই। একজন আমলাকে শেষপর্যন্ত তাঁরা রাজনৈতিক প্রভুর অর্থাৎ তার মন্ত্রীর নির্দেশগুলিকেই রূপায়িত করতে হয়। সেক্ষেত্রে, বর্তমানে একজন আমলাকে বিশ্বাসভাজন এবং দায়িত্ববান হতেই হয়। আমলাতন্ত্রের ভিতটা সামান্য নড়বড়ে হয়ে উঠছে এ কারণেই। চিদাম্বরম কিংবা নতুন নিযুক্ত সচিব–এঁরা সবাই বর্তমান অবস্থারই শিকার। তাঁদের মধ্যে পারস্পরিক কোন বোঝাপড়া যে আছে, তা নয়। ●

কয়েকটি প্রধান কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের সচিবদের তালিকা

মন্ত্রক	সচিবের নাম	কোন রাজ্যের	ক্যাডার
ক্যাবিনেট	বি জি দেশমুখ	মহারাষ্ট্র	মহারাষ্ট্র
স্বরাষ্ট্র	জে এ কল্যাণকৃষ্ণণ	তামিলনাড়ু	উত্তরপ্রদেশ
প্রতিরক্ষা	টি এন শেষাণ	কেরল	তামিলনাড়ু
বাণিজ্য	এ এন ভার্মা	উত্তরপ্রদেশ	মধ্যপ্রদেশ
অর্থ	এস ভেঙ্কটরামন	তামিলনাড়ু	তামিলনাড়ু
শিল্প	শ্রীমতী ওতিমা বোর্‌দিয়া	উত্তরপ্রদেশ	রাজস্থান
পেট্রোকেমিক্যালস	হামিদ কে খান	মহারাষ্ট্র	গুজরাট
কয়লা	এস বরদান	কর্ণাটক	কর্ণাটক
অসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটন	এস কে মিত্র	উত্তরপ্রদেশ	হরিয়ানা
কৃষি	সি শ্রীনিবাস শাস্ত্রী	অন্ধ্রপ্রদেশ	অন্ধ্রপ্রদেশ
সরকারী উদ্যোগ	গিরিশ মেহেরা	উত্তরপ্রদেশ	উত্তরপ্রদেশ
তথ্য ও সমাচার	গোপীকৃষ্ণ অরোরা	উত্তরপ্রদেশ	উত্তরপ্রদেশ

এই তালিকা থেকে যা দেখা যাচ্ছে, উল্লিখিত বারোটি প্রধান প্রধান মন্ত্রকের মাত্র পাঁচজন সচিব এসেছেন দক্ষিণ ভারতের চারটি রাজ্য থেকে, অপরপক্ষে পাঁচজন এসেছেন শুধু উত্তরপ্রদেশ থেকেই। সেক্ষেত্রে বলা যায়, উত্তরপ্রদেশই হচ্ছে সেই রাজ্য, যেখান থেকে অফিসারদের একক সংখ্যাধিক্য ঘটেছে, দক্ষিণের কোনও রাজ্য থেকে নয়।

কথাটা সত্যি। একজন সিনিয়র সচিব তিন তিনজন মন্ত্রীর আমল পার করে এখনো টিকে রয়েছেন। তাদের মধ্যে দুজন মন্ত্রীকে নিয়ে কিছু বিতর্কও আছে। অন্য কয়েকজন আমলার বক্তব্য, ওই সচিব মহাশয়ের সরাসরি প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয়ে ঢোকার একটা ক্ষমতা আছে কিনা-তাই, এ ব্যাপারে আরেকজন সিনিয়র অফিসার ভদ্রলোককে খুব সাহায্য করে থাকেন। সংশ্লিষ্ট আমলাটি নাকি এই সিনিয়র অফিসারের দুই ছেলেকে আমেরিকায় ভাল চাকরি ও স্কলারশিপের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন।

শরীরী মায়ায়

গ্রামের মেয়ে বীণা। শিক্ষিতা। প্রেমে পড়ল এক বয়স্ক বিবাহিত পুরুষের, যার আবার তিনটি ছেলেমেয়ে রয়েছে। এর পরিণতি কি হতে পারে? যা স্বাভাবিক তাই, কারুর না কারুর চরম ত্যাগ। সেই ত্যাগ স্বীকার করতে হল কৃষ্ণা নাম্নী গৃহবধূটিকে, নিজের জীবনটাই তাকে ত্যাগ করতে হল, স্বামীর অবৈধ প্রণয়ের মূল্য দিতে গিয়ে।

বীণা
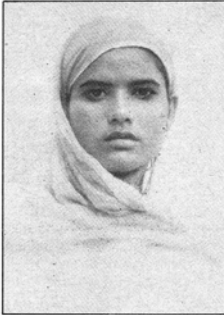
বেদ সিংহ

বীণাকে দেখেই বেদ সিংহ মুগ্ধ হয়ে গেলেন। নিষ্পাপ চোখমুখ, সারা দেহে একটা চমৎকার গ্রাম্য চঞ্চলতা। বেদ সিংহ বন্ধু ডাঃ সতীশ চন্দ্রকে কৌতূহলের সঙ্গে জিগ্যেস করলেন, 'মেয়েটি কে? তোমার বাসায় তো আগে কখনো দেখিনি!'

'আমার বোন, বীণা। গতকাল এসেছে গ্রাম থেকে। বলল, 'দাদা আমাকে শহরে নিয়ে চলো, ইন্টারমিডিয়েট অবধি পড়লাম, একটা চাকরি-বাকরির চেষ্টা করি,' তাই নিয়ে এলাম। আলাপ করবে?' সতীশ-এর প্রশ্ন। গভীর আগ্রহের সঙ্গে বেদ সিংহ বললেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ নিশ্চয়ই, ডাকো না।'

সতীশ ডাকলেন বীণাকে এঘরে। আলাপ করিয়ে দিলেন বেদ সিংহের সঙ্গে। কিছুক্ষণ মামুলি কথাবার্তার পর বেদ সিংহ জিগ্যেস করলেন, 'শুনলাম আপনি চাকরি করতে চান?'

বীণা নম্রস্বরে বলল, 'আজ্ঞে হ্যাঁ। দিল্লি পুলিশের আণ্ডারে যদি কোন কাজকর্ম পেতাম, খুব ভাল হত।' বেদ সিংহ প্রত্যয়ের সঙ্গে বললেন, 'আচ্ছা-হয়ে যাবে। পুলিশে আমার চেনাশোনা বড় অফিসার আছে ক'জন। আমি চেষ্টা করবো, অবশ্যই।'

বেদ চলে যাবার পর বীণাকে সতীশ বললেন, 'আমার এই বন্ধুটি কিন্তু খুব হেল্পফুল। আমাকে ভীষণ পছন্দ করে, অনেক উপকার পেয়েছি ওর থেকে। তোর চাকরির ব্যাপারে ওর সাহায্য খুবই কাজে লাগবে।' ডাঃ সতীশচন্দ্রের বাড়ি গাজিয়াবাদ জেলার উপেড়া গ্রামে। অবিবাহিত সতীশ ডাক্তারির একটা ডিগ্রি নিয়ে নিকটবর্তী দশধরা গ্রামে একটি ক্লিনিক খুলে প্র্যাকটিস শুরু করেন। ঐ গ্রামে একটি বাড়িও কেনেন। বেদ সিংহের বাড়িও সেই গ্রামে, বেদ-এর ছিল ভাল্ ব্যবসা। বেদ বিবাহিত ছিলেন, তিনটি ছেলেমেয়েও ছিল তাঁর। তাঁর তিন ভাই দিল্লীতে চাকরি করতেন। ওদিকে, সতীশের তেমন আয় ছিল না। ডাক্তারির পসার ওঁর তেমন জমেনি। বেদ-এর আরেকটা কারবার ছিল। লোকেদেরকে টাকা পয়সা ধার দিতেন, চড়া সুদের বিনিময়ে। সতীশও কয়েকবার বেদ-এর কাছে টাকাপয়সা ধার নিয়েছেন, তবে সুদ তাঁকে দিতে হয়নি। দু'জনের মধ্যে বেশ ভাল বন্ধুত্ব হয়ে গিয়েছিল।
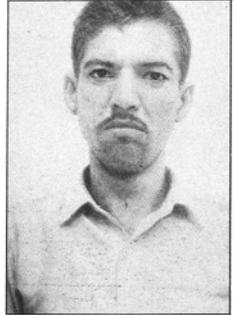
বীণার সঙ্গে ধীরে ধীরে বেদ-এর ঘনিষ্ঠতা বাড়তে থাকে। কারণে অকারণে বেদ সতীশের বাড়ি গিয়ে বসে থাকতেন। সতীশ-এর অনুপস্থিতিতেও বেদ গিয়ে বীণার সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা গল্প করতেন। সতীশ সবই বুঝতেন, কিন্তু বোনকে কিংবা বেদকে কিছু বলতেন না। বরং একটা গোপন প্রশ্রয়ের ভাব পোষণ করতেন মনে মনে।

সতীশ একদিন বোনকে বললেন, 'বীণা, বেদ-এর কাছে হাজার পাঁচেক টাকা চেয়ে দেখো তো, বাড়িটার একটু সারাই-এর কাজ করতে হবে, হাতে একটাও টাকা পয়সা নেই।' বীণা শিক্ষিতা মেয়ে, চট করে বুঝে গেল, দাদা কি চায়। বেদ-এর কাছে সে একদিন টাকাটা চাইল। বেদ তো খুব খুশি। বললেন, 'বীণা মাত্র পাঁচ হাজার দরকার, দরকার হলে তোমাকে দশ হাজারও দিতে পারি-তোমার জন্য কিছু করতে পারলে নিজেকে ধন্য মনে করি আমি।'

ব্যস, এই যে বীণা জড়িয়ে পড়ল বেদ-এর ফাঁদে, তার আর বেরুবার পথ রইল না। বীণাও কোনো এক অজ্ঞাত আকর্ষণে বেদ-এর প্রতি ক্রমশ আকৃষ্ট হয়ে পড়ছিল। সে জানত, বেদ বিবাহিত, তার তিনটি ছেলেমেয়ে, তবু সে এক দুর্নিবার মোহে

আচ্ছন্ন হয়ে বেদ-এর প্রেমে পড়েছিল। বেদ-এর স্ত্রী কৃষ্ণা কিন্তু তখনো এ ব্যাপারে কিছু সন্দেহ করেনি। পাঁচ হাজার টাকা ধার দেবার পর বেদ একটু বেশি সাহসী হয়ে পড়লেন। বীণার শরীরের প্রতি তার লোভ বহুদিনের। একদিন সুযোগ বুঝে সতীশের অনুপস্থিতিতে বেদ বীণাকে কাছে টেনে আদর করতে থাকেন। বীণা আপত্তি করে না। বীণার মধ্যেও একধরনের আত্মসমর্পণের মনোভাব কাজ করছিল। ইতিমধ্যে বেদ-এর সহযোগিতায় বীণা-র পুলিশ বিভাগে টেলিফোন-অপারেটর ট্রেনিং-এর সুযোগ জুটে গেছে।

এরপর বেদ এবং বীণা প্রায়ই দৈহিকভাবে মিলিত হতে থাকে। সতীশ সেটা বুঝতে পারেন, কিন্তু পাঁচহাজার টাকা ফেরৎ দেবার ক্ষমতা তখন তার ছিল না। দুর্বলতার সুযোগগুলি নিয়ে বেদ এরপর সতীশের সামনেই সতীশেরই বাড়িতে বীণার সঙ্গে রাত কাটাতে থাকেন।

এ ব্যাপারে বদনাম তাড়াতাড়ি ছড়ায়। ঐ অঞ্চলে বেদ ও বীণা-র এই সম্পর্ক নিয়ে নানারকম মুখরোচক সংবাদ ছড়িয়ে পড়ল। বেদ-এর স্ত্রী কৃষ্ণাও শুনলেন সব। তিনি এবার স্বামীর সঙ্গে ঝগড়াঝাঁটি শুরু করলেন। অশান্তি ক্রমশ বাড়তে লাগল। বেদ স্ত্রীকে বোঝাবার চেষ্টা করলেন খুব। কিন্তু কৃষ্ণা কিছুতেই কিছু শোনেন না, তাঁর এক কথা, 'ঐ মেয়েটার সঙ্গে সব সম্পর্ক ছাড়তে হবে, সতীশের বাড়ি যাওয়া বন্ধ করতে হবে।'

বেদ-এর পক্ষে তা কখনো সম্ভব নয়। বেদ চাইছিলেন, দুই দিকই বজায় থাকুক। অবশেষে, বেদ একটা সিদ্ধান্ত নিলেন। এছাড়া তার আর কোন উপায়ও ছিল না। কৃষ্ণা ব্যাপারটা নিয়ে বাড়াবাড়ি শুরু করেছিল খুব।

২০ আগস্ট, ১৯৮৮। দুপুর সাড়ে বারোটা। ইন্দ্রপুরী থানায় একটা খবর এলো, দশধরা গ্রামে কৃষ্ণা নামের জনৈক গৃহবধূ অগ্নিদগ্ধ হয়ে রামমনোহর লোহিয়া হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। স্বামীর নাম বেদ সিংহ, মহিলাকে হাসপাতালে এনেছেন দেওর রমেশ সিংহ। পুলিশ কন্ট্রোল রুম থেকে এ খবর পেয়ে ইন্সপেকটর রাজবীর সিংহ সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে চলে গেলেন সদলবলে।

বেদ সিংহের ঘরে পুলিশ একটা পেট্রলের খালি বোতল, দেশলাই, পোড়া কাপড়চোপড় এসব আবিষ্কার করল। এস আই জোগেন্দ্র সিংহ চলে গেলেন হাসপাতালে কৃষ্ণার বয়ান নিতে। পুলিশ পাড়া-প্রতিবেশীদের জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করলেন। জানা গেল, বেদ সিংহের বাবা পাশেই থাকেন। কিন্তু কোথাও কাউকে পাওয়া গেল না। প্রতিবেশীদের জিজ্ঞাসাবাদ করে অবশ্য পুলিশ সব কথাই স্পষ্ট অনুমান করে নিল।

হাসপাতালে ডাক্তার রাজেন্দ্র সিংহের উপস্থিতিতে এস-আই· কৃষ্ণার বয়ান লিখে নিলেন, 'গত ছ'সাতমাস যাবৎ ডাঃ সতীশচন্দ্রের বোন বীণার সঙ্গে আমার স্বামী বেদ সিংহের অবৈধ সম্পর্ক শুরু হয়েছে। এই নিয়ে আমি মানসিক অশান্তিতে ভুগছিলাম। রোজ ঝগড়া করতাম, কিন্তু বীণা-র সংস্রব ত্যাগ করতে সে রাজী ছিল না।
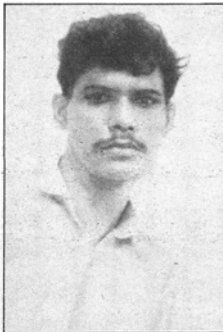
ডাঃ সতীশ চন্দ্র

ইন্সপেকটর রাজবীর সিংহ

আজ সকালে ডাঃ সতীশচন্দ্র, ওর বোন বীণা ও আমার স্বামী তিনজন আমার বাড়িতে এসে আমাকে নানাভাবে বোঝাতে শুরু করল। আমি বললাম, মেয়েটার সঙ্গে ওকে সব সম্পর্ক ত্যাগ করতেই হবে।

হঠাৎ আমার স্বামী আমাকে মারতে শুরু করলেন। আমি চেঁচিয়ে কাঁদতে শুরু করলাম। আমার বাচ্চারা তখন পাশেই শ্বশুরমশাই-র বাড়িতে ছিল। আমি চীৎকার করে কাঁদতে থাকায় আমার স্বামী ও বীণা আমাকে চেপে ধরল, আর ডাঃ সতীশ চন্দ্র একটা বোতল থেকে আমার গায়ে পেট্রল ঢেলে দিল। তারপর সে-ই আগুন ধরিয়ে দিল। আমি তখন ভয়ে প্রচণ্ড চীৎকার করছি। সতীশ ও বীণা তখন পালিয়ে গেল। আমার জ্বলন্ত অবস্থা দেখে আমার স্বামীও ভয়ে পালিয়ে গেল। আমার চীৎকারে লোকজন জড়ো হয়ে গেল, তারপর আমার আর জ্ঞান ছিল না।'

পুলিশ এই বয়ানের ভিত্তিতে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০৭/৩৪ ধারায় বেদ, সতীশ ও বীণার নামে কেস শুরু করলেন। কিন্তু অভিযুক্ত তিন জনকে পাওয়া গেল না, তারা সব ফেরার।

২১ আগস্ট সন্ধেবেলা কৃষ্ণা হাসপাতালে মারা গেলেন। পুলিশ কেসটিকে এবার খুনের কেস হিসেবে ৩০২ ধারায় নিয়ে গেল। আসামী তিনজনকে খোঁজার ব্যাপারে পুলিশ খুব সতর্ক হয়ে পড়লেন এবার। ২২ আগস্ট সকালে বেদ সিংহের এক ভাই ইন্দ্র সিং এসে থানায় খবর দিলেন, ওদের তিনজনকেই এইমাত্র কুশিকুঞ্জ বাস-স্ট্যাণ্ডে দেখা গেছে। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ ছুটল সেখানে। তখনও তিনজন সেখানে দাঁড়িয়ে। তাদেরকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে আসা হল থানায়। শুরু হল জিজ্ঞাসাবাদ।

পুলিশের জেরার মুখে পড়ে তিনজনই অপরাধ স্বীকার করতে বাধ্য হল। বেদ-সিংহ জানালেন, 'কৃষ্ণা এমন অশান্তি শুরু করেছিল যে আমার মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল। বীণার সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। ওকে আমি খুব পছন্দ করি। বীণার সঙ্গে আমার দৈহিক সম্পর্কও রয়েছে।

কৃষ্ণার ঝগড়াঝাঁটি চীৎকার চেঁচামেচিতে অতিষ্ঠ হয়ে একদিন ঠিক করলাম, ওকে শেষ করে ফেলাই ভাল। সতীশ ও বীণাও এতে সম্মতি জানাল। অবশেষে ২০ আগস্ট সকালে তিনজনে মিলে আমার বাড়িতে গেলাম। প্রথমে কৃষ্ণাকে খুব বোঝাতে চেষ্টা করলাম, সম্পর্কটা মেনে নাও, সে উল্টে চেঁচামেচি শুরু করল। সতীশ একবোতল পেট্রল এনেছিল। তাই দিয়ে ওর গায়ে আগুন ধরিয়ে আমরা সোজা চলে এলাম আন্তঃরাজ্য বাস-স্ট্যাণ্ডে। সতীশের গ্রাম উপেড়া, সেখানে পৌঁছলাম। ২১ আগস্ট রাত্রে ফিরে এলাম দিল্লি। এসে শুনলাম, পুলিশ আমাদের খুঁজছে, কৃষ্ণার মৃত্যুসংবাদও পেলাম। তখন চুপিচুপি রাতটা সতীশের বাড়িতে কাটিয়ে ভোরবেলা বাস-স্ট্যাণ্ডে চলে এলাম। উদ্দেশ্য ছিল, বাইরে কোথাও পালিয়ে যাওয়া, তার আগেই পুলিশ ধরে ফেলল···।'

২২ আগস্ট ১৯৮৮ তিশহাজারি কোর্টে মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট প্রেমশংকর কাপুরের আদালতে আসামী তিনজনকে হাজির করা হয়। ওরা এখনও জেলহাজতে।

পুষ্কর পুষ্প

শান্তিপর্ব

প্রফুল্ল রায়

॥২০॥

প্রভাকরকে নিয়ে নৌকরেরা অনেকক্ষণ আগেই স্টেশনে চলে গিয়েছিল। তাকে পাটনার গাড়িতে চড়িয়ে তবে ওরা ফিরবে।

মুকুটনাথ প্রভাকরকে টেনেহিঁচড়ে গাড়িতে তোলার ব্যাপারটা আগাগোড়া তদারক করে গেছেন। সুচারুভাবে কাজটি সম্পন্ন করে তিনি আপাতত বাড়ির ভেতর চলে এসেছেন। হয়ত কুলগুরু বশিষ্ঠনারায়ণ, রেবতী বা মহেশ্বরীর সঙ্গে এই নিয়ে নতুন করে রণকৌশল স্থির করছেন অথবা স্নানটান সেরে দুপুরের ভোজন চুকিয়ে বিশ্রাম করছেন।

হৈ চৈ শুনে সেই যে কিরণ জানালার কাছে গিয়ে গরাদে মুখ লাগিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল, এখনও হুবহু

তেমনিই দাঁড়িয়ে আছে।

নিচের ফাঁকা জায়গাটায় এখন কেউ নেই। দু-একটা নৌকর এধারে ওধারে কি যেন করছে। নতুন শিউশঙ্করজির মন্দিরেও কাউকে দেখা যাচ্ছে না। কারো সাড়াশব্দও কানে আসছে না। 'মিত্র নিকেত' প্রচণ্ড দুর্যোগের পর হঠাৎ একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেছে।

দূরে হাইওয়ের ওপর দিয়ে প্রভাকরকে তুলে নিয়ে তাদের পুরনো আমলের ফোর্ড গাড়িটা চলে গেছে। যতক্ষণ সেটা দেখা গেল উদ্‌ভ্রান্তের মত তাকিয়ে ছিল কিরণ। হাজার রকমের প্রাচীন সংস্কার দিয়ে ঘেরা 'মিত্র নিকেত' থেকে বেরুবার শেষ আশাটুকুও বিলীন হয়ে গেল তার।

হাইওয়েতে এখন প্রতিদিনের সেই দৃশ্যাবলী। সেই রয়েল আর ঠেলা গাড়ির ঝাঁক, অত্যুন্নতি সাইকেল রিকশা, ট্রাক, বাস এবং মানুষ। কিরণের জীবনে এত বড় একটা বিপর্যয় ঘটে গেল কিন্তু তার এতটুকু ছাপ পড়ে নি সেখানে। সমস্ত কিছুই আগের নিয়মে চলছে।

কতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল, খেয়াল নেই কিরণের। হঠাৎ ঝনাৎ করে আওয়াজ হওয়ায় চমকে ঘুরে দাঁড়ায় সে। ওধারের দরজার শেকল, খুলে ভেতরে ঢুকছেন রেবতী।

তিনঘণ্টা আগে মায়ের চোখেমুখে যে দুশ্চিন্তা আর টেনশান ফুটে বেরিয়েছিল এখন তার চিহ্নমাত্র নেই। এই মুহূর্তে ভাবনামুক্ত হয়ে রেবতীকে অনেকটা স্বাভাবিক মনে হচ্ছে। কোনোরকম অঘটন না ঘটিয়ে প্রভাকরকে যে ধরমপুরা থেকে বিদায় করা গেছে, এতেই তাঁর মানসিক চাপটা আর নেই।

খুব সহজ গলায় রেবতী বলেন, 'অনেক বেলা হয়ে গেছে। এবার স্নান করে খেয়ে নে।'

কিরণ লক্ষ করল, প্রভাকরের নাম বা তাকে নিয়ে 'মিত্র নিকেত'-এ এমন মারাত্মক একটা ব্যাপার যে ঘটে গেল তার উল্লেখ পর্যন্ত করলেন না রেবতী। যেন এ বাড়িতে পলকের জন্যও কোনো দুর্ঘটনা ঘটে নি, আজকের দিনটা অন্য সব দিনের মতো চিরকালের নিয়মে কেটে যাচ্ছে। কোথাও কোনও ব্যতিক্রম নেই।

কিরণ মাকে দেখতে দেখতে মনস্থির করে ফেলে। আপাতত সে কোনোরকম বিস্ফোরণ ঘটাবে না। খাওয়া দাওয়ার পর খানিকক্ষণ বিশ্রামের পর যা করার করবে। শরীরের অভ্যন্তরে প্রভাকরের যে ভ্রূণটি প্রতিদিন একটু একটু করে পুষ্ট হচ্ছে, এবার তার কথা বলার সময় হয়েছে। তার পক্ষে আর দেরি করা সম্ভব না।

পেটের এই ভ্রূণটার কথা জানানোর সঙ্গে সঙ্গে প্রতিক্রিয়া কি হতে পারে মোটামুটি আন্দাজ করে নেয় কিরণ। হয়ত শেষ পর্যন্ত 'মিত্র নিকেত' থেকে বার করে দেবেন মুকুটনাথেরা। সেটাই চায় কিরণ। যেভাবেই হোক এখান থেকে তাকে বেরুতেই হবে। প্রভাকর এ বাড়িতে থাকতে থাকতে পেটের বাচ্চাটাকে অস্ত্রের মতো কেন সে প্রয়োগ করল না ভেবে এখন আপসোস হচ্ছে কিরণের। তা হলে হয়ত প্রভাকরের সঙ্গেই তাকে গাড়িতে তুলে দিয়ে চিরকালের মতো বিদায় করতেন, মুকুটনাথেরা। আসলে প্রভাকরকে এ বাড়িতে দেখে সে এতই হকচকিয়ে গিয়েছিল যে গুছিয়ে ভাবতেই পারছিল না তার কি করা উচিত। আসলে ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করার শক্তিটাই কিছুক্ষণের জন্য হারিয়ে গিয়েছিল।

রেবতী এবার তাড়া দিলেন, 'কি রে, দাঁড়িয়ে রইলি যে। স্নান করতে যা।'

কিরণ বলে, 'হ্যাঁ, যাচ্ছি।'

মেয়েকে সহজভাবে কথা বলতে দেখে রেবতী ভাবলেন, প্রভাকরকে জোর করে তাড়িয়ে দেবার ফলটা ভালই হয়েছে। কিরণ নিশ্চয়ই মিত্র বংশের ছক-কাটা পথেই ফিরে এসেছে। তাঁদের এই অনমনীয়তা এবং নিষ্ঠুরতার খুবই প্রয়োজন ছিল। এবার থেকে কিরণ নিশ্চয়ই এমন বেয়াড়া কিছু করবে না বা ভাববে না যাতে মিত্রদের পারিবারিক সুনাম এবং মর্যাদা নষ্ট হয়।

ফিরে যাবার জন্য দরজার দিকে পা বাড়িয়েও দাঁড়িয়ে পড়লেন রেবতী। বললেন, 'যা হবার তা তো হয়েই গেছে। এবার ওসব ভুলে যাও। সবসময় নিজের বংশের সম্মানের কথা মনে রাখবে।' একটু থেমে আবার বলেন, 'ছেলেদের দুর্নাম রটলে দুদিন পরে সবাই ভুলে যায় কিন্তু মেয়েদের বদনাম হলে তার দাগ চিরকাল থেকে যায়। কথাটা ভুলো না।'

উত্তর না দিয়ে স্থির চোখে মাকে লক্ষ করতে থাকে কিরণ।

মেয়ের মুখ বুজে থাকাটা ভালই লাগে রেবতীর। তাঁর ধারণা, প্রভাকরকে জোর করে তাড়িয়ে দেওয়ার ফলে কিরণের সৃষ্টিছাড়া মতিগতি শুধরে যাবে। অন্তত এখন তাকে দেখে রেবতীর তা-ই মনে হচ্ছে। তিনি মোটামুটি খুশি হয়েই ঘরের বাইরে পা বাড়ালেন।

আর তখনই পেছন থেকে কিরণ ডাকল, 'মা—'

রেবতী ঘুরে দাঁড়ালেন, 'কি বলছিস?'

'বিকেলে দাদীর ঘরে তুমি, গুরুজি থাকবে। বাপুজিকেও থাকতে বলবে। আমিও যাব। তোমাদের সঙ্গে দরকারী কথা আছে।'

সন্দিগ্ধ চোখে কিরণকে দেখতে দেখতে রেবতী জিজ্ঞেস করলেন, 'কি কথা?'

কিরণ বলল, 'তখনই বলব।'

রেবতী চলে গেলেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঘরে ঢুকল সুষমা। তার কুটিল মুখে হিংস্র হাসি ফুটে আছে। চোখ এবং ভুরু কুঁচকে সে বলে, 'দুষ্টী কাঁহিকা। গলায় রশি দিতে পারিস নি?'

জঘন্য স্বভাবের এই হিংসুটে ইতর মেয়েটাকে পারতপক্ষে ঘাঁটায় না কিরণ। যতটা সম্ভব তাকে এড়িয়েই চলতে চায়। দু-একটা কথা যা কিরণ বলে তাতে থাকে খোশামুদি। কিরণ জানে, কারো, বিশেষ করে তার ভাল আদৌ চায় না সুষমা। উল্টে তার ক্ষতি হলে, তার বদনাম হলে, লোকের চোখে তার মর্যাদা নষ্ট হলে সুষমার মতো খুশি কেউ হবে না।

অন্য সময় কি করত, কিরণ জানে না কিন্তু এই মুহূর্তে সব রক্ত মাথায় উঠে আসে তার। অসহ্য রাগে কপালের শিরাগুলো দপ দপ করতে থাকে। নিজের অজান্তে সে চিৎকার করে ওঠে, 'গলায় রশি দেবো কেন? তোর কথায়?'

কিরণের এরকম মারমুখী চেহারা আগে আর কখনও দেখে নি সুষমা। প্রথমটা সে ভয়ানক হকচকিয়ে যায়। পরক্ষণে সামলে নিয়ে বলে, 'শরম নেই তোর? বাড়িতে দিল্লীবালা এক জানবর এসে বলে কিনা তুই তার আওরত। আমাদের মুখে কালি দিয়ে এখন আবার আঁখ গরম করছিস। কুত্তী কাঁহিকা।'

ক্রোধে উত্তেজনায় মাথা ফেটে যেন চৌচির হয়ে যাচ্ছে কিরণের। গলার স্বর কয়েক পর্দা চড়িয়ে সে বলে, 'কাকে জানবর বলছিস রে শয়তান মেয়ে। জানিস উনি একজন প্রফেসার, কত পণ্ডিত—'

মুখটা এবার বেঁকেচুরে বীভৎস দেখায় সুষমার। সে টেনে টেনে তীক্ষ্ণ গলায় বলে, 'ছোড় তেরি প্রফেসার। নালিয়ার পোকার মতো যার স্বভাব সে আবার পণ্ডিত। থুঃ থুঃ থুঃ' অসীম ঘৃণায় শব্দ করে তিন বার থুতু ফেলে সে।

শরীরের সব রক্ত টগবগ করে ফুটছে। মারাত্মক কিছু একটা ঘটিয়েই ফেলত কিরণ। তার আগেই কণ্ঠনালী থেকে আরো খানিকটা বিষ ঢেলে সুষমা, 'মর তুই, মর, মর' বলে আর দাঁড়ায় না, কোমরে ক্ষিপ্র একটা মোচড় দিয়ে বাইরে বেরিয়ে যায়।

সুষমা চলে যাবার পর অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে থাকে কিরণ। মাথাটা জুড়িয়ে এলে কোনোরকমে স্নান খাওয়া চুকিয়ে শুয়ে পড়ে। আজ সকাল থেকে যে সব উত্তেজক ব্যাপার ঘটেছে তাতে স্নায়ুগুলো টান টান হয়ে আছে। তা ছাড়া আসল বিস্ফোরণটা ঘটবে বিকেলে। এইসব কারণে ঘুম আসে না, চোখ বুজে থাকলেও ভেতরটা জ্বালা জ্বালা করতে থাকে।

শুয়ে থাকতে থাকতে চোখের পাতা কখন ভারী হয়ে এসেছিল, কিরণের খেয়াল নেই। হঠাৎ সাগিয়ার ডাক ভেসে আসে, 'দিদিজি—দিদিজি—'

চমকে চোখ মেলতেই কিরণ দেখতে পায়, কফির কাপ হাতে নিয়ে তার বিছানার কাছে দাঁড়িয়ে আছে সাগিয়া। বলে, 'কিরে, আজ এত তাড়াতাড়ি কফি নিয়ে এলি।'

'তাড়াতাড়ি কোথায়?' সাগিয়া বলে, 'ঐ দেখ সুরুয ডুবে যাচ্ছে। একটু পরেই আন্ধেরা নেমে যাবে।'

দ্রুত জানালার বাইরে তাকায় কিরণ। অনেক দূরে আকাশ যেখানে পিঠ বাঁকিয়ে পশ্চিম দিগন্তে নেমেছে সূর্যটা সেখানে স্থির দাঁড়িয়ে আছে। একটু পরেই ওটাকে আর দেখা যাবে না। এই শেষ বেলায় রোদের রং মরে গেছে। মাঠ ঘাট শস্যক্ষেত্র এবং দূরের গাছপালা ক্রমশ ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে।

বিছানা থেকে নেমে বাথরুমের দিকে যেতে যেতে কিরণ বলে, 'তুই একটু দাঁড়া, আমি মুখটা ধুয়ে আসি।'

ফিরে এসে সাগিয়ার হাত থেকে কফির কাপটা নিয়ে হালকা চুমুক দেয় কিরণ।

সাগিয়া বলে, 'তুরন্ত কফি খেয়ে নিচে যাও। দাদীজির ঘরে সবাই তোমার জন্য বসে আছে।'

কিরণ অবাক চোখে তাকায়, 'কারা বসে আছে?'

'গুরুজি, মা–জি, বড়ে সরকার আর দাদীজি।' সাগিয়া বলতে থাকে, 'মা–জি তিনবার তোমাকে নিচে যাবার জন্য খবর পাঠিয়েছেন। তুমি ঘুমোচ্ছিলে বলে ডাকিনি।'

এবার সব মনে পড়ে যায় কিরণের। দুপুরে সে নিজেই এই পারিবারিক সভার আয়োজন করতে বলেছিল রেবতীকে। আজই পেটের ভ্রূণটার ব্যাপারে চূড়ান্ত বোঝাপড়া করে নিতে চায় সে। কিরণের মুখ একটু শক্ত হয়ে ওঠে। দ্রুত কফিটা শেষ করতে থাকে সে।

সাগিয়া জিজ্ঞেস করে, 'তুমি কি এখন নিচে যাবে?'

কিরণ অন্যমনস্কর মতো বলে, 'হ্যাঁ।'

'আমি কি মা–জিকে বলে আসব?'

'দরকার নেই। আমি এখনই যাচ্ছি।'

কফি শেষ হয়ে গিয়েছিল। সাগিয়ার হাতে খালি কাপটা দিয়ে আস্তে আস্তে ঘরের বাইরে চলে আসে কিরণ। সিঁড়ি দিয়ে একতলায় নামতে নামতে টের পায় তার স্নায়ুগুলো টান টান হয়ে যাচ্ছে। সমস্ত শরীরে এক ধরনের কাঠিন্য অনুভব করে সে। যে কথা কিরণ আজ মা বাবা ঠাকুমা এবং কুলগুরুর সামনে বলতে যাচ্ছে, মিশ্র বংশের কোনো মেয়ে কোনোদিন তা উচ্চারণ করার সাহস পায় নি। কিন্তু সে নিরুপায়। ঘা খেতে খেতে একেবারে খাদের কিনারে এসে দাঁড়িয়েছে কিরণ, এবার তাকে রুখে দাঁড়াতেই হবে। অদম্য এক জেদ তার ওপর যেন ভর করতে থাকে।

মহেশ্বরীর ঘরের দরজা খোলাই ছিল। যে গতিতে সিঁড়ি ভেঙে কিরণ নেমে এসেছে, দরজার মুখে হঠাৎ সেটা থমকে যায়। সে বুঝতে পারে হৃদপিণ্ডের উত্থানপতন আচমকা কয়েকগুণ বেড়ে গেছে এবং গালে গলায় কপালে দানা দানা ঘাম জমতে শুরু করেছে। কয়েক পলক মাত্র। তারপরেই প্রবল শক্তিতে যাবতীয় স্নায়বিক দুর্বলতা এবং ভয় কাটিয়ে সে একরোখা ভঙ্গিতে ভেতরে চলে আসে। সেই প্রবল জেদটা আবার তার মধ্যে ফিরে এসেছে।

ঘরের ভেতর নিজের বিশাল খাটে যথারীতি শুয়ে আছেন মহেশ্বরী। তাঁর পায়ের দিকে ছবিতে হেলান দিয়ে রেবতীকে বসে থাকতে দেখা গেল। একটু দূরে দুটো গদি-মোড়া বিশাল সোফায় বসে আছেন বশিষ্ঠনারায়ণ এবং মুকুটনাথ।

কিরণ লক্ষ করল, সবার মধ্যেই একটা ঢিলেঢালা স্বস্তির ভাব। কারো চোখেমুখে কোনোরকম উত্তেজনা, দুশ্চিন্তা বা টেনশান নেই। প্রভাকরকে তাড়িয়ে দেবার পর এখন তাঁরা আরামই বোধ করছেন।

কিরণকে দেখে সবাই প্রায় একসঙ্গেই বলে ওঠেন, 'আয়, আয়–'

কিরণ সোজা মহেশ্বরীর কাছে গিয়ে বসে।

বশিষ্ঠনারায়ণ বলেন, 'আমাদের এখানে আসতে বলেছিস কেন? কিছু দরকার আছে?'

কিরণ আস্তে মাথা হেলিয়ে দেয়, 'হ্যাঁ।'

'কী?'

'বলছি। তার আগে আমার কয়েকটা কথা জানতে হবে।'

'কী কথা?'

সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেয় না কিরণ। কিছুক্ষণ ভাবার পর বলে, 'লোকেরা কি প্রভাকরকে ট্রেনে তুলে দিয়ে এসেছে?'

প্রভাকরের নাম, বলার সঙ্গে সঙ্গে ঘরের আবহাওয়া মুহূর্তে বদলে যায়। সবার চোখেমুখে অস্বস্তি এবং বিরক্তি ফুটে ওঠে। মেরুদণ্ড খাড়া করে মুকুটনাথ বলেন, 'হ্যাঁ। আর কোনোদিন এখানে আসার চেষ্টা করলে ছুঁচরের ছৌঁয়াটাকে জ্যান্ত মাটিতে পুঁতে ফেলব। এত বড় সাহস ওর–'

হাত তুলে মুকুটনাথকে থামাতে থামাতে বশিষ্ঠনারায়ণ বলেন, 'শান্ত হো যাও, শান্ত হো যাও। ছোকরাকে যখন ট্রেনে তুলে দেওয়া হয়েছে তখন আর রাগারাগি কেন?'

মহেশ্বরীও বিছানায় কাত হয়ে সরু দুর্বল গলায় বলেন, 'ও সব কথা এখন থাক। যা হয়ে গেছে তা টেনে আনার জরুরত নেই। যত ও নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করবি ততই ঝঞ্ঝাট বাড়বে।'

মুকুটনাথ আর কিছু বলেন না, থমথমে মুখ করে বসে থাকেন।

বশিষ্ঠনারায়ণ সস্নেহে এবার কিরণের দিকে তাকান। বলেন, 'বেটী, তোমার জরুরী কথাটা এবার বল।'

কিরণ বলে, 'আমি জানতে চাইছি, লেখাপড়া বন্ধ করে আমাকে জোর জবরদস্তি বাড়িতে আটকে রাখা হচ্ছে। এখন আমার ভবিষ্যৎ কী? কী ইচ্ছে আপনাদের? এই কয়েদখানাতেই আমাকে পচিয়ে মারতে চান?'

বশিষ্ঠনারায়ণ কোনো কারণেই উত্তেজিত বা ক্রুদ্ধ হন না। তাঁর মাথা আশ্চর্য রকমের ঠাণ্ডা। হেসে হেসে শান্ত মুখে বলেন, 'কথা শোন বেটীয়া। তোমার ওপর জোরজবরদস্তির প্রশ্নই ওঠে না। ভবিষ্যতের কথা বলছ? সেটা তো কবেই ঠিক হয়ে আছে।'

'আপনি ত্রিকূটনারায়ণজির ছেলের সঙ্গে আমার শাদির কথা বলছেন নিশ্চয়ই।'

'হ্যাঁ বেটী। ওভদিনও মোটামুটি স্থির হয়ে গেছে।'

'কিন্তু–'

'কী?'

'এত লেখাপড়া শেখার পর ঐরকম একটা অপদার্থ গাধাকে আমার বিয়ে করতে হবে?'

কিরণের কথা শেষ হতে না হতেই রেবতী চিৎকার করে ওঠেন, 'চুপ রহো বেশরম লেড়কী–' এতটা গলা চড়িয়ে তাঁকে কেউ কোনোদিন কথা বলতেই শোনে নি।

মহেশ্বরী কঙ্কালসার হাত বাড়িয়ে কিরণের মাথায় রাখতে রাখতে বলেন, 'বেটী, এমন কথা বলতে নেই। যাতার হোক, সে তোমার স্বামী–'

হিতাহিত জ্ঞানশূন্যের মতো কিরণ বলে, 'কে আমার স্বামী। আমি ঐ ইডিয়টটাকে বিয়ে করলে তো–'

মুকুটনাথের মাথার ভেতর বারুদের একটা স্তূপে যেন আগুন ধরে গিয়েছিল। প্রাণপণে নিজেকে সামলে নিয়ে তিনি বলেন, 'ইডিয়টই হোক আর গাধাই হোক, হরীশকে তোমার বিয়ে করতেই হবে। এ বিয়ে সেই ছেলেবেলা থেকে ঠিক করা আছে।'

বশিষ্ঠনারায়ণ স্বর্গীয় হাসি হেসে বলেন, 'শুধু ছেলেবেলা থেকেই না, এ তোমাদের জন্ম-জন্মান্তরের বন্ধন।' এরপর একনাগাড়ে তিনি যা বলে যান তা এইরকম। হরীশ এবং কিরণের সম্পর্ক আবহমানকালের, তা এমনই দৃঢ় আর অটুট যে কোনোদিনই ছিন্ন হবার নয়। প্রজাপতি ব্রহ্মার ইচ্ছায় এই সম্পর্ক গড়ে উঠেছে, মানুষের এতে হাত নেই। বিয়ে অনিবার্য, কারো পক্ষেই তা আটকানো সম্ভব না।

ব্রহ্মজাতীয় এই জীবটিকে টেনে একটা চড় কষাতে ইচ্ছা করছিল কিরণের। বক বক করে কতকগুলো অসার কথা গলার ভেতর থেকে সে উপরে যাচ্ছে। কিন্তু কিছুই করল না কিরণ, দাঁতে দাঁত চেপে বলল, 'আপনাদের পরিষ্কার জানিয়ে দিচ্ছি, এ বিয়ে হবে না।'

বিমূঢ়ের মতো বশিষ্ঠনারায়ণ উচ্চারণ করেন, 'হবে না।'

'না।'

'তা হলে?'

'আপনারা প্রভাকরকে ফিরিয়ে আনুন, নইলে আমাকে দিল্লী যেতে দিন। ওকে ছাড়া আর কাউকে আমার পক্ষে বিয়ে করা সম্ভব না।'

মহেশ্বরী কাঁপা গলায় বলেন, 'কি বলছিস মুন্নুয়া। ত্রিকূটনারায়ণদের কথাবার্তা পাকা হয়ে গেছে। এখন বিয়ে ভাঙতে গেলে আমাদের সম্মান থাকবে। এ বংশে এমন ঘটনা আর কখনও ঘটে নি।'

'আমার উপায় নেই দাদী। হরীশদের জানিয়ে দাও এ বিয়ে হবে না।'

মহেশ্বরী শুধোল, 'বিয়ে ভাঙার জন্য এত জেদ ধরেছিস কেন?'

ঘোরের ভেতর থেকে কিরণ বলে ওঠে, 'আমি–আমি মা হতে চলেছি দাদী।'

কিরণের কথা শেষ হতে হতেই মহেশ্বরীর ঘরে শ্মশানের স্তব্ধতা নেমে আসে।

(চলবে)

ঈগলে
আপনার টেবিলে শোভা পাবে, আসল
আন্তর্জাতিক ডিজাইনার সেটের আভিজাত্য!
এ হল ঈগলে ডিজাইনার সেটের প্রতিশ্রুতি!
আপনার ঈগল ডিজাইনার সেট দেখে কেউ যদি মনে করেন তা আমদানী করা, তাহলে আশ্চর্য্য হবেন না। কারণ, এই অপূর্ব সুন্দর সেটগুলি আসলে ইউরোপ ও আমেরিকার বিখ্যাত ডিজাইনারদেরই সৃষ্টি।
আরেকটা কথা, আপনার ঈগল সেটগুলি শুধু দেখতেই দারুণ নয়, কাজেও দারুণ! মজবুত কুনস্টফ্ বডি এগুলির ক্ষয়ক্ষতি হতে দেয় না বললেই হয়। বিশিষ্ট পলি-ইনসুলাক্স ইনসুলেশন-খাবার গন্‌গনে গরম বা কন্‌কনে ঠাণ্ডা রাখে। আর ঈগলের নিখুঁত আর্মার্ড গ্লাস রিফিল ভ্যাকুয়ামওয়্যারগুলিকে করে তুলেছে বিশ্বের অন্যতম অগ্রগণ্য!
বহু রকমারি সেট থেকে বেছে নিন আপনার মনের মত অথচ সাধ্যে কুলোয় এমন সেট কিম্বা বিভিন্ন ধরণের সেট থেকে এক একটি পিস নিয়ে তৈরী করুন আপনার একেবারে নিজস্ব সেট!
ঈগলে
ঈগলে ফ্লাস্ক. ইন্ডাস্ট্রীজ প্রা:লি:
দেখুন! কত কাজে লাগে এই ঈগলে!
ঈগলে ভ্যাকুয়ামওয়্যার, থার্মোওয়্যার, ক্রকারি ও গ্যাস লাইটার।

অপমানিতা অভিনেত্রীরা

কলকাতার স্টুডিওপাড়ায় চুক্তিভঙ্গ, বাদ পড়া, হোটেল বাস, চাবুক খাওয়া এবং জুতো মারার মত অপমানজনক আবর্তে জড়িয়ে পড়েছেন অনেক অভিনেত্রী। রূপা, দেবিকা, সঞ্চিতা, ঝুলন, সুমিত্রা মুখার্জি, রত্না ঘোষাল ও মিঠু মুখার্জির মত নায়িকাও অপমান থেকে বাদ যাননি। টলিউডের অজানা অধ্যায়ে আলোকপাত।

রূপা গাঙ্গুলী, 'গণদেবতা'র দুর্গা চরিত্র

দেবিকা মুখার্জি, অরুন্ধতী দেবীর সঙ্গে বিরোধ!

সুমিত্রা মুখার্জি, অপমানিত

গত অক্টোবরের ঘটনা। কলকাতার কাছেই নরেন্দ্রপুরে চলছে 'গণদেবতা' টি ভি সিরিয়ালের স্যুটিং। ঐ ছবির স্যুটিং–এ বাইরের লোক বা সাংবাদিকদের প্রবেশ নিষেধ। পরিচালক পি কুমার বাসুদেব সিরিয়ালটির স্যুটিং–এর শুরু থেকে নিষেধাজ্ঞা পালন করে চলেছেন। দিনটা ছিল শনিবার। অন্যান্য দিনের মতই সেদিনও ছবির অন্যতমা অভিনেত্রী দুর্গা চরিত্রের শিল্পী রূপা গাঙ্গুলী এসেছেন অভিনয় করতে। অন্যান্য দিন যেমন কাজ হয় ওইদিনও তেমনই স্যুটিং হচ্ছিল।

তবু কোথায় যেন ছন্দপতন ঘটল রূপার। হঠাৎই তিনি লক্ষ্য করলেন ইউনিটে একঘরে হওয়া বলতে যা বোঝায় তাই হয়ে গেছেন। কেউই তার সঙ্গে ঠিকমত কথা বলছে না। দুবার জিজ্ঞেস করলে জবাব পাওয়া যাচ্ছে, সাধারণ কথার। এমন কি শিল্পীরাও কেউই রূপার সঙ্গে অন্যান্য দিনের মত ব্যবহার করছেন না।

ওই দিনের অভিজ্ঞতা রূপার ভাষায়, 'হ্যাঁ ওইদিন অবাক হলেও কি ঘটতে চলেছে তা আমি বুঝতে পারিনি।'

যথারীতি সেদিন স্যুটিং শেষ হতে রূপা বাড়ি ফিরে এলেন। পরদিন সকালে চায়ের কাপে চুমুক দেওয়া মাত্র বেজে উঠল ফোন। এক বান্ধবী ফোন করেছে। রূপা ফোন ধরতেই বান্ধবীটি ওইদিনকার সংবাদপত্রে প্রকাশিত এক বিজ্ঞাপনের কথা তুললেন।

অবাক রূপা জানতে চাইলেন কি আছে বিজ্ঞাপনে। বান্ধবীর কথা শুনে রূপা তো হতবাক। পি কুমার বাসুদেব কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছেন, 'গণদেবতা' সিরিয়ালের 'দুর্গা' চরিত্রের জন্য সুন্দরী অভিনেত্রী চাই। সেই মুহূর্তে রূপার যে কি করা উচিত তা কিছুতেই ঠিক করে উঠতে পারলেন না। ওই ফোনটি নামিয়ে রাখতে না রাখতেই আবার একটি ফোন। সেটিও এক বন্ধুর। সবারই এক জিজ্ঞাসা। কেন এমন হলো? কেন প্রকাশ্যে এভাবে অপমানিতা হতে হলো রূপাকে? আর তো মাত্র চারটে সিরিয়ালের স্যুটিং বাকি, ওই চারটে পার্ট থেকে বাদ দেবার কি এমন কারণ ঘটল?

সত্যি বলতে কি রূপা নিজেও সঠিক কারণটা জানতেন না। তবু অনেক ভেবেচিন্তে উনি যে কারণ উদ্ধার করতে পেরেছিলেন, তা হলো ডেট সমস্যা।

দেবশ্রী রায়

ছবি: সমীর সিংহ রায়

প্রথমে যখন রূপা 'দুর্গা' চরিত্রের জন্য নির্বাচিত হয়েছিলেন, তখন তাঁর হাতে তেমন কোন কাজ ছিল না। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই কয়েকটি ছবি পেয়ে ব্যস্ত হয়ে গেলেন ভীষণভাবে। তবু রূপা প্রথম সুযোগ 'গণদেবতা'কেই দিচ্ছিলেন। কিন্তু 'গণদেবতা'র জন্য দেওয়া দিনগুলো মাঝে মধ্যেই নষ্ট হচ্ছিল। এভাবেই একদিন রূপা, কুমার বাসুদেবকে বলতে বাধ্য হলেন, 'এভাবে কাজ করা খুবই শক্ত। আপনারা আমার ফাঁকা ডেটগুলো নিয়ে ঠিকমত সিডিউল করুন।'

এ কথাতেই সম্ভবত কুমার বাসুদেব চটে গিয়ে কাগজে অমন বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন। কেননা ওদের সামনে তখন তিনটে রাস্তাই খোলা ছিল। এক, রূপাকে বাদ দিয়ে অন্য শিল্পী নেওয়া। দুই, চরিত্রটির মৃত্যু ঘটানো। তিন, রূপাকেই মেনে নেওয়া।

বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হওয়ার পর অজস্র আবেদন আসতে থাকে। বেশ কয়েকজনের সাক্ষাৎকারও নেন কুমার। পছন্দও হয় কয়েকজনকে। কিন্তু তীব্র সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়। শিল্পী বেঁচে থাকতে সামান্য কারণে তাকে সরিয়ে দেওয়াকে কেউই মেনে নিতে পারেনা খুশি মনে। বিশেষ করে রূপার অভিনয় যখন সকলেরই ভালো লাগছিল।

শোনা যায়, এমন কি স্পনসরদের তরফ থেকেও নাকি ওই পরিবর্তনের ব্যাপারে আপত্তি উঠেছিল। সব মিলিয়ে কুমার বাসুদেবকে পিছু হটতেই হলো।

দিলীপ পাল

সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাপস পাল

সেটি কি ভাবে ঘটল রূপার মুখ থেকেই শোনা যাক—'যেদিন বিজ্ঞাপন বেরোয় সেদিনই ইউনিটের তরফ থেকে ডেট নিয়ে আমাকে ফোন করা হয়েছিল। আমি বিজ্ঞাপন নিয়ে কোন কথা বলিনি। এরপর কুমার বাসুদেবের সঙ্গে আমার দেখা হয় নভেম্বর মাসের চার তারিখের স্যুটিং—এর সময়। আমি ওইদিন বলি, আপনি যদি কাল আমায় স্যুটিং—এ আসতে বারণ করেন আমি আসব না। কুমার সাহেবকে আমি জানিয়ে দিই ওই বিজ্ঞাপন আমার মোটেই ভাল লাগে নি। আমি যে খুব দুঃখ পেয়েছি, অপমানিত হয়েছি তাও জানিয়ে দিই। এমন কি এও বলি, আপনি যে সুন্দরী মেয়ে চাইছেন তা আমাকে বললেই পারতেন, আমিই আপনাকে

৬১ পৃষ্ঠায় দেখুন

বিশেষত্ব

তাপস পালের সময়টা এখন কিছুতেই জমছে না। অথচ ওর ছবির তালিকায় হিট্ ছবির সংখ্যা কম নেই। সত্যজিৎ রায়ের যেমন বাঁধা শিল্পী সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, তরুন মজুমদারের তেমনি তাপস পাল। তরুনবাবুই তাপসকে আবিষ্কার করেছিলেন। অথচ সেই তাপসের এখন বাঁধা কয়েকটি পরিচালকের ছবি ছাড়া অন্য পরিচালকের বিশেষ ছবি নেই। অথচ প্রসেনজিতের হাতে রয়েছে অজস্র ছবি।

কেউ কেউ বলেন, হিন্দি মার্কা বাংলা ছবির যোগ্য নায়ক প্রসেনজিৎ। নাচ বা মারামারি এ দুটো ব্যাপারেও দারুণ পারদর্শী। আর এখন ও দুটি ছাড়া ছবিই হয় না। আর তাই প্রসেনজিতের হাতে অনেক ছবি। তাপস পাল যে মারামারি কি নাচতে পারেন না তা নয়, তবে উনি যে প্রসেনজিতের মত পারেন না, সে কথা ওঁর পরম অনুরাগীও মেনে নেবেন।

সমালোচনা

ফারহা খুবই চটেছেন কোনও একটি পত্রিকার উপর। অপরাধ, ওই পত্রিকাটি নাকি ফারহা সম্পর্কে লিখেছেন ভালো-মন্দ নানা কথা। যা ফারহার একদমই পছন্দ নয়। দীপ্তি পাল প্রযোজিত 'আমার তুমি'র শেষদিনের শুটিং-এ এ নিয়ে নানা অভিযোগ

জানালেন ফারহা এক প্রবীণ সাংবাদিকের কাছে।

আসলে দারা সিং পুত্র বিন্দু'র সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার যে সব মুহূর্ত দেখেছিলেন কলকাতার কিছু সাংবাদিক, তাই লিখেছিলেন।

ফারহাই তার প্রেমিককে কলকাতায় নিয়ে এসেছিলেন, ছিলেনও একসঙ্গে, একই ঘরে। এমন কি স্টুডিওর মেকআপ রুমেও ওদের অন্তরঙ্গ অবস্থায় দেখা গেছে। দ্বিতীয়বার ফারহা যখন আবার এলেন স্যুটিং করতে তখন আর সঙ্গে বিন্দু আসেন নি। ফলে, ফারহা অবলীলায় ইয়েলো জার্নালিজিমের মুণ্ডুপাত করে গেলেন।

মেয়ের জন্য

একটা সময় ছিল যখন রত্না চট্টোপাধ্যায় প্রচণ্ড ব্যস্ত ছিলেন ছেলে প্রসেনজিৎকে নায়ক তৈরির কাজে। শুধু প্রযোজক পরিচালকদের অনুরোধ জানানোই নয়, ছেলেকে নায়ক হিসাবে যোগ্য করে তোলার পেছনেও রত্নার পরিশ্রম কম ছিল না। কালে কালে প্রসেনজিৎ হয়ে উঠলেন সবার প্রিয়। এখন আর প্রসেনজিৎ-এর কাজের জন্য কারোকে বলতে হয় না। এখন কেউ কেউ মনে করতে পারেন ভদ্রমহিলা বুঝি কর্মহীনা হয়ে পড়লেন! মোটেই—না, রত্না এখন পুত্রকে ছেড়ে কন্যাকে নিয়ে পড়েছেন। মেয়ে জয়িতা দিল্লির বাসিন্দা, সেখানেই স্বামী কন্যা নিয়ে ওঁর সুখের সংসার। রত্না এখন সবার কাছে মেয়েকে নায়িকা করার জন্য অনুরোধ জানিয়ে বলছেন, এখন আমার সব স্বপ্ন এই লক্ষ্মী মেয়েটাকে নিয়েই!

অনুরোধে কাজ হয়েছে, জয়িতা নায়িকার চরিত্র পেয়েছেন একাধিক ছবির।

খুশ মেজাজে

সত্য ব্যানার্জি, রত্না ঘোষালের বারো বছরের সম্পর্কে চিড় ধরাতে সাংস্কৃতিক জগতে উঠেছিল যথেষ্ট আলোড়ন। পত্র-পত্রিকায় রত্না মুখ খোলাতে দু'দল খুব সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। একদল বলছিল, রত্না মুখ খুলে ঠিকই করেছেন। অপরদল বলছিল, মোটেই ঠিক করেন নি। চাপান-উতরে ক'দিন আসর জমে উঠলেও আস্তে আস্তে পুরো ব্যাপারটা থিতিয়ে গিয়েছিল।

এ মুহূর্তে সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, রত্না ঘোষাল দু'জনেই আছেন বহাল তবিয়তে। বারো বছর যেখানে একে অপরকে না দেখে একদিনও কাটান নি, সেখানে দীর্ঘ কয়েকমাস ওরা পরস্পরের মুখ দর্শন না করে ভালই রয়েছেন। সত্যবাবু ব্যস্ত রয়েছেন যাত্রা নিয়ে আর রত্না ব্যস্ত নতুন কেনা ফ্ল্যাটটাকে সুন্দর করে সাজানোর কাজে।

দাদা কোণ্ডকের ব্রহ্মাস্ত্রচিন্তা!

মারাঠি ছবির প্রখ্যাত অভিনেতা দাদা কোণ্ডকের বিশেষত্বই হল ছবিতে সাঙ্কেতিক ভাষার ব্যবহার। হিন্দি ছবিতেও এই ভাষার প্রয়োগ তিনি যথেষ্ট সাফল্যের সঙ্গে করেছেন। 'আন্ধেরী রাত মে…' ইত্যাদি ছবিই তার প্রমাণ। দ্ব্যর্থক বাক্যব্যবহারের ফাঁক গলে সেন্সর বোর্ডের বাধা দিব্যি উতরে যায় ছবিগুলো। কিন্তু সম্প্রতি কিছুটা সমস্যায় পড়েছেন এহেন ধুরন্ধর দাদা কোণ্ডকেও। একদিন হঠাৎ তাঁর কাছে ফোন এসে হাজির হয় যে শিবসেনা তাঁকে আগামী সাধারণ নির্বাচনে বম্বের কোনও কেন্দ্র থেকে কংগ্রেসী প্রার্থীর বিরুদ্ধে দাঁড় করাতে চায়। এবং সেই কথা মনে রেখে তিনি যেন তাঁর আগামী হিন্দি ছবি 'খোল দে মেরি জুবান'-এ এমন কিছু বাছা বাছা দ্বি-অর্থক ডায়ালগ রাখেন যাতে সেন্সর বোর্ডও কিছু করতে পারে না অথচ বিপক্ষের কংগ্রেসী প্রার্থীকে সহজেই তুলোধোনা করা যায়। একে তো দাদা কোণ্ডকে বম্বের চলচ্চিত্র দর্শকমহলে খুবই জনপ্রিয়, তাতে যদি সাধারণ নির্বাচনের অব্যবহতি আগে ছবিটা মুক্তি পেয়ে ডায়ালগগুলো দর্শকদের মুখে মুখে ফেরে তাহলে দাদার জেতাকে আর ঠেকায় কে? দাদার কাছে এসব তো নেহাতই জলভাত, তার ওপর এই ছবিতে আবার দাদার সঙ্গে আছেন জনপ্রিয়তম হাস্যাভিনেতা মেহমুদ। কিন্তু তাঁর সামনে আসল সমস্যা যেটা দাঁড়াচ্ছে, তা হ'ল তাঁর বিপক্ষে প্রার্থী কে হবেন সে ব্যাপারে যদি কিছুটা আগাম নিশ্চিত হওয়া যায়—তাহলে ডায়ালগের ব্রহ্মাস্ত্রগুলো আরেকটু শাণিত করেই নিক্ষেপ করা যায়, যাতে প্রতিপক্ষের প্রার্থীর ধরাশায়ী হওয়াটা আরও সহজ হয়ে আসে, অতঃপর।

বিনোদ অতঃপর

বিনোদ খান্না আর অমৃতা সিংহের সাম্প্রতিক বিয়ের কথা আর লুকোছাপা নেই এতদিনে। তবে এর আগে একদিন সকালে উঠেই বিনোদ ঘনঘন অভিনন্দন বার্তা পেতে থাকে তাঁর বিভিন্ন শুভানুধ্যায়ীদের কাছ থেকে। ব্যাপারটা কি? না, অমৃতার সঙ্গে তাঁর বিয়েটা 'চুপকে চুপকে' হলেও ইতিমধ্যে তা বম্বের ফিল্মিমহলে চাউর হয়ে গেছে। আশ্চর্যের ব্যাপার বিনোদ তখন একটা ফিল্মের কাজে উটিতে। অত্যুৎসাহী কেউ কেউ নাকি বম্বে থেকে ফুলটুল নিয়ে উটিতে আসার জন্য তৈরিও হয়ে গেছেন! এই 'পঞ্জাব দী কুঁড়ি' অমৃতা সিং-কে নিয়ে বম্বের চিত্রজগতে একসময় কি সব গুজবই না রটেছে। বিষয় অমৃতা আর তরুণ ক্রিকেটার রবি শাস্ত্রীর 'গভীর প্রেম'! সেসময় তো ফিল্মি পত্রিকাগুলির গুজবনবিশেরা একরকম হুমড়ি খেয়েই পড়েছিলেন বিষয়টির ওপর। রবি আর অমৃতা বিয়ে করে ফেলল বলে! অনেক পত্রিকায় আবার তাঁদের এক অন্তরঙ্গ ফটো সেশনের ছবিটবিও ছাপা হল ঘটা করে।

এদিকে বিনোদ খান্নার সঙ্গে অমৃতা 'বাঁটওয়ারা', 'ধর্মসংকট'-এর মত ছ সাতটি ছবিতে নায়িকা হিসেবে অভিনয় করলেও এদিকটা নিয়ে ঘুণাক্ষরেও ভাবেননি কেউ। ওদিকে রবি শাস্ত্রীই ইদানীং বিদেশিনী মডেলের সঙ্গে (কেউ কেউ তো বলছেন সশরীরে নয় নিছক কাট-আউটের সঙ্গে) উদাস উদাস মুখে শুটিং সার্টিং-এর মডেল হয়ে শুটিং করে যাচ্ছেন। আর ইদানীং ভারতীয় দলেও তাঁর ভূমিকাটা খুব একটা আশাব্যঞ্জক নয়। বিনোদ, যিনি একসময় সংসার আর চলচ্চিত্রজীবনে উদাসী হয়ে রজনীশ শরণং গচ্ছামী হয়ে সন্ন্যাস নিয়ে স্বামীজি হয়ে গিয়েছিলেন, তিনি আবার ফিরে এসেছেন ফিল্ম-জীবনে, অতঃপর খল্লু সংসার-জীবনেও!

জুহি চাওলার ক্রমোন্নতি

একসময় বি আর চোপড়া যখন তাঁর টি·ভি· সিরিয়াল 'মহাভারত'-এর জন্য জুহিকে দ্রৌপদীর রোলটা দিয়েছিলেন তখন জুহি সত্যি বলতে কি একেবারে কৃতার্থ হয়ে গিয়েছিল। বইপত্তর জুটিয়ে তখন থেকেই মহাভারত সম্বন্ধে বিশেষত দ্রৌপদীর চরিত্রটি সম্বন্ধে বিশদ পড়াশুনো শুরু করে দিয়েছিল সে। অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছিল যে স্বয়ং বি আর চোপড়া পর্যন্ত তার কাছ থেকে দ্রৌপদী ও অন্যান্য চরিত্র সম্বন্ধে শলাপরামর্শ নিতে শুরু করেছিলেন। কিন্তু এরপরেই অবস্থাটা গেল বদলে। আমীর খানের সঙ্গে জুহির 'কয়ামত সে কয়ামত তক' বক্স অফিসে বিরাট সাফল্য পেয়ে গেল। জুহি সাফ চোপড়াকে জানিয়ে দিল—'মহাভারত'-টারতের জন্য আর খুব একটা সময় দিতে পারবনা আমি এরপর, আমার হাতে এখন অনেক ছবি…আসলে…কি করি বলুন তো? মানে—মানে ওই ইডিয়ট-বক্সে আর ফিরে যাচ্ছিনা বাবা, বড় পর্দায় আমার এখন স্বচ্ছন্দ বিচরণ! এদিকে 'চকলেট হিরো' নামে খ্যাত হঠাৎ নায়ক আমীর খান আর পরিচালনার সঙ্গে যুক্ত তার পরিবারের লোকজন ভাবতে শুরু করেছিলেন—জুহি হয়ত অতঃপর তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতাবশত এর পরের ছবিগুলিতে আমীর খানকেই পছন্দ করবে নায়ক হিসেবে। কিন্তু জুহি সে আশায় জল ঢেলে দিয়ে জানায়—আরে দুর, আমীর আবার আমার সঙ্গে সমা‍ান যোগাতায় অভিনয় করার মত নায়ক নাকি! জুহির ইদানীংকার পছন্দ নাকি 'প্রতিভাবান' অভিনেতা—আদিত্য পাঞ্চালী!

সাম্প্রতিক পালাবদলের পালার পর পাকিস্তান কোন ভবিষ্যতের মোহানায়? বেনজিরের অভ্যুত্থান কি একান্তই আকস্মিক না ক্রমাবর্তনের এক সুপরিকল্পিত অধ্যায়! পাকিস্তানের জনতা কোন পরিস্থিতিতে বাধ্য হলেন এই অভূতপূর্ব ইতিহাস গড়তে? পাকিস্তানের বর্তমান প্রেক্ষাপটে সেনাবাহিনী, জাতিগত প্রশ্ন আর ধর্মীয় গোঁড়ামীর বৈশিষ্ট্য আর ভূমিকা কি? একটি বিশ্লেষণী প্রতিবেদন পেশ করেছেন দীপ বসু।

বিজয়িনী বেনজির: পিতার ছবিকে পেছনে রেখে

পাকিস্তান : পালাবদলের পর

পাকিস্তানের পাঞ্জাব এলাকা থেকে সিন্ধ এলাকার পার্থক্য বোধহয় সহজেই চোখে পড়ে। রাওয়ালপিন্ডি বা ইসলামাবাদ যেখানে চণ্ডীগড় বা নতুন দিল্লির মত ছিমছাম সুপরিকল্পিত শহর, সেখানে করাচির নতুন আর পুরোনো মেলানো ছিরিছাঁদ, সেই অফিস অফিস ভাব, সরকারী জৌলুস নেই–মানুষজন অনেক বেশি স্বাভাবিক, রাখঢাকহীন। পাকিস্তানের আম জনতার বুকের স্পন্দন বা মুখের ভাষা বোঝার চেষ্টা করলে করাচির মত সফল হওয়ার নিশ্চয়তা এই গণতান্ত্রিক পালাবদলের দিনেও অন্য কোনও শহরে নেই (উত্তর পশ্চিম পাঞ্জাবের লাহোর হয়তো কিছুটা)। গ্রীক স্থপতি দোকিয়াদিসের তৈরি ইসলামাবাদ শহর-হালফ্যাশানের এ্যাভিন্যু, রমনার সিভিক সেন্টার, সিরাজ পালিকা বাজার, শালিমারের সুপার মার্কেট, টয়োটা, মার্সিদাস বেঞ্জ আর বিউটি পার্লার লাঞ্ছিত আমলা ও তস্য বিবিগনের সাজ্জা জৌলুস, ইরানের পদচ্যুত শাহ্ রেজা পহ্লবীর নাম নিয়ে শুয়ে থাকা রাস্তার 'আল-হায়াৎ' 'এশিয়া', 'পার্ক', 'মহারাজা' হোটেলের সার, গোলাপবাগ, আয়ুব–জিয়াকৎ আলি তাবৎ প্রেসিডেন্টের নামে এক একটা গার্ডেন, সশরীরে খোদ প্রেসিডেন্ট! ক্যান্টনমেন্ট, রাওয়ালপিন্ডির আর্মি মিউজিয়ামের অস্ত্রশস্ত্রের বিশালতম তথা ভীষণতম সংগ্রহ, 'শাংগ্রিলা' হোটেলের কাছ থেকে এসি ভিডিও কোচের চর্তুদিকে দৌড়োদৌড়ি, এই সব মিলিয়েও কিন্তু গত পোয়াটাক সেঞ্চুরি পার করে এসে ইসলামাবাদ বা রাওয়ালপিন্ডি পাকিস্তানের রাজনৈতিক কেন্দ্রবিন্দু সে সরকারী কাগজে কলমেই। আসলে তামাম পাকিস্তানের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট, সাংস্কৃতিক আর মানসিক বিবর্তনের হাল-হকিকৎ সনাতন করাচির বুড়ি ছুঁয়ে বোঝা ছাড়া গত্যন্তর নেই। আরব সাগরের নোনা জল উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা এই শহর–বোহরি বাজারের পোস্তা, বড়বাজার মার্কা ঘিঞ্জি সাবেকী মহল্লা, আবার ক্লিফটন–পাকিস্তানের নবাসংস্কৃতির নবাধনীগোষ্ঠীর প্রিয় সাহেবী এলাকা–সঙ্গে ডিফেন্স হাউসিং সোসাইটি–দিল্লির ডিফেন্স কলোনীর মত এই পশ্ এরিয়াও নামেই–অধিকাংশ অসামরিক ছোট বড়, মাঝারি আমলাদের ফ্ল্যাটবাড়ি–এইসবকে এড়িয়ে নারকেলডাঙ্গা, যাদবপুর, বেলেঘাটার আদলে ভারত থেকে আসা শরণার্থীদের তৃতীয় প্রজন্মের মাথা গোঁজবার ঠিকানা আজিজাবাদ, লিয়াকতাবাদ, নাজিমাবাদের রিফিউজি কলোনী সব মিলিয়ে সিন্ধ প্রদেশের রাজধানী করাচি। দেশের বৃহত্তম শিল্প আর বাণিজ্যিক বিস্তার এই শহরকে ঘিরে। মুসলিম ধর্ম যে রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় ধর্ম ঘোষিত, বিলিতি কেতার ভুট্টোসাহেব পর্যন্ত যে দেশে সাপ্তাহিক ছুটি রোববার থেকে সরিয়ে জুম্মাবারে এনে ফেললেন–সেও বেশিদিনের কথা নয়, সে দেশের সবচেয়ে বড় শহরে সেন্ট প্যাট্রিক ক্যাথেড্রাল, ট্রিনিটি চার্চ, সেন্ট এ্যান্ড্রুজ চার্চ , ওয়াই·এম·সি· এ–এধরনের একগুচ্ছ বিধর্মী প্রতিষ্ঠানের স্বচ্ছন্দ সমাবেশে মনে হওয়াই স্বাভাবিক শহরটা আর যাই হোক কুতুটেমার্কা বা কাঠমোল্লাপনার গোঁড়ামীতে চোবানো নয় আদপেই–নিতান্তই ভিলেঢালা আর স্বাভাবিক।

করাচির বিশেষত্ব অনেক কারণেই। যেমন হঠাৎ হঠাৎ দাঙ্গা। হপ্তাখানেক হপ্তাদেড়েক ধরে পুলিশ আর জঙ্গী কর্তাদের দৌড়োদৌড়ি, শহরের উত্তরে গরীব গুর্বোদের এলাকায় রাতদিনের নৈশ আইন, খুনোখুনি! একদল এসে সন্ধ্যেরাত্তিরে হামলা করে গেল তো আরেকদল মাঝরাত্তিরে ম্যাটাডোর, সুজুকি ভ্যানে চড়ে লাঠিসোটা, তলোয়ার, অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে স্লোগান দিতে দিতে অন্য এলাকায় পাল্টা হামলায় বেরুল। এইসব কালি বিল্লি মার্কা দাঙ্গার লোকজন বেশ কিছু বছর ধরেই অভ্যস্ত হয়ে গেছে। ইদানীং অসুবিধে যা হয়েছে, আফগান শরণার্থীদের দৌলতে গাদা বন্দুক, শটগানের জায়গা নিয়ে ফেলেছে কালাশনিকভ্, এ কে সাতচল্লিশ রাইফেল–ফলে দাঙ্গাও বেশ বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়িয়েছে আজকাল–সরকারী তরজুমাতেই দু-আড়াইশ লোক মারা যাওয়াটা এক একটা দাঙ্গার অবাবহিত ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। একসময় নাকি সিন্ধ এর মুখ্যমন্ত্রী মোহম্মদ আয়ুব খুহরো সাহেব

বেনজির, পাকিস্তানের নতুন আশার প্রতিচ্ছবি: করাচির রাস্তায়

ওয়াজির এ আজম সাহিবা,
কোন ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে?

বিরোধি দলনেতা
মিয়াঁ নওয়াজ শরীফ

করাচি রেলওয়ে স্টেশনে দাঁড়িয়ে থাকতেন—ভারত থেকে শরণার্থী (মুহাজির) দের করাচিতে বরণ করে আনতে। আজ অবস্থাটা পাল্টে গেছে। করাচি পাকিস্তানের সবচেয়ে বেশি উপদ্রুত শহর, অপরাধের তালিকাতে শীর্ষস্থানীয়। শহরকে ছাড়িয়ে সোহরাব গথ, সুরজানি—সর্বত্র গিজগিজ করছে মানুষ—সিন্ধি, পাঠান, পাঞ্জাবী, মোহাজির, তাদের নিরন্তর জীবনসংগ্রাম, সংঘাত, টানাপোড়েনের অর্থনৈতিক—সমাজনৈতিক ও রাজনৈতিক চালচিত্র।

অতএব এই করাচিতে মাসখানেক আগে সাধারণ নির্বাচনের একেবারে আগে আগে সামরিক বাহিনীর লোকজন যদি রাস্তায় রাস্তায় গাড়ি থামিয়ে বন্দুকের ডগায় যন্ত্রতন্ত্র সিকুরিটি চেক শুরু করে, সাংবাদিকদের আপাপাস্তলা তল্লাসিও বাদ যায়না—তাহলেও ব্যাপারটা অস্বাভাবিক মনে হয়না। কারণ এই নিরন্তর জঙ্গী ভারভারিক্কীর দেশে—যতই সামরিক উর্দি সরিয়ে শেরোয়ানি পরা দাঁড়ি গোঁফ কামানো লোকজন ইসলামাবাদের মসনদে বসুকনা কেন—টেলিপ্রিন্টারের ভাষায়—'বাট আর্মি'স প্রেজেন্স কেল্ট এভরিহোয়ার'—এর ব্যাপারটাতো কোনভাবেই উড়িয়ে দেওয়া যায়না। কিন্তু আশ্চর্য—১৫ নভেম্বর, নির্বাচনের আগের রাত থেকেই—আর্মি চেকওভারের উর্দির লোকের মধ্যে আর নেই। হাওয়ায় জোর গুজব, মোহতরিমা বেনজির সাহিবার সঙ্গে মির্জা আসলাম বেগের গুরুতর হয়ে গেছে, আর্মি ব্যারাকেই থাকবে। অতএব, দিব্যি রাস্তা জুড়ে আড্ডা চলছে—পিচিক পিচিক পানের পিক ফেলে—আ যাঁ—কা হোই? একেবারে হাসি মস্করার পরিবেশ—অতএব ক্যাসেটে গুলাম আলির জমাটি গলায় 'যাঁদে তেরিয়া সিনে নাল লাকে, জিন্দগী গুজার ছেডনী···,' বা বেঞ্জামিন বোনেদের 'না দিল দেননি বেদর্দী নু ···' রাতভোর বাজতেই থাকে—মেহদি হাসানের জনপ্রিয় গানগুলির রাজনৈতিক প্যারোডি গলিতে ঘুঁজিতে—মাথার ওপর তীর, কুড়ুল, ঘুড়ি, সাইকেলের কাট আউট—লাল, কালো, সবুজ ফেস্টুন—নস্তালিক বর্ণমালার বর্ণময় বিস্তার—জি—য়ে ভু—ট—টো, জি—য়ে মুহাজির স্লোগানের রেশ, কাঁচা হাতের অক্ষরে অশালীনপ্রতিম ব্যঙ্গ কবিতার দেওয়াল জুড়ে থাকা—'না বাপ শরীফ না মা শরীফ তু মিয়াঁ নওয়াজ শরীফ'। এইসব দৃশ্য ভারতেও দুর্লভ নয়।

ভোটের ফলাফল বেরোনোর পরে দৃশ্যান্তর। নির্বাচনের আগের ক্যাসেটের নির্বাচনী প্রচারের গানগুলো আরও তারস্বর—দোকানের মাইক্রোফোন, নুক্কড়, গাড়ি, ঘরবারান্দা থেকে। করাচীর তিনটে সান্ধ্য দৈনিক রাস্তার মোড় মোড় থেকে নিমেষে উধাও। জুলফিকর আলি ভুট্টো, বেনজির, আলতাফ হুসেনের ছবির পোস্টার—চটজলদি তৈরি ছবিওয়ালা স্পোর্টস শার্ট—এর জমজমাট বিক্রিবাটা। রাস্তা দিয়ে সুজুকি, টয়োটা, নিসানের সার—মুহাজির কৌমী মুহাজ—এর তরুণী স্বেচ্ছাসেবিকাদের দল, প্রকাশ্য রাস্তায় লাল সাদা সালোয়ার—কামিজ আর সবুজ দুপাট্টায়—পার্টির পতাকার আদলে কমণীয় হাতগুলির ওপরে তুলে ধরা—সুরেলা গলায় স্লোগান! —কিছুদিন আগে পাকিস্তানী নাট্যগোষ্ঠীর মোহতরিমা নসরিন মদিহা একেবারে ঠিক কথাই যেন বলে গিয়েছিলেন, পাকিস্তানী মেয়েরা অনেক এগিয়ে গেছে—বরং চে ভারতের মুসলমান মেয়েরাই রয়ে গেছে অনেক বেশি সনাতনপন্থী! এ থেকেই হার্ভার্ড আর অকসফোর্ডে শিক্ষিতা আপাপাস্তলা বিলাইতি শানোসৌকতে বড় হয়ে ওঠা বেনজীরও, ম্যানিকিওর করা হাত আর প্লাক করা ভুরু নিয়ে আপামর জনতার এত প্রিয় হয়ে ওঠেন। কোনও খাতুন—এর ইসলামী দুনিয়ার প্রথম প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পথে কোনও পরহেজ থাকেনা—সিতমদিবীদ কাঠমুল্লারা, সিপাসগুজার 'জমিতুল উলেমা এ পাকিস্তানী'র—মৌলানা শাহ আহমদ নুরানী, 'সরকারী' মুসলিম লীগ'—এর ইলাহী বক্স সুমরু, পীর পগারা, গফুর আহমেদ, জামাতের ছাত্রসংগঠন 'ইসলামী জামাত—তুলবা'—র ছাত্ররা যারা মেয়েরা বোরখা পরে কলেজে না গেলে অশালীন টিটকারী কাটত—সকলেই—পাকিস্তানী জনতার (তাদের অর্ধেক মহিলারাই—) সাহিবে হয়ার কমনীয়তা ছেড়ে সাহিবে হিম্মতের শক্তিশালী আঁধিতে ছত্রখান হয়ে গিয়েছে। পাকিস্তানের গত একচল্লিশ বছরের রাজনৈতিক ইতিহাসে—এবারের ঝড় মৌলবাদীদের গড়ে তোলা তাসের ঘরকে একেবারে বিধ্বস্ত করে দিয়েছে! নবাবপুরে একসময়ে জনৈকা মহিলাকে জনতার মাঝখানে প্রকাশ্য দিনের আলোয় তথাকথিত ব্যভিচারের অভিযোগে চূড়ান্তভাবে লাঞ্ছিত করা হয়েছিল—মজা দেখেছিল অজস্র মানুষ! পাকিস্তানী মেয়েদের মাথা লজ্জায় মাটিতে মিশে গিয়েছিল সেদিন। আইনী দলিলে একজন পুরুষের স্বাক্ষরকে

দুজন নারীর সমান করে দেখা, মেয়েদের টেলিভিসনে খবর পড়ার, অভিনয় করার ব্যাপারে চরম গোঁড়ামী, খেলাধুলোর জগতে মেয়েদের অংশগ্রহণকে প্রায় নিষিদ্ধ করা, এক টেলিনাটকে কোনও পুরুষ চরিত্র নায়িকাকে (বাস্তব জীবনেও ছিলেন নায়কের স্ত্রী) তিনবার তালাক–তালাক–তালাক বলায়–সেই মহিলার সঙ্গে তাঁর স্বামীর সামাজিক বিচ্ছেদ হয়ে গেছে–এই গোঁড়া সিদ্ধান্তকে আঁকড়ে থাকার হাস্যকরতা এইসবই চলচ্ছবির মত জনতার সামনে ছিল এতদিন–এখন তাঁরা টেলিভিসনের পর্দায় বেনজিরের সাহসী আর সপ্রতিভ ছবি দেখছে।

'জমাত–এ–ইসলামী' পত্রিকা 'অলকবীর'–এর পাতায় পাতায় এতদিন নসরত আর বেনজিরের কুৎসা গাওয়া হয়েছে বিচিত্রভাবে–কখনও ছবিসহ, বেনজির ছোট স্কার্টে নাচছেন, মা নসরতের হাত ধরেছেন প্রাক্তন মার্কিনী প্রেসিডেন্ট হেনরি ফোর্ড! বহুল প্রচারিত পত্রিকা 'জঙ্গ' অতটা জঙ্গী না হয়েও আগ বাড়িয়ে সদুপদেশামৃত বিতরণ করেছে–ঔরতদিগের আব্রু, ইজ্জত, পাকদামনী প্রকৃতপক্ষে বজায় থাকে চারদেওয়ালের মধ্যিখানে থেকে পাকীজগিআর জিন্দগী গুজরানের মধ্যেই। ···জামাতে ইসলামীর নামজাদা নেতৃস্থানীয় প্রফেসর গফুর আহমেদ নাকি প্রকাশ্য জনসভায় বেনজিরকে উদ্দেশ্য করে, বিভিন্ন সদুপদেশ বর্ষণের পর উত্তেজিতভাবে বলেও ফেলেছেন, 'ম্যাঁয় উস বদমাশ লড়কী কা দিমাগ ঠিক কর দুঙ্গা···।' তা পাকিস্তানী জনতার দিমাগ এবার একটু অন্যরকম ভাবেই চিন্তা করেছিল। নইলে এখন পর্যন্ত এমন দাবী কেউ করেননি যে বেনজির সায়িদুল ইস্তিগফারের দোওয়া আউড়ে দুই রাকাত নামাজ পড়ে শুদ্ধপ্রাণা হয়ে শাসনক্ষমতায় আসুন! অনেকে যদিও এখন তাঁকে ভাসা ভাসা ভাবে চাঁদা সুলতানা বা রিজিয়ার ভাবচ্ছবিতে মিলিয়ে দেখছেন–তবু তাঁর চরিত্রে কোনও বাড়াবাড়ি নেই। পাকিস্তানী ইন্টারন্যাশনাল এয়ারলাইনসের স্বচ্ছন্দ বিমান সেবিকাদের মতই শালীনতার প্রতীক হিসেবে তিনি শুধু একটা দুপাট্টা জড়িয়ে নেন। যথারীতি নামাজ অদা করেন, আজিজাবাদের ঘনবসতি মহল্লায় যখন মুহাজির নেতা আলতাফ হুসেনের সঙ্গে দেখা করতে যান আনুষ্ঠানিকভাবে, তখন স্বামী আসিফ আলি জরদারীই মার্সিডাস বেঞ্জটি চালিয়ে নিয়ে যান গলি–তস্য গলি দিয়ে। বেনজীর শান্ত বিনম্র ভাবে পাশে বসে থাকেন, আলতাফের সঙ্গে কথাবার্তার আগে পাক্ কুরআন শরীফ বিনিময় করেন–তাঁর বাড়ি থেকে বেরোনোর পথে একদা শরণার্থী পরিবারের মহিলারা ছাদের ওপর থেকে তাঁকে দেখবার জন্য ঝুঁকে থাকেন–গোলাপের পাপড়ি ছেটান গাড়ির ওপর–বেনজিরের হালকা চেহারাটি লম্বাচওড়া আসিফ জরদারীর পাশে বিনীতভাবে দাঁড়িয়ে থাকে–বেনিজির তাঁর উর্দুতে 'বিলাইতি' আঁচড়গুলো মুছে ফেলার চেষ্টা করেন। অতঃপর বাইতুল্লাহ্ শরীফে গিয়ে হজ জিয়ারত করার উদ্দেশ্যের কথাও সাধারণ্যে প্রকাশ করেন তিনি।

আসলে এটাও ঠিক, পাকিস্তানী রাজনীতিতে ধর্মকে গৌণ ভূমিকা দিয়ে জনগনের সাথে সাথ মিলিয়ে চলাটাও স্বাভাবিক নয়। এই সত্যটা বেনজির জানেন। দেশভাগের পাঁচ বছর পরে তাঁর জন্ম, অর্থাৎ স্বাধীন পাকিস্তানের নাগরিকত্ব তাঁর আজন্ম-অধিকার। অকসফোর্ডে বেনজিরের পোস্ট গ্রাজুয়েশন–এর বিষয় ছিল ইন্টারন্যাশনাল ল আর ডিপ্লোম্যাসি। পাকিস্তানের সংবিধান তাঁর ভাল করেই পড়া আছে। পাকিস্তানী সংবিধানের মুখবন্ধে স্পষ্টতই লেখা আছে :– 'Whereas sovereignty over the entire universe belongs to Allah (Almighty) alone, and the authority to be exercised by the people of Pakistan within the limits prescribed by Him is a sacred trust, whereas the Founder of Pakistan, the Qaid–Azam Mohammad Ali Jinnah, declared that Pakistan would be democratic state on Islamic principles of democracy, freedom, equality, tolerance and social justice as enunciated by Islam···'

পাকিস্তানে ধর্ম সামাজিক জীবনের একটি অপরিহার্য অঙ্গ, অতএব পাকিস্তানের রাজনৈতিক তথা সামরিক প্রেক্ষাপটে ধর্ম যে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে সে ব্যাপারে কোনও দ্বিমত থাকা সম্ভব নয়। পাকিস্তানের প্রথম প্রধান রাজনৈতিক দল মুসলিম লীগের সূত্রপাত ঘটে অবিভক্ত ভারতে, ১৯০৬ সালে। ভারতের নবাব পরিবারের কিছু রাজনীতি–উচ্চাশী মানুষ, মুসলমান জমিদারেরা, অধ্যাপনা ও আইনব্যবসার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কিছু বুদ্ধিজীবিদের ফিরিঙ্গি শাসনের বিরুদ্ধে একটি প্রতিবাদ গড়ে তোলার স্বার্থে। ১৯৪০ সালে এই দলের ম্যানিফেস্টোতে ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলমানদের জন্য একটি স্বাধীন বাসস্থান গড়ে তোলার দাবিটি যোগ হয়। জিন্না এই দাবিতে রাজনৈতিক দক্ষতার সংযোজন ঘটান। পাকিস্তান স্বাধীন দেশ হিসেবে গঠিত হওয়ার পর মুসলিম লীগ হয়ে ওঠে পাকিস্তানের একমেবদ্বিতীয়ম দল। পাকিস্তানের প্রথম প্রধানমন্ত্রী লিয়াকৎ আলি খান স্পষ্টতই

পাকিস্তানের নতুন ইতিহাস : বেনজিরকে শপথ গ্রহণ করাচ্ছেন গোলাম ইশহাক খান

বলেন–"মুসলিম লীগের চেষ্টার ফলেই পাকিস্তানের জন্ম হয়েছে। আমি যতদিন বেঁচে থাকব এদেশে অন্য কোনও দলকে রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ চালাতে দেওয়া হবে না" (সূত্র,এম·রসিদুজ্জমান। এটা ১৯৫০ সালের কথা)। ১৯৫৮ সালে প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মীর্জার ফৌজি জমানায় জেনারেল মোহম্মদ আয়ুব খান হন দেশের মুখ্য সামরিক প্রশাসক। সেই থেকে ধর্মের সঙ্গে পাকিস্তানের সামরিক স্বার্থও জড়িয়ে যায়। এসময় থেকে মুসলিম লীগের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্বও শুরু হয়। কারণ দশ বছরের শাসনে পাকিস্তানের রাজনীতিতে একটা কায়েমী স্বার্থসংশ্লিষ্ট মহল তৈরি হয়ে গেছে–রাজনীতিক ও সামরিক মহল উভয়েই। আয়ুব খানের ভাষণের যে সংকলন করাচীর "ফিরোজ সন্স" থেকে প্রকাশিত হয়েচে তাতে এই ব্যাপারটা স্পষ্ট হদিশ মেলে। ১৯৬২তে "মুসলিম লীগ" দলটি নতুন করে সংগঠিত হয় "পাকিস্তান মুসলিম লীগ" নাম নিয়ে। ১৯৬৩তে আয়ুব এই দলে যোগ দেন, এবং 'পাকিস্তান মুসলিম লীগ"–এর যে মুখ্য উদ্দেশ্যগুলি ঘোষণা করেন, তার একটি হল "দেশে ইসলামিক নিয়মকানুন ও সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা।' সে বছরই তিনি দলের সভাপতি নির্বাচিত হন। দেশের শাসনক্ষমতার উঁচুমহল, সামরিক বাহিনী, ধর্ম আর রাজনীতির সংবদ্ধ ভূমিকাটিতে অত্যন্ত ক্ষমতাসম্পন্ন হয়ে ওঠে। ১৯৬৩ সালে দলীয় প্রধান আয়ুব খান দলের নির্বাচনী ইস্তাহারের শুরুতেই যে ঘোষণাটি করেন তা হল : 'আল্লা, তাঁর অসীম করুণায় পাকিস্তানের সৃষ্টি করেছেন মুসলমানদের একটি স্বাধীন আবাসভূমি হিসেবে। পাকিস্তানী জনতা অতঃপর তাদের জীবনধারাকে নিয়ন্ত্রিত করবে ইসলামিক ধর্মীয় অনুশাসনের মৌলিক সীমাবদ্ধতায়।'

এইসময়েই পূর্ব পাকিস্তানে ধূমায়িত হতে শুরু করেছিল অসন্তোষের অগ্নিকণা। মৌলানা ভাসানির সাম্যবাদী দৃষ্টি প্রভাবিত আওয়ামী লীগ, একটা জিনিস স্পষ্ট বুঝতে পেরেছিল যে পাকিস্তানে শ্রেণী–বিভাজন শুরু হয়ে গেছে অন্যভাবে। পাকিস্তানের রাজনৈতিক শাসনক্ষমতায় তথা সামরিক বিন্যাসে একটা অত্যন্ত ক্ষমতাবান প্রিভিলেজড ক্লাস তৈরি হয়ে গেছে: তা পাঞ্জাবীদের। মুসলিম সালারিয়ৎ–এর যে ধারণা নিয়ে পাকিস্তান শুরু হয়েছিল তাতে বাঙ্গালি, সিন্ধি, পাঠান আর বালুচেরা সমানুপাতিক অংশগ্রহণ করতে পারছেনা। সিভিল ব্যুরোক্র্যাসি আর মার্শাল গুলিগার্কিতে পাঞ্জাবী সালারিয়ৎ প্রাধান্য বিস্তার করে ফেলেছে। পূর্ব পাকিস্তানে মৌলানা ভাসানি, শেখ মুজিবুর রহমান, উত্তর পশ্চিমী সীমান্ত প্রদেশে ওয়ালী খান–এর রাজনৈতিক উচ্চাশায় একটা প্রাদেশিকতার ছোঁয়া স্বভাবতই এসে যায় অতঃপর। আয়ুব খানের ভাষণে বারবার ওঠে–'এই বঞ্চনা, এই শোষণের অপবাদ নিরর্থক। পাকিস্তান প্রাদেশিকতার উর্দ্ধে সব মুসলমানের।'

সিন্ধিরা মূলতঃ ভূস্বামী ও ব্যবসায়ী গোষ্ঠী। দেশভাগের আগে হিন্দু সিন্ধিরাই দখল করে রাখত এই জাতিগোষ্ঠীর মুখ্য ক্ষমতাভিতকে। অতঃপর পাকিস্তানে সিন্ধি মুসলমানদের সংখ্যাধিক্য তাদের মধ্যে উচ্চাশা জাগায়। জুলফিকর আলি ভুট্টো এই অবস্থাটির লাভ ওঠাতে সৃষ্টি করেন 'পাকিস্তান পিপলস পার্টি' ১৯৬৭–তে। তবে পার্টির ইস্তাহারে ধর্মীয় ব্যাপারটিকে তিনিও প্রাধান্য দিয়ে রাখেন–"ইসলামে আমাদের বিশ্বাস, গণতন্ত্র আমাদের অবলম্বিত নীতি আর সমাজতন্ত্র আমাদের অর্থনীতি"–এই ঘোষণায়। ১৯৬৫ সালের নির্বাচনে সিন্ধ থেকে এক বিরাট সংখ্যক নির্দল প্রার্থীর নির্বাচিত হওয়াটা ছিল ভুট্টোর উচ্চাশার দিকদর্শক। ১৯৭০–এর সাধারণ নির্বাচন পাকিস্তানের রাজনৈতিক পরিস্থিতি-টাকে ঘোরালো করে দেয়। এর পরের ঘটনা ইতিহাস। ধর্মের সুনির্দিষ্ট

সামরিক জমানার ফলশ্রুতি : শরীয়তী আইন কানুন।
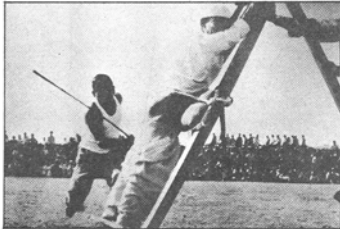
বজনতিও প্রান্তিকতার শক্তিশালী প্রভাব থেকে বলবতী হতে পারে না, পূর্ব পাকিস্তানে তা প্রমাণ হল। এই নির্বাচনে সিন্ধু–এর ২৭টি ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি আসনের মধ্যে পিপলস পার্টি একাই পেল ১৮টি আসন। পাকিস্তানের মুসলিম লীগের ভাগ্যে শূন্য। তিনজন নির্দলীয়ও নির্বাচিত হলেন। পাঞ্জাব আর সিন্ধ–এর অ্যাসেম্বলিতে পিপলস পার্টি পেল সর্বাধিক আসন। সেই থেকেই পিপলস পার্টির জয়যাত্রা আর ভুট্টোর অভ্যুদয়। বাংলাদেশ যুদ্ধ পরোক্ষভাবে ভুট্টোকে পশ্চিম পাকিস্তানে জনপ্রিয় করে। ইয়াহিয়া খানের পতন, ভুট্টোকে দেশের সর্বাধিনায়ক পদে প্রতিষ্ঠিত করে এরপর। বালুচিস্তান আর উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে–ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (খান আবদুল ওয়ালি খানের নেতৃত্বে) আর জামায়েৎ উলেমা–এ ইসলাম (১৯৬৪ পর্যন্ত নিষিদ্ধ দল)–এর সঙ্গে কোয়ালিশনের সহাবস্থান মেনে নেন ভুট্টো পিপলস পার্টির ক্ষমতা বিস্তারের স্বার্থে। কিন্তু পাকিস্তানের রাজনৈতিক ভাষ্যকারেরা একে ভুট্টোর 'বিসমার্কিজম' ছাড়া আর কিছু আখ্যা দেননি। ভাষ্যকারদের বিশ্লেষণ এটা স্পষ্ট, ক্ষমতার শীর্ষে থেকে দেশের দুই শক্তিশালী শ্রেণী সামন্তশ্রেণী আর ব্যবসায়িক শ্রেণীকে ক্ষমতার স্বাদ ও সুযোগসুবিধা দিয়ে পিপলস পার্টির পায়ের নীচের মাটি শক্ত করাটাই ছিল ভুট্টোর আসল উদ্দেশ্য। ১৯৭৩ সালে ক্ষমতার শীর্ষস্থিত ভুট্টো অত্যুৎসাহী হয়ে এই দুটি প্রদেশের নির্বাচিত সরকার ভেঙ্গে দেন, নেতাদের জেলে পাঠান। ফলে এই দুই অঞ্চলে প্রতিবাদী আন্দোলন গৃহযুদ্ধের রূপ নেয়। ভুট্টোর নির্দেশে পাকিস্তানের সামরিক বাহিনী নির্মমভাবে দমন করে সেই বিদ্রোহ। মার্কিনী মতদপুষ্ট ইরানের শাহ্ রেজা পহ্লবী ভুট্টোকে মদৎ দেন বালুচ বিদ্রোহ দমনে। ভুট্টো এভাবেই ধীরে ধীরে আবার পাকিস্তানী সামরিক ক্ষমতার প্রভাবে এসে পড়েন। পাকিস্তানী সামরিক বাহিনীর মুখ্যভূমিকায় পাঞ্জাবীদের প্রাধান্য আবার প্রকট হতে থাকে।

১৯৭৭–এ জিয়া ক্ষমতার স্বাদ পান–সামরিক বাহিনী আবার ক্ষমতার আনুষ্ঠানিক কেন্দ্রে ফিরে আসে। ভুট্টো বন্দী হন। জিয়া এসেই ভুট্টোর জারি করে যাওয়া 'হায়দ্রাবাদ ট্রাইবুনাল' তুলে দেন। বিদ্রোহী বালুচ, পাঠান, পাখতুনদের সরকারী ক্ষমা ঘোষণা করেন। কিন্তু এই অবস্থা বেশীদিন স্থায়ী হয়না। ১৯৭৯–র এপ্রিলে বিশ্ব জনমতকে উপেক্ষা করে ভুট্টোকে ফাঁসিতে ঝোলানোর পর জিয়াউল হকের সামরিক শাসনের আসল রূপ যখন প্রকট হতে থাকে, বালুচ, পাঠান নেতৃত্ব ধীরে ধীরে আবার ফিরে যায় প্রতিরোধী অবস্থানে। গঠিত হয় 'এম আর ডি', 'মুভমেন্ট ফর রেস্টোরেশন অফ ডেমোক্র্যাসি' ইন পাকিস্তান–নামের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সম্মিলিত মঞ্চ। ভাগ্যের এমন পরিহাস–ভুট্টোর প্রতিষ্ঠিত সেই পিপলস পার্টিই আবার কেঁচে গণ্ডুষ করে এই মুভমেন্টে বিনীতভাবে নিজেদের সামিল করে নেয়। পিপলস পার্টি তখন ছন্নছাড়া। ভুট্টো মৃত, স্ত্রী নসরৎ, মেয়ে বেনজির–কেউ জেলে, কেউ নির্বাসনে। পার্টি প্রায় নেতৃত্বহীন। জিয়াউল হক আবার সুযোগ বুঝে ইসলামের ধুঁয়ো তোলেন, বিস্মৃতির গহ্বর থেকে তুলে এনে প্রায় পুনরুজ্জীবন দান করেন পাকিস্তান মুসলিম লীগকে। মুসলিম লীগের অপরিচিত নেতৃত্ব মহম্মদ খান জুনেজো, মিয়াঁ নওয়াজ শরীফকে তুলে আনেন পাদপ্রদীপের আলোয়। ···পাঞ্জাবী জনতার সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দেশ গড়ে তোলার স্বার্থে মৌস মহম্মদ বিজেজোর মত নেতা গড়ে তোলেন জিয়া ও সামরিক নেতৃত্বের আশীর্বাদপুষ্ট 'সিন্ধি বালুচ–পুস্তন ফ্রন্ট'। ১৯৮৩ নাগাদ জিয়া বেনজির আর নসরৎ ভুট্টোকে বিদেশে যাবার অনুমতি দেন। এই ঘটনাই জিয়ার ভাগ্যের মোড় ফেরায়। ভুট্টোর প্রচারিত সমাজতন্ত্র আর পাকিস্তানী রাজনীতি ও সামরিকতন্ত্রে পাঞ্জাবী প্রাধান্য বিরোধী ধুয়ো তুলে ভুট্টোর এই দুই উত্তরসূরী প্রবাসী পাকিস্তানীদের মধ্যে আর আন্তর্জাতিক জনমতের কাছে পিপলস পার্টির ধোঁয়াটে ছবিটিকে আবার উজ্জ্বল করে তুলতে সক্ষম হন। ১৯৮৬র আগস্টে জিয়া আর এক বড় ভুল করেন তাঁর রাজনৈতিক দাবার চালে, বেনজিরকে দেশে ফেরার অনুমতি দিয়ে। জিয়া বোধহয় জানতেন, এর তিন বছর আগেই নিহত স্বামী বেনিনো এ্যাকুইনোর ভাবমূর্তিটিকে সম্বল করে কোরাজন এ্যাকুইনো শেষ করেছিলেন ফার্দিনান্দ মার্কোসের দীর্ঘায়িত স্বৈরতান্ত্রিক শাসন। লাহোরে বেনজিরের বিশাল জনসম্বর্ধনা জিয়াকে চকিত করেছিল ঠিকই। কিন্তু এরপর আর কিছুই করার ছিলনা। জিয়া জমানার দিলারুণ অত্যাচারী দিনগুলোর স্মৃতিকে মুছে ফেলার জন্য উদ্বেলিত আপামর জনতা দলমত জাতি নির্বিশেষে বেনজিরের পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে অতঃপর। জনমত যত বিরোধী হয়েছে ততই ব্যাপ্ত হয়েছে জিয়ার সামরিক বাহিনীর অত্যাচার, কোনঠাঁসা হয়ে জিয়া অতঃপর ফিরে গেছেন মৌলবাদের, ধর্মীয় গোঁড়ামীর আশ্রয়ে। গঠন করেছেন 'ইসলামিক কাউন্সিল অফ পাকিস্তান'। বিচারব্যবস্থায় প্রয়োগ করা হয়েছে মধ্যযুগীয় শরিয়তী আইন। এই শরিয়ৎ অকপটে ঘোষণা করে–কোনও মহিলা পাকিস্তানের শাসনক্ষমতার শীর্ষে আসতে পারবেন না!

বেনজির এখন ক্ষমতায়। পিপলস পার্টি দাবার চালে কিস্তিমাৎ করেছে। সুযোগ বুঝে,আগেই তাঁরা এম আর ডি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একলা নির্বাচনে লড়ার বলিষ্ঠ সিদ্ধান্তের ঝুঁকি নিয়েছিল। জিয়া ভুল করেন নির্বাচনী তারিখ ঘোষণায়ও, বেনজির মা হন নির্বাচনী তারিখের মাস দুই আগেই। ইতিহাসই বোধহয় প্রেসিডেন্ট জিয়াকে সরিয়ে নেয় বাহওয়ালপুরের সামরিক বিমান দুর্ঘটনায়। তার আগে জুনেজোকে প্রধানমন্ত্রীত্ব থেকে সরিয়ে বেনজিরের রাস্তা অনেকটা পরিষ্কার করে রেখেছিলেন জিয়াই। পাকিস্তানের 'মরহুম প্রেসিডেন্ট' আজ শুধু নিকটজনের স্মৃতি, বিপক্ষের ফেলে আসা দুঃস্বপ্ন! ফয়জল মসজিদের প্রাঙ্গনে প্রেসিডেন্টের বডিগার্ড–দের লাস্ট স্যালুট–"মরদে মোমিন মরদে হক/জিয়া উল হক–জিয়া উল হক" (আমাদের ধর্মবিশ্বাস আর অধিকারের পক্ষে নিরলস সংগ্রামী জিয়া উল হক।) এখন আর কেউই মনে করেনা। দেশের ওয়াজির–এ আজম ইসলামিক দুনিয়ার ইতিহাসে এই প্রথম একজন মহিলা!

তবু বেনজির কি মোড় ঘোরাতে পারবেন পাকিস্তানী রাজনীতির? সে জবাব ভবিষ্যতের। কিন্তু ইতিমধ্যেই বেনজির ও তাঁর দলের কতগুলো সিদ্ধান্ত সে আভাস দেয়নি। সামরিক বাহিনীর পরোক্ষ প্রভাবে বিরোধী দলের সাহেবজাদা ইয়াকুব খানকে আশ্চর্যজনকভাবে পুনরায় বিদেশমন্ত্রী মনোনীত করা, প্রতিরক্ষা বাজেট বৃদ্ধিতে বাধা হওয়া, বালুচিস্তানে প্রতিপক্ষ 'ইসলামিক জামুরী ইত্তেহাদ'–এর সঙ্গে কোয়ালিশন সরকার গঠনে রাজি হওয়া, জিয়া জমানার প্রতিভূ গোলাম ইশহাক খানের রাষ্ট্রপতিত্বে সমর্থন, এমনকি টিক্কা খানের মত সামরিক সুবিধাবাদীকে দলের কত্তার ক্যান্ডিডেট হিসেবে দাঁড় করানো, এই সব ঘটনাই বেনজিরের সীমাবদ্ধতাকে অঙ্গুলিনির্দেশ করেছে। কোরাজন অ্যাকুইনোর বর্তমান কি কোনও আভাস দেয়?

তবু ৪১ বছরে ইতিহাসে এই প্রথমবার পাকিস্তানের রাজনীতিতে সুস্থ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতিফলন ঘটেছে। ঘটেছে আশার প্রতিফলন। যা হয়ত প্রতিফলিত করে আধুনিক ইসলামিক দুনিয়ার প্রগতিশীলতার প্রতিভাস'টিকেই। এই ঘটনা অবশ্যম্ভাবী প্রভাব ফেলবে হয়ত প্রতিবেশী বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা আর বার্মায়ও। বেগম হাসিনা ওয়াজেদও দিল্লিতে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে এই সম্ভাবনার কথাই বলেছেন। স্বাগত জানিয়েছেন নির্বাচনপ্রার্থী সিরিমাভো বন্দরনায়েকও।

এখন আবার ফিরে আসা যাক করাচিতে। করাচিরই এক লেখিকা জাহিদা হিনার একটা গল্প পড়েছিলাম কিছুদিন আগে, 'তিতলিয়াঁ ঢুঁড়নেওয়ালী'। সামরিক জমানার মৌলবাদীতায় অত্যাচারিত, ফাঁসির সাজা পাওয়া এক মহিলার কাহিনী। জেলে যাওয়ার আগে মহিলার শিশু সন্তান তাঁকে যখন জিজ্ঞেস করে, 'আম্মী কোথায় যাচ্ছ তুমি?' মহিলা হেসে উত্তর দেন 'তিতলিয়াঁ পকড়নে বেটে'। (তোমার জন্য রঙবেরঙের প্রজাপতি খুঁজে আনতে সোনা!)। পরিপ্রেক্ষিত অন্য হলেও এই গল্পটিই মনে পড়ল আবার। পাকিস্তানের নাতি-পরিপুষ্ট রাজনৈতিক জনতার সৈদ্ধান্তিক সমর্থন বেনজিরের পেছনে এখন। আর বেনজির তাদের সামনে বিছিয়ে রেখেছেন আশা আকাঙ্খার রঙিন প্রজাপতিদের! সেই প্রজাপতি খোঁজার পালাই এক দীর্ঘায়িত অধ্যায়। ঐ গল্পের মতই।

আসলে এই উপমহাদেশের প্রতিটি দেশের মূল সমস্যা তো একই–অশিক্ষা, দারিদ্র্য, দুর্নীতি আর বিপুল জনসংখ্যাস্রোত। পাকিস্তানের নবীন নেতৃত্ব সেগুলোর সমাধানেই প্রচেষ্ট হবেন অতঃপর, এই আশা–শান্তিপ্রিয়, গণতন্ত্রপ্রেমী আর আশাবাদী রাজনৈতিক অরাজনৈতিক প্রত্যেকটি মানুষের।

২৫ পৃষ্ঠার পর

এক লম্বা কাহিনী সাহেব। যার বড় ঘরের মর্যাদার কথা বলছেন, ভাগ্য বিপর্যয় শুরু হলে ধনসম্পত্তি জমিদারী সব বৃথা।'

বাধা দিয়ে বলি, 'এখন থাক কোথায়?'

জমিলা বলল, 'কোরাগুলি-তে থাকি। সাহেব, সময় পেলে আসবো একদিন আপনার সঙ্গে দেখা করতে।'

আমার নাতিটি বললো আমাকে, 'নানাজী, একে আমাদের সঙ্গে নিয়ে চলুন না বাড়িতে, কাহিনীটা শুনতে খুব আগ্রহ হচ্ছে আমার।'

জমিলাকে বললাম, 'একটু চল না এখনই। তোমারে সব কথা শুনবো আজ।'

জমিলা আমার সঙ্গে বাড়িতে যেতে রাজি হল। আমি রাস্তায় যেতে যেতে নাতিকে জমিদার ইতিহাস যতটা পারলাম জানালাম।

সে প্রায় ২৭-২৮ বছর আগেকার ঘটনা।

একদিন সকালে থানায় পৌঁছে শুনলাম, পাশের গ্রামে একটা খুন হয়েছে। কিছু আগেই একজন এ·এস·আই জনা দুয়েক সিপাই নিয়ে ঘটনাস্থলে চলে গেছেন। সংবাদ বাহকদের একজনকে থানায় বসিয়ে রাখা হয়েছিল। আমি সেই লোকটিকে সঙ্গে নিয়ে টাঙ্গায় চড়ে ঘটনাস্থলে চলে গেলাম। ইতিমধ্যে এ·এস·আই· সহকর্মীটি মৃত ব্যক্তি সম্পর্কে কিছু তথ্য সংগ্রহ করেছেন। মৃতের নাম শাব্বীর হুসেন, কর্মকারের ছেলে, ম্যাট্রিক পর্যন্ত পড়াশোনা এবং সে শেখুপুরায় সরকারি চাকরি করত। বয়স ২৬-২৭, অবিবাহিত এবং সে ছুটিতে গ্রামের বাড়ি এসেছিল। গ্রামের বাইরে একটা কুয়োর কাছে লাশ পাওয়া যায়। তাকে মারা হয়েছে কোনো মুগুরজাতীয় বস্তু দিয়ে। সবচেয়ে বেশি আঘাত লেগেছে মাথায়, তাতেই তার মৃত্যু ঘটেছে বলে ধরা হচ্ছে। পরে পোস্টমর্টেম রিপোর্টে জানা গিয়েছিল, যে লাঠিতে শাব্বীরকে মারা হয়, তাতে লোহার টুকরো লাগানো ছিল।

আমি এ·এস·আই·কে বললাম কোনো অনুসন্ধানকারীর খোঁজ করতে। সেসময় এ ধরনের লোক পাওয়া যেত যারা কোনো চিহ্ন ইত্যাদির সাহায্যে অনুসন্ধানের কাজে ভীষণ সাহায্য করতে পারে। আমি মৃত শাব্বীরের আত্মীয় স্বজনদের জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করলাম। মৃতের বাবা বশীর হুসেন জানাল, তার ছেলে গ্রামে এসেছে তিনচারদিন হয়েছে এবং সোমবার তার ফিরে যাবার কথা ছিল। রবিবার রাত্রে খাওয়া-দাওয়া সেরে সে বেরোয় কোনো বন্ধুর সঙ্গে গল্পগুজব করতে, তারপর আর বাড়ি ফেরেনি।

প্রশ্ন করলাম, রাতে ছেলে ফিরে আসছে না দেখে খোঁজখবর নেন নি কেন? 'রাত দশটা পর্যন্ত অপেক্ষা করে শুয়ে পড়েছিলাম, আগের রাত্রেও অনেক দেরি করে ফিরে এসেছিল শাব্বীর। বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে গল্পগুজবে তো দেরি হতেই পারে। বাইরে থেকে চাবি লাগিয়ে গিয়েছিল, বলেছিল আমরা যেন ওর জন্য অপেক্ষা না করে শুয়ে পড়ি। সকালে উঠে ওর মা ছেলের বিছানা খালি দেখে আমাকে জাগায়। আমি পড়িমরি করে দৌড়ালাম ওর বন্ধু নাসিরের বাড়ি। নাসির জানাল, শাব্বীর তো রাত্রেই ফিরে গেছে বাড়িতে। তারপর আমি আরো দু'চার ঘরে খোঁজ করলাম, মসজিদে গেলাম, কোনো খবর পেলাম না। কালের বকস বলল শাব্বীরকে নাকি সে রাত্রে কারোর সঙ্গে গ্রামের বাইরে যেতে দেখেছে। কিছুক্ষণ দৌড়াদৌড়ির পর খবর পেলাম, শাব্বীর কুয়োর কাছে মরে পড়ে আছে।'

বশীরের কথা বলার মাঝখানেই বুক চাপড়াতে চাপড়াতে উচ্চস্বরে কাঁদতে কাঁদতে এসে পড়ল শাব্বীরের মা সাকিনা বিবি। বশীরও এবার কেঁদে ফেলল। আমি বললাম, 'দেখ বশীর তোমার ছেলেকে যে খুন করেছে তাকে যদি ধরতে চাও তাহলে যা যা জিজ্ঞেস করবো, একদম ঠিক ঠিক জবাব দেবে। কোনো কথা গোপন করলে চলবে না।' বশীর রাজি হয়। আমি প্রশ্ন শুরু করলাম, 'তোমার বা তোমার ছেলের সঙ্গে কারুর শত্রুতা আছে বা ছিল কখনো?'

দু'হাত আল্লার দিকে তুলে বশীর জানাল, 'না সাহেব, আমার জানা নেই।' এ·এস·আই· সাহেব এসময় একজন মাঝবয়সী অনুসন্ধানকারীকে নিয়ে এসে হাজির করলেন, লোকটি তার নাম জানাল কুব্বেশাহ। আমি তাকে বললাম, 'কুব্বেভাই, পুরো ঘটনা তো তুমি শুনেছো তোমাকে আমি একটা দায়িত্ব দেব। খুনীর পায়ের ছাপ বের করতে হবে। খুনীকে ধরতে পারলে মোটা পুরস্কার পাবে, তোমার নামও ছড়িয়ে পড়বে চারদিকে।'

হাতজোড় করে লোকটি বলল, 'সাহেব আপনি যে আমার ওপর ভরসা করে এ কাজের ভার দিয়েছেন এটাই আমার বড় পুরস্কার। এর আগে আমি কিছু চোরডাকাতের পায়ের ছাপ ধরে ধরে তাদেরকে ধরিয়ে দিতে পেরেছি, আল্লার কৃপায় এবারও পারবো আশা করি।'

কুব্বেশাহকে নিয়ে এ·এস·আই চলে গেলেন ঘটনাস্থলে। আমি কাগজপত্র তৈরি করে লাশ গরুরগাড়ি করে পোস্টমর্টেমের জন্য পাঠিয়ে দিলাম। বশীর হুসেনের বাড়ির কাছেই ছিল একটি পাকা দালান। খবর নিয়ে জানা গেল ওটি একটি জমিদার পরিবারের বাড়ি। এ·এস·আই·-কে সঙ্গে নিয়ে ওই বাড়িতে গেলাম। দরজায় ধাক্কা দিতে কুকুরের চীৎকার শোনা গেল। দু'তিন মিনিট পরে দরজা খুলল এক স্বাস্থ্যবান যুবক। বললাম, 'বাড়ির মালিকের সঙ্গে কথা বলতে চাই।'

যুবকটি চাকরকে ডাকল, কুকুরটাকে বাঁধতে বলে আমাদের ভিতরে নিয়ে গেল। একটু পরেই বৈঠকখানায় এসে ঢুকলেন বাড়ির মালিক। লম্বাটে চেহারা, পাকানো গোঁফ, বাঁ কাঁধে রিভলবার ঝোলানো, মাথায় পাগড়ি, পায়ে দামী জুতো। করমর্দন করে সেলাম জানিয়ে নাম বললেন– চৌধুরি ফজল মহম্মদ।

আমি বললাম, 'চৌধুরী সাহেব, আপনার গ্রামে কাল রাতে একটা খুন হয়েছে, সে ব্যাপারে আমি একটু এসেছি।'

চৌধুরী সাহেব নিজের ছেলেকে জিগ্যেস করলেন, 'কে খুন হয়েছে?'

যুবকটির নাম তোফেল। সে বাবাকে বললো, 'ঐ যে কর্মকারের ছেলেটা, কি নাম যেন, শাব্বীর না কি। কাল রাতে খুন হয়েছে সে।' চৌধুরী সাহেব একটু বিস্মিত হবার ভান করলেন, 'ওঃ। জানতাম না। কেউ বলেনি আমাকে।'

তোফেল জবাব দেয়, 'আজ সকালে যা জানা গেল–তাতে বলা যায়, বেশি অহংকার হলে এই অবস্থাই হয়। ছোট হয়ে বড় জিনিসের দিকে নজর!'

আমি তোফেলকে জিগ্যেস করলাম, 'কি ব্যাপার একটু খুলে বলবেন?'

তোফেল কিছু বলবার আগে চৌধুরী সাহেব ছেলেকে বাড়ির ভেতরে পাঠিয়ে দিলেন, 'যাও মালিক সাহেবের জন্য একটু সরবতের ব্যবস্থা কর।'

তোফেল চলে যেতেই আমি জিগ্যেস করলাম, 'চৌধুরী সাহেব, এই শাব্বীর ছেলেটা কেমন ছিল একটু বলবেন?

চৌধুরী সাহেব অবজ্ঞার ভঙ্গিতে বললেন, 'মালিক সাহেব, কামারের ছেলে, দু'পাতা পড়াশোনা করে একেবারে ধরাকে সরাজ্ঞান করতে শিখেছিল। বাপ লোহা পিটিয়ে বেড়াত, আর ছেলে ঘুরে বেড়াত যেন লাটসাহেব।'

আমি আবার জিগ্যেস করলাম, 'শাব্বীর ছেলেটার আচার-ব্যবহার কেমন ছিল?'

চৌধুরী ফজল মহম্মদ কোনো প্রশ্নের সোজাসুজি উত্তর দিতে চাইছেন না। আমার এ প্রশ্নের উত্তরে বললেন, 'এইসব লোহার-কামারদের আচার ব্যবহার আর কেমন হবে, আমি তো বশীরকে বলেছিলাম, ছেলেকে ওসব পড়াশোনার লাইনে নিয়ে যেও না, কিন্তু কে শোনে কার কথা।'

'আচ্ছা চৌধুরী সাহেব, ছেলেটিকে কে খুন করতে পারে বলে আপনার মনে হয়?'

চৌধুরী সাহেব বললেন, 'দেখুন, একটা কথা আপনাকে বলতে পারি। তা হল, ওকে গ্রামের কেউ খুন করেনি না, এতে বাইরের লোকের হাত আছে।'

এ·এস·আই·-কে নিয়ে আমি উঠতে যাচ্ছি, এমন সময় একজন যুবক, চাকরই হবে বোধহয়–ট্রেতে করে দু'গ্লাস লস্যি নিয়ে এল। আমার মন মেজাজ খারাপ হয়ে গিয়েছিল এদের ব্যবহারে। চৌধুরী সাহেব বললেন, 'দাঁড়ান দাঁড়ান মালিক সাহেব, লস্যিটা খেয়ে নিন অন্তত।'

আমি বললাম, 'না তার আর দরকার নেই।' –বলে উঠে পড়লাম।

গেটের বাইরে পৌঁছতেই দেখি, এক যুবক ঘোড়ায় চড়ে বাড়ির দরজায় এসে নামল। সারা গায়ে ধুলোভর্তি, পোশাকও বেশ নোংরা। ওকে চৌধুরী সাহেবের ছেলে বলে মনে হল, কেননা ওর চেহারা খানিকটা তোফেলের মতই। যুবকটি ঘোড়া

থেকে নেমে আমাদেরকে যেন এড়িয়ে গিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে যাবার চেষ্টা করল। তার আগেই আমি তার সামনে গিয়ে নিজের পরিচয় দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনি কি চৌধুরী ফজল মহম্মদের ছেলে?' সে বলল, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, নাম চৌধুরী মুজাফফর আহম্মদ, কি ব্যাপার?' আমি জানালাম, 'একটা খুন হয়ে গেছে আপনার গ্রামে।'

ছেলেটিকে বিব্রত মনে হল একথা শুনে। সে বলল, 'ওঃ, তাই নাকি? আমি কাল শহরে গিয়েছিলাম, এখন ফিরছি। কে খুন হল?'

'শাব্বীর হুসেন।'

দ্রুত উত্তর দিল ছেলেটি, 'আচ্ছা, আচ্ছা। ঐ যে কামারদের ছেলেটা। কিন্তু ওকে কে খুন করলো?'

উত্তর দিলাম, 'সেটাই বের করতে চেষ্টা করছি আমরা।'

যুবকটি এবার ইতস্তত করে বলল, 'মালিক সাহেব, তাহলে দয়া করে আমাদের বাড়িতে দুপুরের খাবারটা খেয়ে যান, প্রথমবার এলেন বাড়িতে—না করবেন না।' বললাম, 'দেখুন, কথা দিতে পারছি না। কাজ শেষ হলে আমাদের এখনই চলে যেতে হবে।'

এরপর আমার প্রয়োজন নাসির আলিকে। রাত্রে শাব্বীর ওর কাছেই গিয়েছিল। নাসিরকে পেয়ে গেলাম বশীরের বাড়িতেই। ওকে বেশ দুঃখী দেখাচ্ছিল। নাসিরকে আলাদা ডেকে জিগ্যেস করলাম, 'শাব্বীর আপনার কাছ থেকে ঠিক ক'টার সময় বিদায় নেয়?'

নাসির বলল, 'আমার কাছে ঘড়ি থাকে না, তবে অনেক রাত হয়েছিল। সকলে ঘুমিয়ে পড়েছিল তখন।'

'সে সময় আর কারা ছিল আপনাদের সঙ্গে?'

'দুজন বন্ধু ছিল আরো, তবে তারা আগেই চলে গিয়েছিল।'

'আপনি কি শাব্বীরকে একটু এগিয়ে দিয়েছিলেন?'

'বেশি দূর যাইনি। কয়েকপা এগিয়ে ফিরে এসেছিলাম।'

এবার আমি একটু কড়া গলায় বললাম, 'নাসির, আপনি শেষ ব্যক্তি যে শাব্বীরকে জীবিত দেখেছে, প্রত্যেকটি কথা সত্যি না বললে বিপদে পড়বেন বলে দিলাম।'

হাতজোড় করে নাসির বলল, 'শাব্বীর ছিল আমার প্রাণের বন্ধু। কেন মিথ্যে কথা বলবো সাহেব? আমরা পরস্পরকে খুব পছন্দ করতাম।'

জিগ্যেস করলাম, 'আপনাদের কখনো ঝগড়াঝাঁটি হয়নি?'

নাসির জবাব দিল, 'সে তো বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে মাঝে মাঝে হয়েই থাকে। আবার ঠিক হয়ে যায়। চাকরি পাওয়ার পর আমাদের আর সেরকম দেখাটেখা হত না, মাসে দু'চারদিনের জন্য ও আসতো।'

'আচ্ছা নাসির, শাব্বীরের কাছে টাকাপয়সা কত ছিল সেসময় বলতে পারেন?'

'না সাহেব। আমি টাকাপয়সা ওকে বের করতে দেখিনি, তবে হাতে ঘড়ি ছিল।' এ·এস·আই· নাসিরকে প্রশ্ন করলেন, 'আপনাদের গ্রামে শাব্বীর হুসেন নামে আর ক'জন লোক আছে?'

নাসির একটু ভেবে বলল, 'আরো দু'তিনজন। আমাদের ঘরের পিছনেই থাকে একজন।'

এ·এস·আই আমাকে একটু তফাতে ডেকে নিয়ে গিয়ে বললেন, 'একটা জিনিস লক্ষ্য করেছেন মালিক সাহেব? গেটের কাছে আপনি যখন চৌধুরী মুজাফফরকে বললেন যে শাব্বীর হুসেন খুন হয়েছে, ও কিন্তু জিজ্ঞেস করেনি কোন শাব্বীর।

নাসির যে বাড়িটার কথা বলল, সেটা আমাদের একটু আগের পরিচিত চৌধুরী ফজল মহম্মদের পাকা দালানবাড়িটা। নাসিরকে জানালাম সেকথা। তাতে সে যা বললো, তা শুনে আমার কৌতূহল বেড়ে গেল। নাসির বলল, 'চৌধুরী ফজল মহম্মদ হচ্ছে চৌধুরী ফৈজ মহম্মদের ছোট ভাই। বাড়িটার দুটো পৃথক অংশ আছে। দু'ভাইয়ের আলাদা সংসার। জমিলা তার বাবার একমাত্র মেয়ে।'
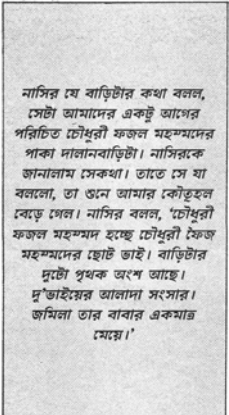
ধরেই নিয়েছে যে শাব্বীর লোহার—কি করে এটা আন্দাজ করলো?'

আমি এ·এস·আই·কে বললাম, 'চমৎকার ধরেছেন তো। আমার মাথায় তো এটা আসেনি। তাহলে চৌধুরী মুজাফফরকে সন্দেহের বাইরে রাখা যাচ্ছে না।' এবার নাসিরের কাছে এসে জিগ্যেস করলাম, 'আচ্ছা নাসির, আপনি বলছেন শাব্বীরের হাতে ঘড়ি ছিল, কিন্তু লাশের কাছে তো ঘড়ি পাওয়া যায়নি!'

নাসির বলল, 'সেটা আমি কি বলবো বলুন মালিক সাহেব, আল্লা জানেন।'

এবার একটা মোক্ষম প্রশ্ন করলাম, 'নাসির, আপনি কি জানেন—শাব্বীর গ্রামের কোনো মেয়ের প্রেমে পড়েছিল কি না?'

নাসির একটু চমকে ওঠে, একটু থেমে ধীরে ধীরে বলে, 'সাহেব, এ ব্যাপারে শাব্বীর আমাকে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছিল কাউকে কিছু না বলতে।'

'ওসব ছাড়ুন—বন্ধু খুন হয়েছে, খুনীকে ধরতে গেলে এসমস্ত আমাদের জানতে হবে, মেয়েটার নাম বলুন।'

ইতস্তত করে শাব্বীর বলল, 'ঠিক আছে আমি বলছি, কিন্তু দয়া করে কথা দিন যে মেয়ের বাড়িতে কখনো বলবেন না যে আমি একথা বলেছি।'

ওকে অভয় দিলাম। বললাম, 'কোনো ভয় নেই তোমার।'

নাসির আস্তে আস্তে বলল, 'মেয়েটির নাম জমিলা। চৌধুরী ফৈজ মহম্মদের মেয়ে।'

আমি জিগ্যেস করলাম, 'চৌধুরী ফৈজ মুহম্মদ কোথায় থাকেন?'

নাসির যে বাড়িটার কথা বলল, সেটা আমাদের একটু আগের পরিচিত চৌধুরী ফজল মহম্মদের পাকা দালানবাড়িটা। নাসিরকে জানালাম সেকথা। তাতে সে যা বললো, তা শুনে আমার কৌতূহল বেড়ে গেল। নাসির বলল, 'চৌধুরী ফজল মহম্মদ হচ্ছে চৌধুরী ফৈজ মহম্মদের ছোট ভাই। বাড়িটার দুটো পৃথক অংশ আছে। দু'ভাইয়ের আলাদা সংসার। জমিলা তার বাবার একমাত্র মেয়ে।'

আমি স্বগতোক্তি করলাম, যাক একটা সূত্র পাওয়া গেল। নাসিরকে প্রশ্ন করলাম, 'জমিলাও কি শাব্বীরকে ভালবাসত, নাকি একতরফাই ছিল পুরো ব্যাপারটা?'

নাসির বলল, 'জমিলার কথাতেই তো শাব্বীর ম্যাট্রিকটা পাশ করেছিল। জমিলার ইচ্ছা ছিল শাব্বীর আরো পড়াশোনা করুক। জমিলা ওকে বলছিল, শাব্বীর যদি ওকে বিয়ে করতে চায় তবে তাকে ভালো চাকরি করতে হবে। শাব্বীরকে সে কয়েকটা চিঠিও লিখেছিল।'

আমি জিগ্যেস করলাম, 'জমিলার বাড়ির লোক এসব জানতো?'

নাসির দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'জেনে ফেলেছিল বলেই তো তাড়াতাড়ি বিয়ে দিয়ে দিল মেয়েটার।'

এবার চমকে ওঠার পালা আমার। বললাম, 'সে কি? কতদিন আগে?'

নাসির বলল, 'এই তো, দশ বারো দিন হল বোধহয়। পাশের গ্রামে এক চৌধুরী পরিবারের ছেলের সঙ্গে বিয়ে হয়েছে।'

আমি গ্রামের কিছু লোকজনের সঙ্গে শাব্বীরের এই প্রেমপর্ব নিয়ে কথাবার্তা বলতে চাইলাম, কিন্তু এ ব্যাপারে কেউ মুখ খুলতে চাইল না। দু'এক জন অবশ্য নাসির আলি যা বলেছিল, তাই বলল।

চৌধুরী ফৈজ মহম্মদের একমাত্র সন্তান ছিল জমিলা। আর, চৌধুরী ফজল মহম্মদের তিন ছেলে, তিন মেয়ে দু'জনের বিয়ে হয়ে গেছে, এক মেয়ে বাকি। ছেলেদের এখনো বিয়ে হয়নি। জমিলার যে গ্রামে বিয়ে হয়েছে, সেই গ্রামটার নাম নরখানা। স্বামীর নামও জানা গেল—বাহাদুর

আলি।

আলি বশীরকে ডেকে ধমক দিলাম, 'ছেলের সঙ্গে যে মহিলার ভালবাসা ছিল একথা লুকিয়ে রেখেছিলে কেন?'

হাতজোড় করে বশীর বলল, 'হুজুর তাতে চৌধুরীরা আমার ওপর রেগে যেতে পারে, ওদের পরিবারের ইজ্জতের ব্যাপার কিনা। আর এই গ্রামে চৌধুরীদের বিরুদ্ধে কিছু বলে আমাদের মত দুর্বল মানুষেরা বাসই করতে পারবে না।'

বশীরকে বললাম, 'তুমি চৌধুরীদের সম্পর্কে কথা বলতে ভয় পাচ্ছ আর তোমার ছেলে তাদের বাড়ির মেয়েকে বিয়ে করতে চেয়েছিল, ছেলেকে বোঝাতে পারনি?'

অনেক বুঝিয়েছিলাম হুজুর। আমার কথা শুনলে ওর কি এই অবস্থা হত? আমার কপালে কি এই দুঃখ থাকতো সাহেব?'

'বশীর, তুমি কি বলতে চাইছ? তার মানে চৌধুরীরাই শাব্বীরকে খুন করিয়েছে?' চমকে উঠে বশীর বলল, 'তোবা, তোবা। এমন কথা আমি মুখে আনতে পারবো না।' আমি বললাম, 'তুমি সেটাই বলতে চাইছ। মুখে না বললেও–সেটাই সত্যি বশীর। অন্তত আমি সেটাই বুঝতে পারছি।'

এরপর গেলাম চৌধুরী ফৈজ মহম্মদের বাড়ি। সেই পাকা দালান বাড়িটারই অন্যগলিতে তার দরজা। দরজায় ধাক্কা দিতেই ৬০-৬৫ বছর বয়সের এক সাদা দাড়িওলা বৃদ্ধ দরজা খুললেন।

আমি যথাযথ বিনয়ের সঙ্গে বললাম, 'শাব্বীর হুসেন খুন হয়েছে জানেন নিশ্চয়ই। এ ব্যাপারে তদন্তের কাজে ঘুরে বেড়াচ্ছি। একটু আগে আপনার ছোট ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করেছি, ভাবলাম আপনার সঙ্গেও দেখা করে যাই।'

ফৈজ সাহেব চাকরকে ডাকলেন, কিছু ইঙ্গিত করে তারপর জিগ্যেস করলেন, 'কে খুন করেছে কিছু বোঝা গেল?'

'এখনো পর্যন্ত কিছু বুঝতে পারছি না। তবে আপনারা সাহায্য করলে খুনীকে খুব তাড়াতাড়ি ধরতে পারবো আশা করি। শাব্বীর ছেলেটা সম্পর্কে আপনার কি ধারণা?'

'মালিক সাহেব, ওর সঙ্গে আমার সম্পর্ক ছিল না, তবে মনে হয় ছেলেটা একটু বোকাই ছিল।'

ফৈজ মহম্মদের এই কথাটা শোনার পর আমি সসংকোচে বললাম, 'ফৈজ সাহেব, কিছু মনে করবেন না, আমি একটা উড়ো খবর শুনছি–শাব্বীর নাকি আপনার জামাই হতে চেয়েছিল?'

চৌধুরী ফৈজ মহম্মদ এ কথায় একটু থমকে গেলেন, বললেন, 'এ জন্যই বলছিলাম, ছেলেটা বেশ বোকা ছিল। দেখুন মালিকসাহেব, আমি সেরকম লোক নই। আমি কোনো ভালোলোককে তার পেশার জন্য নীচ ভাবতে শিখিনি। কিন্তু বিয়ে থা'র ব্যাপারে অনেক কিছু মাথায় রাখতে হয়। আজকালকার ছেলেছোকরাগুলো ফিল্মটিল্ম দেখে কি যে ভাবতে শুরু করেছে–'

আমি চৌধুরী সাহেবকে বাধা দিয়ে বললাম, 'শাব্বীরকে কে খুন করতে পারে বলে আপনার ধারণা?'

'মালিক সাহেব, একটা কথা আপনাকে বলতে পারি। এব্যাপারে আমি কোনোভাবেই জড়িত নই। আল্লা জানেন, এ কাজ কে করলো।'

ফৈজ মহম্মদের বাড়ি থেকে বেরুতেই মুজাফফর আহমদের সঙ্গে দেখা। সে আমাদেরকে খেতে যাবার জন্য ডাকতে আসছিল। ওর সঙ্গে যেতে হল। খুব আপ্যায়ন করে প্রচুর খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। আমি কথায় কথায় এই পরিবারের আরো কিছু তথ্য জানতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু ঠিক সফল হলাম না। শুধু এটুকু জানতে পারলাম–বড় ভাই মুজাফফর আহমদ জমিলাকে বিয়ে করতে চেয়েছিল, কিন্তু চৌধুরী ফৈজ মহম্মদ রাজি হননি।

খাওয়া দাওয়া শেষ হতেই এক সিপাহী এসে খবর দিল আমায়, কুব্বেশাহ আমার জন্য অপেক্ষা করছে, খুনীর পায়ের ছাপ সে পেয়েছে। আমি জিগ্যেস করলাম তাকে একপাশে ডেকে, 'কোথায়?'

সিপাহীটি জবাব দিল, 'এখান থেকে আড়াই তিন মাইল দূরের একটা গ্রাম অবধি সেই পায়ের ছাপ গেছে, গ্রামটার নাম দরখানা।' গ্রামটার নাম শুনে চমকে উঠলাম, এ তো জমিলার শ্বশুরবাড়ি। টাঙ্গা নিয়ে সদলবলে দারখানা চলে গেলাম। কুব্বে-শাহ একটা মিষ্টির দোকানে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল। আমাদের দেখে সে তার সামনে রাখা গ্লাসভর্তি দুধটা একনিশ্বাসে খেয়ে নিয়ে বললো, 'হুজুর, পায়ের ছাপ এক চৌধুরী বাড়ি অবধি গেছে। আমি আপনার আসার আগে খোঁজ খবর নিয়েছি, ওটা চৌধুরী আজমৎ আলির বাড়ি, ওর ছেলের নাম হচ্ছে বাহাদুর আলি।'

আমি বললাম, 'এক বাহাদুর আলির নাম আমি আজই শুনেছি, কিছুদিন আগে যার বিয়ে হয়েছে চৌধুরী ফৈজ মহম্মদের মেয়ে জমিলার সঙ্গে, একি সেই লোক?'

'হ্যাঁ সাহেব।'

আমি বাড়িটার সামনে গিয়ে কুব্বেশাহকে ফের জিগ্যেস করলাম, 'দেখ কুব্বেশাহ তুমি ভুল করছ না তো?'

'না সাহেব, চট করে আমার ভুল হয় না। খুনীর পায়ে ছিল ক্যাম্বিসের জুতো। পথে কয়েক জায়গায় পায়ের ছাপ খুব স্পষ্ট, সব আমি পাতা দিয়ে ঢেকে রেখেছি। আপনি এ বাড়ির সব পুরুষদের জুতোগুলো চেয়ে নিন। আমি আপনাকে খুনীর জুতোটা দেখিয়ে দেব, তারপর পায়ের ছাপের সঙ্গে মিলিয়েও দেখাব আপনাকে।'

দরজায় আওয়াজ করতে এক বৃদ্ধা ঝি বেরিয়ে এল। আমাদের দেখেই সে দ্রুত ঢুকে গেল ঘরের মধ্যে, এরপর এল একটি ছেলে। আমি বললাম, 'আমরা একটা তদন্তের কাজে এসেছি। চৌধুরী আজমৎ আলি কিংবা বাহাদুর আলির সঙ্গে কথা বলতে চাই।'

পেছন থেকে একটি মহিলাকণ্ঠ শোনা গেল, 'মুনীর, দারোগাবাবুকে ভেতরে আসতে বলো।' ছেলেটি আমাদেরকে বৈঠকখানায় নিয়ে গিয়ে বসাল এবং বাহাদুর আলিকে ডাকবার জন্য বেরিয়ে যাবার চেষ্টা করতেই আমি ওর সঙ্গে একজন সিপাহীকে পাঠিয়ে দিলাম। কয়েক মিনিট পর হঠাৎ বৈঠকখানায় এসে হাজির হল এক বৃদ্ধা এবং এক যুবতী। যুবতী বেশ সুন্দরী। মাথার চুল, চোখ আর গায়ের রঙ–সব মিলিয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করার মতো। মেয়েটির পরনে বিয়ের রেশমী জোড়া। সে জিগ্যেস করলো, 'কি ব্যাপারে এসেছেন আপনারা?'

আমি মেয়েটির নাম এবং পরিচয় জিগ্যেস করে নিলাম। আমার ধারণাই ঠিক, এই মেয়েটিই হচ্ছে চৌধুরী ফৈজ মহম্মদের মেয়ে জমিলা। যাইহোক বললাম, 'তোমাদের গ্রামে একটি ছেলে খুন হয়েছে জমিলা। জমিলার মুখেচোখে সামান্য ফ্যাকাসে রঙ দেখা দিল, কিন্তু পরক্ষণেই সেটা সামলে নিল সে। বলল, 'আল্লাহ মঙ্গল করুন, কে খুন হয়েছে?'

জমিলার চোখে চোখ রেখে গম্ভীর গলায় বললাম, 'ছেলেটির নাম শাব্বীর হুসেন। গতরাত্রে ওকে কেউ খুন করে পালিয়ে গেছে।'

মেয়েটি ভিতরে ভিতরে ঘাবড়ে গেলেও বাইরে তাকে বেশ স্থির দেখাল। বলল, 'শাব্বীর হুসেনের সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। আপনারা এখানে এসেছেন কিজন্য?'

জিগ্যেস করলাম, 'তুমি শাব্বীর হুসেনকে চিনতে?'

দৃঢ় গলায় জমিলা বলল, 'না, আমি কোন শাব্বীর হুসেনকে চিনি না।'

ওর শাশুড়ি বললেন, 'আপনি আমার বৌমাকে এসব কথা জিগ্যেস করছেন কেন?'

আমি বৃদ্ধাকে বললাম, 'আম্মাজী, খুনীর পায়ের ছাপ এবাড়িতে এসে পৌঁছেছে। আমাদের বিশ্বাস, খুনী এবাড়িতেই লুকিয়ে আছে। আপনি অনুমতি দিলে তাকে খুঁজে বের করতে পারি।'

বৃদ্ধা বললেন, 'কি কাণ্ড। খুনী আমাদের বাড়িতে লুকিয়ে আছে, আমরাই জানি না।'

জমিলা বলল, 'এ বাড়িতে কোন খুনী টুনী নেই, স্বচ্ছন্দে তলাশী করতে পারেন।'

এভাবে সহজেই তল্লাশীর অনুমতি পেয়ে যাওয়াতে একটু অবাক হলাম। বৃদ্ধা বললেন, 'দাঁড়াও মা। কোন পুরুষমানুষকে অন্তত আসতে দাও।'

জমিলা বলল, 'কিচ্ছু দরকার নেই। আমাদের বাড়িতে কোন চোর গুণ্ডা নেই। আসুন দারোগা সাহেব, তল্লাশী করে নিন।'

আমি এ·এস·আই· এবং কুব্বেশাহকে সঙ্গে নিয়ে একটা একটা করে ঘরগুলো দেখতে লাগলাম। ১৫-২০ মিনিট পর আমরা জমিলার পেছনে পেছনে একটা ঘুপচি মত ঘরে ঢুকলাম,

ভাঁড়ার ঘর সেটা। সেই ঘরে একটা লোহার বাকসের পাশে একটা কাপড়ের পোঁটলা পড়ে ছিল। কুব্বেশাহ ওটাকে বাইরে এনে খুলে ফেলল, তার থেকে বেরিয়ে এল একজোড়া সাদা ক্যাম্বিসের জুতো। কুব্বেশাহ বললো, 'হুজুর, এই সেই জুতো। দেখুন, দেখুন এতে রক্তও লেগে আছে, আবছা দাগ, দেখতে পাচ্ছেন?'

জমিলা বলে ওঠে, 'কি বলতে চাইছেন? এ জুতো তো আমার স্বামীর!'

কুব্বেশাহ বলল, এই জুতোর দাগ খুনের জায়গা থেকে শুরু হয়ে আপনার বাড়িতে এসে পৌঁছেছে।'

এবার আমি পোঁটলাটা ভাল করে দেখলাম, ওতে সবুজ রঙের একপ্রস্থ পোশাকও পাওয়া গেল, সেগুলোতেও রক্তের দাগ পাওয়া গেল।

'এই কাপড়চোপড়গুলো কার?' আমি প্রশ্ন করলাম।

দরজার কাছে দাঁড়িয়েছিলেন জমিলার শাশুড়ি। বললেন, 'বাহাদুর আলির।'

এ·এস·আই· হঠাৎ ঘরের কোণ থেকে একটা লাঠি আবিষ্কার করলেন, সেটার একটা প্রান্ত লোহায় মোড়া, সেখানেও রক্তের দাগ। খুব ভালো করে লক্ষ্য করে দেখলাম, কয়েকটা কালো চুলও লেগে আছে ওতে। আমি সঙ্গে সঙ্গে এসবের সাক্ষী হিসেবে গ্রামের কিছু লোককে ডেকে পাঠালাম এবং তাদের উপস্থিতিতেই কাগজপত্র তৈরি করতে থাকলাম।

কিছুক্ষণের মধ্যে বাহাদুর আলি এসে পৌঁছাল। বছর ত্রিশেক বয়স, দুর্বল চেহারা। ঘরে ঢুকেই সে বেশ বিস্ময়ের সঙ্গে বলে উঠল, 'কি ব্যাপার, আপনারা এখানে কেন?'

আমি ওকে বসতে বলে জিগ্যেস করলাম, 'এ সব কাপড়চোপড় জুতো তোমার?' কাপড়টা এভাবে হাতে ধরে ছিলাম যাতে রক্তের দাগ না দেখা যায়। বাহাদুর চোখ পিটপিট করে বলল, 'হ্যাঁ। আমারই।'

'আর এই লাঠিটা?'

'হ্যাঁ, লাঠিটাও আমার। কিন্তু এসব প্রশ্ন করছেন কেন?'

আমি বললাম, 'কিছু না জানার ভান করো না, কাল রাত দশটা থেকে বারোটা পর্যন্ত তুমি কোথায় ছিলে?'

'দশটা থেকে বারোটা পর্যন্ত? কেন, ঘরেই তো ছিলাম, ঘুমোচ্ছিলাম।'

এবার কড়া গলায় বললাম, 'হুঁ। শাব্বীর হুসেনকে খুন করতে গেলে কেন?'

'আমি? খুন করেছি? আপনি সুস্থ আছেন তো?'

বাহাদুর আলির এই কথা শুনে এ·এস·আই মুখে একটা থাপ্পড় মেরে বললেন, 'এই ভদ্রভাবে কথা বলো।'

এবার দরজার বাইরে থেকে বাহাদুর–এর মা দ্রুত ঘরে ঢুকে চেঁচামেচি শুরু করে দিলেন, আমাদের গালমন্দ করতে লাগলেন। বাহাদুর আলিও হাতপা চালাতে চেষ্টা করছিল, আমি ওকে সে সুযোগ না দিয়ে ওর হাতে জোর করে হাতকড়ি পরিয়ে বৃদ্ধাকে উদ্দেশ্য করে বললাম, 'আম্মাজী, আপনার ছেলে একটা খুনী। কাল এক ছোকরাকে খুন করেছে সে। প্রমাণ তো দেখতেই পাচ্ছেন। এমনকি দেখুন, লাঠির ডগায় মৃতের চুল পর্যন্ত লেগে আছে।'

'এসব মিথ্যে কথা। আমার ছেলে খুনী হতে পারে না, কেউ শত্রুতা করে এসব করছে।' বৃদ্ধা সমান তেজে বলে যাচ্ছেন।

আমি বললাম, 'আম্মাজী, দাঁড়ান। আপনার বৌমাকে একটু ডেকে আনুন তো।'

দরজার বাইরে থেকে জমিলার গলা শোনা গেল, আমাকে ডাকতে হবে না, আমি এখানেই আছি, বলুন কি জিগ্যেস করতে চান?'

বললাম, 'জমিলা বিবি, সাধারণ অবস্থায় নিশ্চয়ই কাউকে এমন কিছু বলা উচিত নয় যাতে তার মর্যাদার ক্ষতি হয়, কিন্তু এই কেসটা এখন খুনের কেস। শাব্বীর হুসেনের খুনের কারণ আমি কিছুতেই বের করতে পারছিলাম না। ওর সঙ্গে কারুর শত্রুতা ছিল না, জমি সম্পত্তি নিয়ে কোনো ঝামেলা নেই–কি হতে পারে? অবশেষে গ্রামের লোকজনদের জিজ্ঞাসাবাদ করতে করতে একটা সূত্র পেলাম। সেটা কি বলছি, তার আগে তোমাকে কয়েকটা কথা জিগ্যেস করতে চাই, ঠিক ঠিক জবাব দাও। প্রথম প্রশ্ন, শাব্বীর হুসেনকে তুমি চিনতে কি না?'

সংকোচের সঙ্গে এবার জমিলা জবাব দিল, 'হ্যাঁ চিনতাম। আমাদের বাড়ির পাশেই ওরা থাকতো।'

'তুমি কি ওকে পড়াশোনা করে ভালো চাকরিবাকরির চেষ্টা করতে বলেছিলে?'

'মনে নেই আমার। যদি বলেও থাকি, ভালো পরামর্শ দেওয়াটা কি খারাপ?'

'তুমি কি ওকে কিছু চিঠিপত্র লিখেছিলে?'

'দেখুন এ প্রশ্নের উত্তর আমি দেব না।'

এবার আমি জমিলার শাশুড়িকে উদ্দেশ্য করে বললাম, 'আম্মাজী, কিছু মনে করবেন না। বাধ্য হয়ে কিছু কথা আপনাকে বলতে হচ্ছে। আপনার বৌমা বিয়ের আগে শাব্বীরকে ভালবাসত এবং বিয়েও করতে চেয়েছিল। একথা গ্রামের বেশ কিছু লোক জানে। কিন্তু শাব্বীর যেহেতু লোহার বংশের ছেলে, তাই চৌধুরী ফৈজ মহম্মদ এ বিয়েতে রাজি হননি।'

বৃদ্ধা জিগ্যেস করলেন, 'আপনি কি বলতে চান যে জমিলার বাবা এসব জানতেন?'

'হ্যাঁ, আমি তার সঙ্গে দেখা করেছি, অত্যন্ত সজ্জন লোক। এসব কথা শুনে একটুও রাগ করেননি, বরং বললেন, শাব্বীর ছেলেটা একটু বোকা ছিল। যাই হোক, আপনার ছেলে বাহাদুর আলি যখন এসব কথা জানতে পারল, তার পক্ষে সহ্য করা সম্ভব হল না, শাব্বীরকে সে খুনই করে ফেলল।'

বাহাদুর আলি চীৎকার করে বলল, 'মালিক সাহেব এসব মিথ্যে কথা। আমি খুন করিনি। শাব্বীর হুসেনকে আমি চিনি না পর্যন্ত।'

'তাহলে বাহাদুর আলি, এই পোশাক, জুতো, লাঠি–এগুলোতে রক্তের দাগ লেগে আছে কেন? এই চুলই বা কার, লাঠিতে লেগে আছে?'

এবার এ·এস·আই· বাহাদুরকে ধমকে বললেন, 'বেশি চালাকি করবে না। তোমার সঙ্গে আর কে ছিল সেখানে?'

'আমার সঙ্গে? তার মানে?'

'তার মানে একা একাই সব কাজ সেরেছ?'

'না না, আমি কাউকে খুন করিনি।'

বাহাদুর আলিকে গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে যাওয়া হল। ৩০২ ধারায় ওর বিরুদ্ধে মামলা করা হল। সাক্ষ্যপ্রমাণ জোরদার ছিল, তাই কেস আদালতে পাঠাতে অসুবিধে হয়নি। কিন্তু অপরাধী তার বিবৃতিতে বলেছিল, ঘটনার সময় সে বাড়িতে ঘুমোচ্ছিল। তার এই বক্তব্যের একমাত্র সমর্থন পাওয়া যেতে পারে তার স্ত্রী জমিলার কাছে। কিন্তু জামলা তার বিবৃতিতে একথা বলেনি। কিছুদিন পরে আমি জমিলার লিখিত বয়ান নেবার জন্য দরখানা গেলাম। শুনলাম, জমিলা নেই, বাপের বাড়ি চলে গেছে। সেখান থেকে সোজা চলে গেলাম ওর বাপের বাড়িতে। জমিলাকে সেখানে পেয়ে গেলাম। তার বাবা এবং চৌধুরী ফজল মহম্মদও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। চৌধুরী ফজল মহম্মদ বললেন, 'জমিলা বেটি, কোন কথা গোপন করার প্রয়োজন নেই। সব কথা সত্যি করে বলে দাও।'

জমিলা বলল, 'মালিক সাহেব, তাহলে আপনাকে সব কথা খুলেই বলি। বিয়ের পরের দিন নিয়মমত আমি বাপের বাড়িতে এসে কয়েকদিন ছিলাম। যেদিন চলে যাব, সেদিন যাবার মুখে হঠাৎ একটা বাচ্চা এসে আমার হাতে একটা খাম দিল। ভাবলাম, কেউ শুভেচ্ছা পাঠিয়েছে। খামটা তাই তখনই না খুলে পার্সের মধ্যে রেখে দিলাম। ওটা শুভেচ্ছা–ই ছিল, পাঠিয়েছিল শাব্বীর হুসেন, একটা চিঠিও ছিল সঙ্গে। দিন দুয়েক পর বাহাদুর আলি আমার কাছে নেলকাটার চাইল নখ কাটার জন্য। ওটা আমার পার্সে ছিল, ওকে বের করে নিতে বললাম।

ওটা বের করতে গিয়ে ওর হাতে পড়ল সেই খাম। চিঠিটা পড়ে সে ভীষণ রেগে গেল। আমার কোন কথা শুনতে চাইল না, আমাকে যা তা বলল, গায়ে হাতও তুলল, আর বারবার বলতে লাগল–শাব্বীর হুসেনকে ও নাকি শেষ করে ফেলবে। শেষ পর্যন্ত ও যে এ কাজটা সত্যি করে ফেলবে, আমি ভাবতেও পারিনি।'

প্রশ্ন করলাম, 'তুমি কি বলতে চাইছ যে তোমার স্বামী শাব্বীরকে খুন করেছে?'

'মালিক সাহেব, আমি তো নিজের চোখে ওকে খুন করতে দেখিনি, তবে অনুমান করতে পারি। ঘটনার দিন রাত বারোটা নাগাদ আমার স্বামী ঘরে
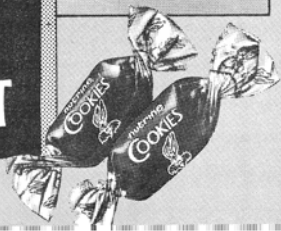
আসে, আর যে কাপড়গুলো আপনি ঐদিন সঙ্গে নিয়ে গিয়েছেন, ও সেগুলোই পরে ছিল।'

জমিলার এই বিবৃতি লিখে নিলাম। পরে বাহাদুর আলিকে যখন বললাম, তোমার বিবি এইসব বয়ান দিয়েছে তোমার বিরুদ্ধে, সেকথা শুনে বাহাদুর আলিকে ভীষণ উত্তেজিত মনে হল। অপ্রকৃতিস্থের মত সে চীৎকাব করতে লাগল। দেওয়ালে মাথা ঠুকে ঠুকে সে রক্ত বের করে ফেলল। বাহাদুরের বাবা ছেলের জামিনের জন্য খুব চেষ্টা করলেন, কিন্তু পারলেন না। ওকে জেলে পাঠানো হল। এর মধ্যে চৌধুরী ফজল মহম্মদ জেলে বাহাদুরের সঙ্গে দেখা করে জমিলার তালাকনামায় সই করিয়ে নিলেন একদিন।

এই ঘটনাটা আমাকে একটু অন্যভাবে ভাবিয়ে তুলল। শাব্বীরকে খুনের দিন পর্যন্ত চৌধুরী ফজল মহম্মদ নিজের বড় ভাইয়ের ওপর বেশ অসন্তুষ্ট ছিল। জমিলার বিয়ে নিজের বংশের বাইরে দেওয়ার ফলে ফজল মহম্মদ এবং তার ছেলেরা প্রত্যেকেই ফৈজ মহম্মদের ওপর একটা আক্রোশ পুষে রেখেছিল। হঠাৎ বড়ভাইয়ের পরিবারের প্রতি তাদের এত নেকনজর কেন?

আরো খবর পেলাম, সরকারী উকিলের সঙ্গে সঙ্গে এই কেসে আরো একজন প্রাইভেট উকিল নিযুক্ত করা হয়েছে, তিনি হাইকোর্টে প্র্যাকটিস করেন এবং তাঁর ফী-ও অনেক বেশি, অন্তত বশীর লোহারের পক্ষে এতবড় উকিল নিয়োগ করা কখনই সম্ভব নয়। যা সন্দেহ করেছিলাম, তাই ঠিক। চৌধুরীদের পক্ষ থেকেই ঐ উকিলকে নিয়োগ করা হয়েছে। কিন্তু বাহাদুর আলিকে ফাঁসিতে ঝোলানোর জন্য চৌধুরী ফজল মহম্মদ-দের এত আগ্রহ কেন? জমিলার তালাক হয়ে যাবার পর তো তাদের আর কোনো স্বার্থ থাকতে পারে না।

জমিলার সঙ্গে একদিন দেখা করে এলাম। দেখলাম, তালাক পেয়ে যেন খুশিই হয়েছে। ওকে জিগ্যেস করলাম, 'জমিলা বিবি, তোমার পার্সের মধ্যে শাব্বীরের লেখা যে চিঠিটা পেয়ে বাহাদুর আলি রেগে গিয়েছিল, সে চিঠিটা কোথায়?'

'সে চিঠি পুড়িয়ে ফেলেছি আমি।'

'তুমি কি নিশ্চিত যে শাব্বীরকে বাহাদুর আলি খুন করেছে?'

'আপনি তদন্ত করছেন, আপনি সেটা ভালো জানবেন। আমি যা বলার বলে দিয়েছি, এবার আদালত যা করার করবে।'

আমি বললাম, 'আদালত সাক্ষীদের বক্তব্যের ওপর নির্ভর করে রায় দেয়। ঐ দিন রাত বারোটার সময় বাহাদুর আলি যখন বাড়ি ফিরে এল, তুমি জেগে বসেছিলে?'

'ঘুমোচ্ছিলাম। ও ঘরে ঢুকতেই ঘুম ভেঙে যায়।'

আমি তবু জমিলাকে বোঝাতে চেষ্টা করলাম, 'জমিলা, আমি একজন পুলিশ অফিসার, অপরাধীদের প্রতি আমার কোন সহানুভূতি নেই। কিন্তু বাহাদুর আলি সম্পর্কে আমি ঠিক নিশ্চিত হতে পারছি না। যদি সত্যি সত্যি ও নির্দোষ হয়, আর তোমার সাক্ষ্যের ফলে ওর ফাঁসি হয়ে যায়, সেই পাপের ফল কিন্তু তোমাকেই ভোগ করতে হবে। ভালো করে ভেবে দেখো, এখনো সময় আছে। তুমি যা বিবৃতি দিচ্ছ, তাতে বাহাদুর আলির শাস্তি হবেই।'

জমিলা নিশ্চিন্ত কণ্ঠস্বরে বলল, 'আমি ভেবেচিন্তেই যা বলার বলেছি।'

বদলি হয়ে যাবার কয়েকমাস পর খবর পেলাম মুজাফফর আহমদ-এর সঙ্গে জমিলার বিয়ে হয়ে গেছে। অর্থাৎ, পরিবারের সম্পত্তি পরিবারের মধ্যেই থেকে গেল। কয়েকবছর পর বাহাদুর আলিকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হল।

> *'বিয়ের পরই প্রথামত বাপের বাড়ি এলাম, তখন আমি মুজাফফরকে বললাম, দয়া করে এই বাহাদুর আলির হাত থেকে আমাকে বাঁচাও। মুজাফফরই তখন ভেবেচিন্তে ঐ পরিকল্পনাটা তৈরি করে। শাব্বীরকে খুন করে বাহাদুর আলির ওপর তার দোষ চাপানো। কিভাবে সে শাব্বীরকে খুন করেছিল জানি না, তবে বাহাদুর আলির পোশাক, জুতো, লাঠি আমার শ্বশুরবাড়িতে ফেলে যায়, ওগুলো ভাড়ার ঘরে আমি রেখে দিয়েছিলাম।'*

তারপর, হঠাৎ, আজ ২৭-২৮ বছর পরে সেই জমিলা বিবিকে কি বিচিত্র পরিস্থিতিতে দেখলাম। বাস্তবিকই, আমি খুব বিস্মিত হয়ে পড়েছিলাম। জমিলাকে বাড়িতে এনে বসালাম। সোফায় না বসে জমিলা বসল গালিচায়। আমি প্রশ্ন করলাম, 'জমিলা বিবি, তোমার এ অবস্থা কি করে হল? আমি তো শুনেছিলাম, তুমি তোমার চাচার ছেলে মুজাফফরকে শাদি করেছিলে, তোমার আব্বা, চাচা সব কোথায়?'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে জমিলা বলল, 'সব কবরে শুয়ে আছে, মুজাফফরও।'

'আর তোমার জমি সম্পত্তি?'

'মালিক সাহেব, সে সবকিছু চাচার ছেলে আর নাতিরা ভোগ করছে। আল্লাহ আজ আপনার সঙ্গে আমার দেখা করিয়ে দিয়েছেন। আমি বড় একটা বোঝা বুকে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি, আপনাকে সব কথা বলে একটু হাল্কা হতে চাই।'

আমি চুপ করে থাকলাম।

মালিক সাহেব, আপনার শাব্বীর হুসেনের খুনের ঘটনাটা মনে আছে তো?'

বললাম, 'হ্যাঁ মনে আছে।'

'মালিক সাহেব, বাহাদুর আলি খুন করেনি, সে ছিল নির্দোষ, নিরপরাধ।'

'সেটা আমি কিছুটা বুঝতে পেরেছিলাম। কিন্তু ততদিনে তো বদলি হয়ে গিয়েছিলাম, ফলে কিছু করে উঠতে পারিনি। শাব্বীরকে কে খুন করেছিল?'

'আমার দ্বিতীয় স্বামী মুজাফফর। মুজাফফর আমাকে বিয়ে করতে চেয়েছিল, কিন্তু আব্বাজী বংশগত মনোমালিন্যের অজুহাতে আমাকে বাহাদুর আলির সঙ্গে শাদি দিয়ে দেয়। বাহাদুর আলিকে দেখলাম যখন, তখন আমার আব্বাজীর ওপর প্রচণ্ড রাগ হল। লোকটাকে আমার একদম পছন্দ হয়নি। তবে আজ বুঝি, সেসময় আমার পছন্দ অপছন্দের ব্যাপারটায় কোন গভীরতা ছিল না। যাইহোক, বিয়ের পরই প্রথামত বাপের বাড়ি এলাম, তখন আমি মুজাফফরকে বললাম, দয়া করে এই বাহাদুর আলির হাত থেকে আমাকে বাঁচাও। মুজাফফরই তখন ভেবেচিন্তে ঐ পরিকল্পনাটা তৈরি করে। শাব্বীরকে খুন করে বাহাদুর আলির ওপর তার দোষ চাপানো। কিভাবে সে শাব্বীরকে খুন করেছিল জানি না, তবে বাহাদুর আলির পোশাক, জুতো, লাঠি আমার শ্বশুরবাড়িতে ফেলে যায়, ওগুলো ভাড়ার ঘরে আমি রেখে দিয়েছিলাম।'

আমি স্তব্ধ হয়ে শুনে যাচ্ছিলাম, জিগ্যেস করলাম, 'মুজাফফর মারা গেল কিভাবে?'

সে আরেক গল্প মালিক সাহেব। বাহাদুর আলি গ্রেপ্তার হওয়ার কয়েক মাস পর তার ছেলের মা হলাম আমি। বাহাদুর আলি জেল থেকে একটা অনুরোধ পাঠাল ছেলের নাম যাতে শের আলি রাখি। ওর এই আকাঙ্ক্ষাটা আমি পূর্ণ করেছিলাম। মুজাফফরের সঙ্গে বিয়ের পর আমার তিনটি মেয়ে হয়। মুজাফফর খুব অসন্তুষ্ট ছিল ওর কোন ছেলে হয়নি বলে। শের আলিকে দুচোখে দেখতে পারত না মুজাফফর। শের আলিকে মাঝে মাঝে খুনীর ছেলে বলত। একদিন এই নিয়ে আমি খুব ঝগড়া করলাম। বললাম, 'খুনী তো তুমি। শাব্বীরকে খুন করে নির্দোষ বাহাদুর আলিকে তুমি ফাঁসিকাঠে ঝুলিয়েছ।'

আড়ালে দাঁড়িয়ে কথাটা শুনেছিল শের আলি। তারপর একদিন শাব্বীরকে যেমন করে খুন করা হয়েছিল–তেমনি করেই সে খুন করে মুজাফফরকে। ধরাও পড়ে। 'ওর যাবজ্জীবন জেল হয়ে গেছে। মালিক সাহেব, আমার এ অবস্থার জন্য কেউ দায়ী নয়, আমার পাপের বোঝা তো আমাকেই বইতে হবে। আল্লাহ এভাবেই নীরবে শাস্তি দিয়ে থাকেন। কারুর বিরুদ্ধে আমার কোন অভিযোগ নেই।'

৪৭পৃষ্ঠার পর

এনে দিতাম, ওভাবে বিজ্ঞাপন দেবার কি দরকার ছিল? কুমার সাহেব সব কিছু হেসেই উড়িয়ে দিলেন। ব্যস সব মনোমালিন্যের ইতি হয়ে গেল। আমি আবার কাজে মন দিলাম।'

শুধু রূপা নয়, ইতিহাস ঘাটলে প্রায় সব ক'জন অভিনেত্রীর ব্যাপারে নানা অপমানজনক ঘটনার সন্ধান পাওয়া যাবে। রূপা গাঙ্গুলী যে কোন কারণেই হোক স্বমহিমায় শেষ পর্যন্ত টিকে থাকতে পেরেছেন। টালিগঞ্জ স্টুডিও পাড়াতে কিন্তু এমন ঘটনাও অনেকগুলো ঘটেছে যাতে অভিনেত্রীরা বিশ্রী দৃশ্যের অবতারণার পর বাদ পড়েছেন।

যেমন ধরা যাক, নায়িকা সঞ্চিতা বসুর কথা। কিছু দিন আগে জহর বিশ্বাস পরিচালিত 'শঙ্খচূড়' ছবির মহরৎ খুব ঘটা করে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সেই মহরতের শিল্পী ছিলেন সঞ্চিতা আর তাপস পাল। বাংলা ছবির অনেক মানুষজনই সেই মহরতে এসে ওই ছবি সম্পর্কে শুভকামনা জানিয়ে গিয়েছিলেন। তারা শুভকামনা করলে কি হবে, ছবিটা কিন্তু শুভ হলো না। বিশেষ করে নায়িকা সঞ্চিতার ভাগ্যে।

প্রায় মাস চারেক ওই ছবি নিয়ে অনেক প্রচার চলল। স্যুটিং আরম্ভের পর দেখা গেল ওই ছবি থেকে সঞ্চিতা বাদ পড়েছেন। তার জায়গায় এসেছেন দেবশ্রী রায়। মজার ব্যাপার হলো, ওই বাদ যাওয়ার সংবাদটি ইউনিট বা দেবশ্রী রায় কেউই সঞ্চিতাকে সরাসরি কোন কথায় বলেন নি। সব জানাটাই লোকমুখে বা সংবাদপত্র পড়ে। স্বাভাবিক ভাবেই সঞ্চিতা দুঃখ পেয়েছিলেন খুব।

এ সম্পর্কে প্রশ্ন করতেই সঞ্চিতা বললেন, 'আপনারা যা ভাবছেন তা নয়। বাদ দিয়ে আমি খুবই দুঃখ পেয়েছিলাম, কিন্তু ভেঙে পড়ি নি। কেননা আমি জানতাম, অমন একটা কিছু ঘটতে চলেছে।

—কেন আপনার অমন মনে হলো?

—কারণ একটাই। মহরতের পর ছবির প্রযোজক আমায় হঠাৎই একদিন অনুরোধ জানালেন, ছবিতে কিছু টাকা ঢালার জন্য। আমি না পারলে কোন ফাইন্যানসার যেন ঠিক করে দিই, যিনি ছবিতে কয়েক লক্ষ টাকা ঢালবেন। কথাগুলো আমার ভালো লাগল না। অত টাকা বা ফাইন্যানসিয়ার আমি কোথায় পাব? সঙ্গে সঙ্গে আমি আমার আপত্তির কথা বলতেই প্রযোজক বললেন, তাহলে আমার তো আপনাকে বাদ দিতে হবে! যে কথা সেই কাজ। একদিন শুনলাম আমি বাদ, আমার রোলটা করছেন দেবশ্রী রায়।'

কলকাতার আরেকটি ঘটনার কথা এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। ঘটনাটি হলো পরিচালিকা অরুন্ধতী দেবীর সঙ্গে নায়িকা দেবিকা মুখার্জীর বিরোধ। ঘটনাটি কয়েক বছর আগেকার। দেবিকা নির্বাচিত হয়েছেন অরুন্ধতী দেবীর 'দীপার প্রেম'এর নায়িকা হিসেবে। দীপার ভূমিকায়। স্বাভাবিক ভাবেই এ হেন একটি ব্রেক পেয়ে দেবিকা খুবই আনন্দিত। ছবির স্যুটিংও আরম্ভ হলো

আশা সচদেবের বদলে?

মহুয়া রায়চৌধুরী: বাংলাদেশে যাওয়া হয়নি।

অনেক ঢাক ঢোল পিটিয়ে। দেবিকা কাজও করলেন কয়েকদিন। কিন্তু রাতারাতি জানা গেল দীপার চরিত্র থেকে দেবিকা পাল্টে গিয়ে সেখানে এসেছেন মুনমুন সেন। হঠাৎই ওই বাদ যাওয়া, হঠাৎই ওই নির্বাচন। এক্ষেত্রেও মুনমুন কোন আলোচনা করেন নি দেবিকার সঙ্গে। কি এমন ঘটল যে দেবিকা বাদ গেলেন? ঘটনাটি নাকি খুবই সামান্য। একদিন হঠাৎই স্যুটিং–এর সময় অরুন্ধতী আবিষ্কার করলেন তার নায়িকা তাকে না জানিয়ে নিজের চুল অনেকটা কেটে ফেলেছেন। অথচ অরুন্ধতী দেবীর নির্দেশ ছিল, তাকে না জানিয়ে অমন কাটাকাটি করা চলবে না।

নিষেধ অমান্য করাতে, অরুন্ধতী চটে গেলেন। ইউনিটের আর পাঁচজনের সামনে দেবিকাকে নরম গরম ভাষায় কিছু কথা বলার পর দেবিকাও প্রত্যুত্তরে কিছু জানালেন। এভাবে তর্ক চলার পর, অরুন্ধতী দেবী, দেবিকাকে চলে যেতে বললেন স্যুটিং থেকে। অপমানিতা দেবিকা তখনই স্যুটিং ছেড়ে চলে আসেন। কয়েকদিন পরেই মুনমুনকে নিয়ে নতুন ভাবে শুরু হয় ছবির শুটিং।

শুধু কলকাতার নয় বোম্বের শিল্পীদের সঙ্গেও এ হেন কিছু ঘটনার সন্ধান পাওয়া মোটেই শক্ত কাজ হবে না।

আশা সচদেব কাজ করেছিলেন একটি মাত্র বাংলা ছবিতে। তার নাম 'নানা রঙের দিনগুলি'। এ ছবির কাজের আগে আশার সঙ্গে 'কবিতা' ছবির প্রযোজকের চুক্তি হয়েছিল। 'কবিতা'য় সন্ধ্যা রায় যে চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন সেই চরিত্রের জন্য। চুক্তিবদ্ধ হওয়ার পর আশা ওই ছবিতে কাজ করার ব্যাপারে আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন। শোনা যায়, আগ্রহ হারানোর-পিছনে নাকি প্রযোজকের কিছু বিসদৃশ আচরণ কাজ করেছে। তবে ঘটনার সত্যি মিথ্যে এতদিন পরে যাচাই করা সম্ভব নয়। বিশেষত আশা যখন বোম্বাইতে রয়েছেন। তবে চুক্তিবদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও সে ছবিতে কাজ না করার পিছনে বিশেষ কোন কারণ যে কাজ করেছে তাতে আর সন্দেহ কি। শোনা যায়, ব্যাপারটা আদালত পর্যন্ত না গড়ালেও আইনজ্ঞদের চিঠি দেওয়া-নেওয়া হয়েছিল। শেষে প্রযোজক ভরত শমসের জং বাহাদুর রাণা বাধ্য হন আশা সচদেবের জায়গায় সন্ধ্যা রায়কে নিতে।

এ ধরনের অজস্র ঘটনা প্রতিদিনই ঘটে চলেছে। যার অর্ধেক বললেও এ পত্রিকার সব ক'টি পাতা ব্যবহার করলে তা সম্পূর্ণ হবে কি না সন্দেহ। তবে শুধু নারী নয় পুরুষদের ক্ষেত্রেও এমন ঘটনার সন্ধান পাওয়া যায়। কিন্তু সংখ্যায় তা মেয়েদের মত অত বিশাল নয়।

এর কারণ হিসেবে বলা যায়, ভারতীয় চলচ্চিত্রজগৎ পুরোপুরি পুরুষশাসিত। মহিলাদের ছাড়া যে কাজটুকু হয় না, সেটুকুর জন্যই তাদের প্রয়োজন হয়। যেমন, নারী চরিত্রে অভিনয়, নেপথ্য কণ্ঠ, হেয়ার ড্রেসার—ব্যস ওইটুকুই ইতি। এ ভিন্ন পুরুষেরা চান না মহিলাদের এক ইঞ্চি জায়গা ছেড়ে দিতে, কর্তৃত্ব মেনে নিতে। ইদানীং হেয়ার ড্রেসিং–এর ব্যাপারেও সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে পুরুষ চুল বিশারদদের, মেক্-আপ তো পুরুষ মেক্-আপ ম্যানেরাই করে আসছেন। আগামী দিনে নারীদের হাত থেকে যে ওই আসনের একাধিপত্য চলে যাবে না একথা কি হলফ্ করে কেউ বলতে পারেন?

এ সবের পেছনে কাজ করছে শুধু সেই রক্ষণশীল মনোভাব। মেয়েদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করার মত উদার বা স্বাভাবিক
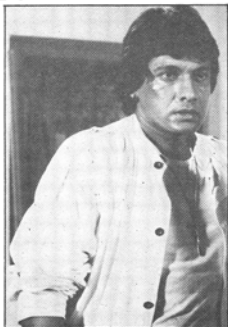
অভিজিৎ সেন: পরিচালক এঁকে চাবুক মারতে বলেছিলেন নায়িকাকে!

চিরঞ্জীব: 'সতী' থেকে বাদ পড়েছিলেন

মানসিকতা। অতীতেও চিত্রজগতের কেউ এ সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে উঠতে চান নি, বর্তমানেও কেউ চাইছেন না আর আগামী দিনের কথা এ মুহূর্তে কিছু না বলাই ভাল।

'নারী প্রগতি', নারী-পুরুষ সমান সমান ইত্যাদি নানা কথা এখন আমাদের পড়তে দেখতে বা শুনতে হচ্ছে। অথচ চিত্রজগৎ এখনও সেই মান্ধাতার যুগেই পড়ে আছে। প্রগতিশীল ছবি, বিদ্রোহের ছবি কতই না বিশেষণ যুক্ত ছবি আমাদের প্রতিদিনই দেখতে হচ্ছে। অবশ্যই কেউ কেউ বলতে পারেন, মহিলা পরিচালক কি মহিলা সম্পাদক ইদানীং তো দু'চারজন কাজ করছেন, একে কি কাজ বলা যায়?

বিশাল এ চিত্রজগতে হাতে গোনা মহিলা পরিচালক কি সম্পাদকের উপস্থিতি বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছাড়া আর কিছুই নয়। এ সঙ্গে একথাও বলা ভুল হবে না যে, ওইসব বিচ্ছিন্ন মহিলারা কেউই কর্তৃত্ব করার মত ক্ষমতাময়ীও নন। ফলে, পুরুষদের রাজত্ব করতে অসুবিধা কোথায়?

মোদ্দা কথা, চিত্রজগতের অধিকাংশ মানুষজনদের কাছে নারী এখনও রমণীয় সামগ্রী ভিন্ন আর কিছু নয়। বাংলা-হিন্দি ছবির এক্সট্রা মহিলাদের দিকে তাকালেই একথা আরো স্পষ্ট হয়ে উঠবে। প্রযোজকদের খুশি করার জন্য এক্সট্রা শিল্পী কি নামী-দামী নায়িকাদের ভেট্ পাঠানোর ঘটনা তো হামেশাই ঘটছে। মাঝে মধ্যেই এই অতিরিক্ত শিল্পীদের দুঃস্থ অবস্থা নিয়ে নাকেকান্না মার্কা নিবন্ধ পত্রপত্রিকায় দেখা যায়। বেশ কয়েকবার ঐ জাতীয় লেখা লিখে কিছু সাংবাদিক বিপদেও পড়েছিলেন।

এ হেন অবস্থায় অভিনেত্রীরা কখনও দোষে কখনও বা বিনা অপরাধে অপমানিতা হবেন তা আর আশ্চর্য কি? নামী-দামী অভিনেত্রীদের সঙ্গে বিরোধ বাধালে কিছু আলোড়ন ওঠে, বাস্ ওইটুকুই। একই ঘটনা ঘটেই চলে।

শুধু ছবির শুরুতে বাদ নয়, ছবির কাজ অনেকটা হয়ে যাওয়ার পরও শিল্পীর বাতিল হয়ে যাওয়ার ঘটনা নতুন নয়। যেমন, কিছুদিন আগে জনপ্রিয় অভিনেত্রী সুমিত্রা মুখার্জির সঙ্গে প্রযোজিকা দীপ্তি পাল-এর স্বামী দিলীপ পালের বিরোধের কাহিনী। ঘটনাটি এইরকম, 'অনুরাগের ছোঁয়া'র বহির্দৃশ্য গ্রহণের কাজ করতে ইউনিট গিয়েছিল দার্জিলিং-এ। সুমিত্রা মুখার্জিও গিয়েছিলেন অংশ নিতে। কিন্তু তাঁকে যে হোটেলে থাকতে দেওয়া হয়েছিল, সেটি কোন অভিনেত্রীর থাকার উপযুক্ত নয়, নিরাপদ তো নয়ই। স্বাভাবিক কারণেই সুমিত্রা মুখার্জি আপত্তি জানিয়েছিলেন। আর তাতেই নাকি দিলীপবাবু রেগে যান। কথা কাটাকাটির সময় অবস্থা এমন দাঁড়ায় যে, ইউনিটের মানুষজন দু'জনকে শান্ত করতে ছুটে এসেছিলেন। ঐ সময় দিলীপবাবু নাকি এমন কিছু কথা বলেছিলেন, যা খুবই অপমানজনক। শেষে কোনভাবে ওইদিনটা কাটিয়ে সুমিত্রা মুখার্জি ফিরে আসেন কলকাতায়। অভিযোগ জানান নানা সংগঠনে। শেষ পর্যন্ত দিলীপবাবুকে ছবি থেকে সুমিত্রাকে বাদ দেবার জন্য বেশ কয়েক হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হয়। সুমিত্রার জায়গায় ওই ছবিতে কাজ করলেন রাজেশ্বরী রায় চৌধুরী।

পরে এক সাক্ষাতে রাজেশ্বরী জানান, উনি ওসব ঘটনার কিছু নাকি জানতেন না। ছবির স্যুটিং করার পর সব জানতে পারেন। কিন্তু তখন তার পিছিয়ে আসার কোন উপায় নেই। সুমিত্রা মুখার্জির ওই অপমানে চিত্রজগতে আলোড়ন উঠেছিল খুব। এবং তা ঘটেছিল প্রধানত সুমিত্রার ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তার কারণে। সুমিত্রা গর্জে উঠেছিলেন বলে তাতে সাড়া পাওয়া গিয়েছিল। আবার চিত্রজগতে এমন ঘটনাও ঘটে থাকে যাতে অপমানিতা অভিনেত্রী নিজেই অপমানের যোগ্য জবাব দিয়ে থাকেন। যেমন দিয়েছিলেন অভিনেত্রী মিঠু মুখার্জি।

স্যুটিং চলছিল সুশীল মুখার্জি পরিচালিত 'স্বয়ংসিদ্ধা' ছবির। দৃশ্যটি ছিল, ছবির ভিলেন অভিজিৎ সেন নায়িকা মিঠু মুখার্জিকে চাবুক দিয়ে মারবেন। টেকিং-এর আগে রিহার্সালের সময় যথারীতি অভিজিৎ চাবুক চালাচ্ছিলেন আস্তে আস্তে। আর তা দেখে ছবির প্রযোজক ভরত শমসের জং বাহাদুর রাণা নাকি বললেন, মারাটা ঠিক হচ্ছে না আরো জোরে মারো।

অভিজিৎ অবাক হয়ে বললেন, জোরে মারলে তো ওঁর লাগবে।

রাণা বললেন, লাগে লাগুক। তুমি মারো, ঠিকমতন।

মিঠু মুখার্জি সবই শুনলেন, কিন্তু মুখে কিছু বললেন না। দৃশ্যটি টেক্ হয়ে যাবার পর। কথায় কথায় অভিজিৎ সেনের কাছ থেকে চাবুকটা চেয়ে নিয়ে পুরো শক্তিতে মিঠু তা চালাতে শুরু করলেন প্রযোজক রাণার ওপর। ফ্লোর শুদ্ধ লোক অবাক। কেউই সাহস করলেন না রণরঙ্গিনী মিঠুকে থামাতে। চাবুকের সঙ্গে মিঠু বলতে লাগলেন, দেখুন জোরে মারলে লাগে কি না?

বেশ কয়েক ঘা চাবুক মারার পর ক্লান্ত মিঠু থামলেন। তখন প্রযোজক রাণা সাহেব রক্তাক্ত। শোনা যায়, এভাবে মিঠু মুখার্জির বিদ্রোহিনী হয়ে ওঠার পেছনে অনেকগুলি কারণ কাজ করেছে। ওইরকম গর্জে ওঠার পেছনে ব্যক্তিগত নানা ভুল বোঝাবুঝিও রয়েছে। তবে এভাবে আর গায়ে হাত তোলার কোনও খবর পাওয়া যায় নি।

একেবারে পাওয়া যায় নি বললে ভুল হবে। অনেকটা এ রকমই একটা ঘটনা ঘটেছিল ১৯৭৭ সালের ১৮ জুন ইন্দ্রপুরী স্টুডিওতে।

ঘটনাটি এইরকম, ঝুলন বসু ছিলেন দীনেন গুপ্ত পরিচালিত 'সানাই' ছবির চার নায়িকার একজন। অপর তিনজন হলেন, কাজল গুপ্ত, সোনালী গুপ্ত এবং ঝুলন বসুরই ছোট বোন লায়লা বসু। ঝুলন ইন্দ্রপুরী স্টুডিওতে এসেছিলেন পরিচালক সুশীল মুখার্জির সঙ্গে দেখা করতে। কথা সেরে গেটে দাঁড়ানো ট্যাক্সিতে ঝুলন উঠতে যাবেন, ঠিক তখনই তাঁর গায়ে জুতো ছুঁড়ে মারলেন দীনেন গুপ্ত'র মেয়ে সোনালী গুপ্ত। অকথ্য গালিগালাজ। উত্তেজিত সোনালীকে পরবর্তী কাজের থেকে বিরত করলেন উপস্থিত মানুষজনেরা। স্টুডিওর ফ্লোরে তখন চলছিল 'রজনী' ছবির স্যুটিং।' এমন ঘটনাও চিত্রজগতে রোজ রোজ ঘটেনা। স্বাভাবিক ভাবেই এ নিয়ে আলোড়ন উঠল খুব। অতঃপর জানা গেল নায়িকা সোনালীর এধরনের আচরণের

রাজেশ্বরী : না জেনে অভিনয় করেছিলেন?

আসল কারণ।

'সানাই'–এর স্যুটিং শুরু হওয়ার সময় থেকেই নাকি ঝুলন বসুর সঙ্গে হৃদ্যতা গড়ে ওঠে দীনেনবাবুর। প্রায় প্রতিদিনই দীনেনবাবু যেতেন ঝুলন বসুর বাড়ি। এ ব্যাপারটাই দীনেনবাবুর স্ত্রী কাজল গুপ্ত ও কন্যা সোনালী গুপ্ত মোটেই ভালো চোখে দেখতেন না। আর তারই বহিঃপ্রকাশ ওই ঘটনা। প্রসঙ্গত বলে নেওয়া ভালো পাত্র-পাত্রীরা সকলেই দীনেনবাবু ও ঝুলন বসু'র অন্তরঙ্গতার ব্যাপারটা অস্বীকার করেছিলেন।

ঝুলন এ ব্যাপার নিয়ে নানা মহলে অভিযোগ জানিয়েও নাকি কোন বিচার পান নি। কেননা ঘটনাটি সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত হওয়ার জন্য কেউই আর এ নিয়ে মাথা ঘামাতে চান নি। 'সানাই' ছবিতে দীনেনবাবুই একসঙ্গে ঝুলন আর লায়লাকে সুযোগ দিতে চেয়েছিলেন। এ দু'টি নামও দীনেনবাবুরই দেওয়া। ওদের আসল নাম শিপ্রা আর লায়লার নাম মণিমালা বসু।

ব্যক্তিগত সম্পর্ক নিয়ে বিদ্রোহ ঘোষণার সর্বশেষ সংযোজন হলেন অভিনেত্রী রত্না ঘোষাল। অভিনেতা সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দীর্ঘদিন একসঙ্গে থাকার পর রত্না বিদ্রোহ করেন। সব সম্পর্ক ছিন্ন করে স্বাধীনভাবে দিন কাটানোর কথা ঘোষণা করেন।

সত্যবাবু অল্প বয়স থেকে রত্নার যাবতীয় দায়িত্ব নিয়েছিলেন, বিনিময়ে রত্নার লিখিত বিবৃতি মতে রত্নাকে দিতে হয়েছিল ওর যৌবনের সর্বাধিক মূল্যবান দিনগুলো। 'সত্যবাবুর যাবতীয় শারীরিক অভাববোধকে কাটিয়ে তুলতে হয়েছে আমাকে।' একথাও রত্না লিখিতভাবে জানিয়েছেন। গোটা

রত্না ঘোষাল, প্রতিবাদ করেছিলেন

ব্যাপারটি কিছুদিন আগে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হওয়ার পর চিত্রজগতে এ নিয়ে আলোড়ন ওঠে। যথারীতি একদিন গোটা ঘটনাটি ধামা চাপাও পড়ে যায়।

'দীর্ঘদিন এ ধরনের জীবন যাপনের পর' এ হেন বিদ্রোহের যোগ্য উপমা খুঁজে পাওয়া সত্যিই খুব শক্ত কাজ। অনেক কারণে, নানা অত্যাচার সহ্য করার পর রত্না প্রতিবাদী হয়েছিলেন। যা অনেকেই পারেন নি।

শুধু টালিগঞ্জে স্টুডিও পাড়াই নয়, আমাদের প্রতিবেশী বাংলা দেশ–এর ছবিতে কাজ করতে গিয়ে কলকাতার অভিনেত্রীরা নানা সময়ে নানা ভাবে অপমানিতা হয়েছিলেন।

মহুয়া রায় চৌধুরীর মৃত্যুর আগে যে অপমানটির জ্বালায় সর্বদাই ছট্‌ফট্ করেছেন সেটি হলো, বাংলাদেশে যাবার ভিসা অস্বীকৃত হওয়া। এর জন্য ওখানকার চিত্রজগৎ প্রত্যক্ষভাবে দায়ী না হলেও পরোক্ষভাবে তারা কি পারেন দায়িত্ব অস্বীকার করতে! কলকাতার তখনকার সেরা নায়িকা যাতে ভিসা পান সে ব্যবস্থা কি তাদের করা উচিত ছিল না?

আর আরতি ভট্টাচার্যের ঘটনাটি আরো বিচিত্র।

আরতি কয়েক বছর আগে চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলেন 'ছুটির ফাঁদে' ছবিতে অভিনয় করার জন্য। পরিচালক ছিলেন শহীদুল হক খান। প্রায় পঁচাত্তর ভাগ স্যুটিং করার পর আরতি'কে বাদ দিয়ে পরিচালক কলকাতারই আরেক নায়িকাকে নির্বাচিত করেন।

জানা যায়, ঢাকায় স্যুটিং করার সময় এক সাংবাদিক সম্মেলনে জনৈক সাংবাদিক নাকি তাঁকে প্রশ্ন করেন, তিনি পরিচালকের 'বাকদত্তা' কি না? ফিল্ম জার্নালিস্টরা তিলকে তাল করে জেনেও বিব্রত আরতি অবাক হয়ে দেখলেন উপস্থিত পরিচালক এই প্রশ্নের কোন প্রতিবাদই করলেন না। আরতি ভট্টাচার্যের মত একজন প্রতিষ্ঠিতা অভিনেত্রী এ ঘটনার জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না। স্বাভাবিকভাবেই বাংলাদেশের চিত্রসাংবাদিক জগতে গুজব রটছিল খুব। এ ঘটনার পরও আরতি ছবির কাজ শেষ করে দিতে রাজি হয়েছিলেন। কিন্তু নানা অজুহাত দেখিয়ে প্রযোজক–পরিচালক পিছিয়ে গেলেন। হঠাৎ–ই একদিন আরতি জানলেন তাঁর জায়গায় কলকাতা থেকে কাজ করতে গেছেন মিঠু মুখোপাধ্যায়।

এভাবেই চিত্রজগৎ চলছে! কলকাতা-বোম্বে-মাদ্রাজ সর্বত্রই একই চিত্র। একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি। শুধু পাত্র-পাত্রীরই যা অদল-বদল। 'অপমান আর শোষণ মেনে নিতে পারি নি বলে নায়িকা হওয়া হয়ে উঠল না' এ জাতীয় সাক্ষাৎকার ব্যর্থ নায়িকাদের মুখে প্রায়শই শোনা যায়। যে সব খোলাখুলি সাক্ষাৎকার কিছুদিন আগেও পত্রিকাগুলিতে দেখা যেত না। কারণ বোধহয় ক্রমশই মেয়েরা হয়ে উঠছেন সচেতন। আর এই সচেতনতাই অভিনেত্রীদের আরো প্রতিবাদী করে তুলবে। বিভিন্ন কারণে তাঁদের অপমানিত ব্যবহৃত করার আগে পুরুষশাসিত চিত্র জগতের মানুষজনেরা ভাবনা-চিন্তা করবেন, দু-চারবার। সচেতন, বিবেচক সবাই জানেন সেদিনেরও আর বেশি দেরি নেই।

–তপন রায়

ইসলামিকরণের পরে বাংলাদেশে হিন্দুভাগ্য

প্রেসিডেন্ট এরশাদ বাংলাদেশকে ইসলামিক রাষ্ট্র হিসাবে ঘোষণা করার পর থেকে দলে দলে হিন্দুরা ত্রিপুরা ও পশ্চিমবংগে শরণার্থী হয়ে আসছে কেন? এ বিষয়ে একটি বিশদ আলোকপাত।

অনিশ্চিত ভবিষ্যৎযাত্রা

ছবি: বিকাশ চক্রবর্তী

'আমাদের ঘর বাড়ি ওরা ভেঙে দিয়েছে। জমিজমা কেড়ে নিয়েছে। যা কিছু ছিল সবই গেছে। এখন ওখানে আমাদের থাকবার উপায় নেই। কি খাব, কি করব জানি না?' স্থান উত্তর চব্বিশ পরগনার দত্তফুলিয়ার বি·এল·ও· ক্যাম্প। সময় এগারোটা। একের পর এক নাম লেখানো চলছিল শরণার্থীদের। কয়েক হাজার ক্লান্ত, ধ্বস্ত শরণার্থীরা লাইন দিয়েছে। মায়েদের কোলে শিশু। কেউ কেউ শিশুদের পাশে বসিয়ে রেখেছে। ক্ষুধা তৃষ্ণাতে শিশুগুলির মুখ শুকনো। পরিচয় দিতেই বছর পঁয়তাল্লিশের কমলকৃষ্ণ বিশ্বাস অত্যন্ত কাতরতার সঙ্গে কথাগুলি বলতে লাগলেন। তার গলাতে রীতিমত ক্ষোভ, 'ইসলামিকরণের পর বাংলাদেশে এখন মুসলমানদের ছাড়া আর সবাই···'

ঠিক এই ধরনের অভিজ্ঞতাই লাইনে দাঁড়ানো সকল নারীপুরুষের। তাদের অভিযোগ, বাংলাদেশে এখন ভারতে পৌঁছোনোর দালালের ছড়াছড়ি। নগদ আড়াইশো তিনশো টাকার বিনিময়ে তারা সীমান্তে পৌঁছে দিচ্ছে। তারপর বি·এস· এফ আর বি ডি আর-এর চোখ এড়িয়ে (অভিযোগ তাদের প্রচ্ছন্ন মদতেও) পরোক্ষ মদতে সীমান্তে এসে পৌঁচচ্ছে, তারপর সেখান থেকে ভারতে।

একই কথার প্রতিধ্বনি করলেন ভারতীয় জনতা পার্টির রাজ্য সম্পাদক তপন শিকদার। তপনবাবুর কথাতে রীতিমত আক্ষেপ ফুটে ওঠে, 'বাংলাদেশকে ইসলামিকরণের পর হিন্দুদের অবস্থা অতীব শোচনীয়। কী ধরনের অত্যাচার চলছে, তা স্বচক্ষে না দেখলে বোঝানো যাবে না। সব কিছু নিয়েও আশ মিটছেনা। মা বোনদের ইজ্জত বলতে কিছু নেই।' বলতে বলতে উত্তেজিত হয়ে ওঠেন তপনবাবু, 'দেশ ব্যাপী আন্দোলন না হলে এই অত্যাচার থামবে না। আমরা আন্দোলন শুরু করেছি। বাংলাদেশ হাই কমিশনকে জানিয়েছি। তাদের বলেছি, সরকারি দৃষ্টিভঙ্গি না বদলালে এ দেশের হিন্দুরা অন্যরকম ভূমিকা নেবে। পরিস্থিতি আয়ত্বের বাইরে চলে গেলে রাজনৈতিক মোকাবিলা করা ছাড়া অন্য কোন পথ খোলা থাকবে না। তবে বাংলাদেশেও বিভিন্ন মহল থেকে প্রতিবাদ শুরু হয়ে গেছে। আমরাও আমাদের কর্মসূচী নিয়েছি। দেখা যাক্, কী করতে পারি।'

গত বছরের শেষাশেষি যখন বাংলাদেশকে ইসলামিকরণ করার বিষয়টি কার্যকর করার ব্যবস্থা নেওয়া হয়, তখন থেকেই বাংলাদেশের হিন্দু নাগরিকদের মধ্যে চাঞ্চল্য দেখা গিয়েছিল। এরশাদ সরকার যখন ঘোষণা করেন যে বাংলাদেশ সম্পূর্ণ ইসলামি রীতিনীতি অনুযায়ী চলবে তারপর থেকেই স্বাভাবিক কারণেই, বাংলাদেশে বসবাসকারী ১ কোটি ৭২ লক্ষ হিন্দুর নিরাপত্তার প্রশ্নটি জরুরি হয়ে ওঠে। এরশাদ নাকি এ ধরনের সিদ্ধান্ত নেন এর অনেক আগেই, ক্ষমতায় আসার অব্যবহিত পরেই। তবে কার্যকরী করতে তাঁর বেশ কিছু সময় লেগেছিল। সংবিধানের অষ্টম সংশোধনে এরশাদ স্পষ্টই ঘোষণা করেন যে এবার থেকে বাংলাদেশ ইসলামি দেশগুলির পথ অনুসরণ করবে। কি ধর্মীয় কি সামাজিক ব্যাপারে মুসলমিদের প্রাধান্য দেবার কথা ঘোষণা করে এরশাদ সংসদে যে ঘোষণা করেন তাতে সেদেশের হিন্দুরা আবার নতুন করে নিজেদের নিরাপত্তাহীন মনে করতে থাকে।

এই ঘোষণার পরই বাংলাদেশে শুধু যে হিন্দুদের মধ্যেই চাঞ্চল্য দেখা দেয় তা নয়, হিন্দু মুসলিম নির্বিশেষে প্রতিবাদও হয়। এই ঘোষণার প্রতিবাদে ১৯৮৮ সালের প্রথমদিকে বাংলাদেশের ১৪টি ছাত্র সংস্থা একটি সাংবাদিক সম্মেলন ডাকেন। এই সাংবাদিক সম্মেলনে ছাত্র সংস্থা স্পষ্টই জানান যে এরশাদের এই সিদ্ধান্ত নিতান্তই অগণতান্ত্রিক। এর ফলে এই দেশে হিন্দুদের অস্তিত্ব বিপন্ন হতে চলেছে। এই সিদ্ধান্ত রদ না করলে দেশ ব্যাপী আন্দোলন শুরু হবে। এর পরবর্তী পর্যায়ে, বাংলাদেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়–মাইনরিটি সেল ব্যাপকতর আন্দোলন শুরু করে। এর পাশাপাশি ১৪টি ছাত্র সংস্থা দেশ ব্যাপী পিকেটিং, প্রচারপত্র বিলির কাজ শুরু করে এই আন্দোলনকে জোরদার করে তুলতে থাকে। তাদের বক্তব্য, বাংলাদেশকে কোনভাবেই একনায়কতন্ত্রী ইসলামিক রাষ্ট্রের দেশগুলির মত কট্টরতায় পরিণত করা যাবে না। এই সঙ্গে আওয়ামি লীগের তরফে শেক হাসিনা ওয়াজেদ এরশাদের এই সিদ্ধান্তের সমালোচনা করে বলেন যে এরশাদ নিজের স্বেচ্ছাচার কায়েম করতে মৌলবাদীদের দাবি মেনে দেশ ইসলামিকরণ করেছেন। এর পেছনে অবশ্যই

এরশাদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করাটাই মুখ্য। নইলে যে দেশের আশি শতাংশেরও বেশি লোক ইসলাম ধর্মাবলম্বী, তাকে ঘটা করে ইসলামিক ঘোষণা করা কেন?

এবার একটু পিছিয়ে যাওয়া যাক। পূর্ব পাকিস্তান থাকাকালীন জেনারেল ইয়াহিয়া খানের আমলে বাংলাদেশের সামগ্রিক পরিস্থিতি হিন্দুদের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়। ১৯৪৭-এ ভারত পাকিস্তান ভাগের সময় দলে দলে যখন হিন্দুরা ভারতে চলে আসতে থাকে। তখন একশ্রেণীর লোক এই সুযোগ গ্রহণ করে লুঠতরাজ ও অত্যাচারে মেতে ওঠে। ফলে স্থানীয় হিন্দুদের অধিকাংশই ভারতে চলে আসে। ফলত ভারতের অর্থনীতিতে, বিশেষতঃ পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতিতে টান পড়ে।

আবার বাড়ছে শরণার্থীস্রোত

ছবি: বিকাশ চক্রবর্তী

স্বাধীনতোত্তর ভারতবর্ষে হিন্দুরা এসে পাকাপাকি বাসিন্দা হয়ে গেলেও অবশিষ্ট হিন্দুরাও একটা উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় থেকে যায়। পরবর্তী সময়ে হিন্দু-মুসলমানেরা বাংলাদেশের সামাজিক পরিস্থিতিতে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান মেনে নেয়। আনুপাতিকহারে খুব বেশি না হলেও, বেশ কিছু উচ্চপদে বিরাজ করতে থাকে হিন্দুরা। স্কুল, কলেজ, সওদাগরি অফিস, সাহিত্য, রাজনীতি, চলচ্চিত্র সর্বক্ষেত্রেই হিন্দুদের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। হিন্দুদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলিতেও হিন্দুদের সঙ্গে মুসলিমরা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির সুন্দর নিদর্শন দেখিয়েছেন।

স্বাধীন বাংলাদেশ সৃষ্টি হবার পর শেখ মুজিবর রহমানের নেতৃত্বে বাংলাদেশে ধর্ম নিরপেক্ষ আবহাওয়াই ছিল। এছাড়া যুদ্ধ, ভারতীয় বাহিনীর বিজয়—সব মিলিয়ে হিন্দু মুসলিম ঐক্য যথেষ্টভাবে লক্ষিত হয়। সুশীল মজুমদারের মতে, মুজিবর রহমানের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল খুবই স্বচ্ছ। তার আমলে বাংলাদেশের নাগরিকেরা যথার্থই এক সদ্যস্বাধীন দেশের গঠিত নাগরিক হিসেবে নিজেদের গণ্য করতে থাকে। পশ্চিম পাকিস্তানের অধিকারে অবদমিত থাকার পর বাংলাদেশের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যে বিপুল পরিবর্তন ঘটে তাতে সাম্প্রদায়িকতার সামান্যতম সম্ভবনাও মুক্ত চিন্তাধারার প্রগতিশীলতায় অপসৃত হয়ে যায়। ক্ষমতাসীন জিয়াউর রহমান বাংলাদেশকে ইসলামিকরণ করার প্রয়াস চালান।

স্বাধীনতোত্তর ভারতবর্ষে হিন্দুরা এসে পাকাপাকি বাসিন্দা হয়ে গেলেও অবশিষ্ট হিন্দুরাও একটা উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় থেকে যায়। পরবর্তী সময়ে হিন্দু-মুসলমানেরা বাংলাদেশের সামাজিক পরিস্থিতিতে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান মেনে নেয়। আনুপাতিকহারে খুব বেশি না হলেও, বেশ কিছু উচ্চপদে বিরাজ করতে থাকে হিন্দুরা। স্কুল, কলেজ, সওদাগরি অফিস, সাহিত্য, রাজনীতি, চলচ্চিত্র সর্বক্ষেত্রেই হিন্দুদের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।

প্রেসিডেন্ট এরশাদ : বাংলাদেশের ইসলামীকরণে খুশী অতঃপর

মুজিব নিহত হবার পর বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে যথেষ্ট পরিবর্তন ঘটে। জিয়া চেয়েছিলেন, নিজের সামরিক শাসনকে মৌলবাদের সহায়তায় মজবুত করতে। এই চিন্তাভাবনাকে জিয়া বাস্তবায়িত করতে পারেন নি। তার আগেই সামরিক অভ্যুত্থানে তাঁর মৃত্যু ঘটে। ক্ষমতাতে আসেন জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ। এরশাদের জঙ্গী সরকার প্রথমদিকে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে যে কোনও বিরোধী অস্তিত্বের প্রতিই সমান ছিল। পরের দিকে অবশ্য দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনতার আত্মিক ও রাজনৈতিক সমর্থন আদায়ে তিনি উদ্যোগী হন। আর দেশকে ইসলামিক ঘোষণা করানোর পেছনে অতঃপর রয়েছে মুসলিম মৌলবাদীদের হাত। বাংলাদেশের আওয়ামী লীগের নেতা সুজিৎ গুহ জানালেন, 'বাংলাদেশের বর্তমান সরকার চালাচ্ছে মৌলবাদী শক্তিরা। সরকারের কণ্ঠস্বর বলতে তারাই।

তারা যা চাইছে, তাই করছে সরকার। এরশাদ তাদের হাতে ক্রীড়নক মাত্র। বাংলাদেশকে চালাচ্ছে মূলতঃ এখন মৌলবাদীরাই। সব মিলিয়ে এই মুহূর্তে হিন্দু তথা সংখ্যালঘুরা বিপন্ন। এই কাতরোক্তি সুজিৎবাবুর।

বর্তমান মুহূর্তে ব্যাপক হারে হিন্দু নির্যাতন চলছে বলে ওপার থেকে আসা অনেকেই জানালেন। পুলিশেরা হিন্দুদের ওপর সুযোগ পেলেই অত্যাচার চালাচ্ছে। অনেকক্ষেত্রেই তারা নাকি বলছে হয় টাকা দাও নইলে তোমাদের নামে কেস দেব। গত ১৪ নভেম্বর ভারতীয় জনতাপার্টির পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক তপন শিকদার সাংবাদিক সম্মেলনে

ছবি: এ কে এম মহসিন

হাসিনা ওয়াজেদ : বিরোধী দলের নেত্রী

নেপাল
ভুটান
আসাম
আগরতলা
বিলোনিয়া
বাংলাদেশ
পশ্চিমবঙ্গ
হরিদাসপুর সীমান্ত
কলকাতা

বললেন, 'এই মুহূর্তে ভারত সরকার কোন ব্যবস্থা না নিলে বাংলাদেশে হিন্দুদের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়বে।'

ইতিমধ্যে সার্কাস অ্যাভিনিউ-এ বাংলাদেশ ডেপুটি হাইকমিশনের সামনে ভারতীয় জনতা পার্টি একটি বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। হাই কমিশনারকে একটি স্মারকপত্র দেওয়া হয়। ভারতীয় জনতা পার্টির বক্তব্য অনুযায়ী, অবিলম্বে বাংলাদেশ সরকারকে এই ঘোষণা রদ করতে হবে। নচেৎ তাদের আন্দোলন অব্যাহত থাকবে?

এরশাদের এই ইসলামিকরণের পেছনে ধর্ম সম্বন্ধে শ্রদ্ধার চেয়ে বেশি রয়েছে অন্যতর চিন্তাভাবনা। এ মন্তব্য বাংলাদেশরই জনৈক বিরোধী নেতার যিনি নিজে মুসলমান। তাঁর মতে, এরশাদ যদি বাস্তবিকই দেশ শাসন করতে চায় তাহলে সংখ্যাগুরু মুসলমানদের হাতে রাখতেই হবে। দেশে অশিক্ষা-অজ্ঞতা যথেষ্ট। নিজেকে ধর্মের ত্রাণকর্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারলে আখেরে লাভ অনেক, এছাড়া পেট্রোডলারের প্রাপ্তি সম্ভাবনা তো আছেই। ইতিমধ্যেই, এরশাদের জঙ্গী শাসনের ফাঁকফোকর গলে বিরোধী শক্তি বাহুবিস্তার করেছে, প্রগতিশীল জনতা স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে একজোট, তাতে হিন্দু মুসলমানের কোনও ভেদাভেদ নেই। এক্ষেত্রে একটা সূক্ষ্ম ভেদ সৃষ্টি করে রাখাটা এরশাদের পক্ষে উপযোগী।

বাংলাদেশে এরশাদের শাসনের শক্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে তাই এই মৌলবাদী শক্তি। প্রকারান্তরে তারাই আইন প্রণয়ন ও নিরূপণ করেন। বাঙালি হিসেবে কোনও জাতির পরিচয় বিধৃত হওয়ার চেয়ে এরা নাকি ইসলামিক আন্তর্জাতিকতায়ই অতিশয় বিশ্বাসী। এদেরই এক অংশ সম্ভবত আয়ুব খানের উর্দু চাপিয়ে দেওয়াকেই মেনে নিয়েছিলেন। জানালেন যতদিন না এরশাদের দৃষ্টিভঙ্গির বদল হবে, ততদিন বাংলাদেশে হিন্দুদের অস্তিত্ব বিপন্ন হতে থাকবে। ইতিমধ্যে তারা কেন্দ্রীয় সরকারকে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে বলেছেন। যদিও এখনো তেমন কোন ব্যবস্থা নিতে দেখা যায়নি।

এ রাজ্যের পার্শ্ববর্তী জেলাগুলির সরকারি প্রশাসন অবশ্য এই শরণার্থী অনুপ্রবেশের কথা অস্বীকার করেছেন। কিন্তু প্রতিবেদকেরা অভিযোগ পেয়েছেন ত্রিপুরা, পশ্চিমবঙ্গের বনগাঁ, নদীয়া, উত্তর চব্বিশ পরগনা থেকে শয়ে শয়ে শরণার্থী বি এস এফ ও বাংলাদেশ রাইফেলস-এর পরোক্ষ মদতে ভারতে ঢুকছেন। হাকিমপুর, চুরাটিয়া, বাগদা সীমান্ত এলাকা থেকে দলে দলে হিন্দুরা আসছে ভারতে। বি·এল·ও· ইতিমধ্যেই কয়েকটি স্থানে শিবির খুলেছেন। এর আঞ্চলিক সভাপতি বলরাম বকসি এই প্রতিবেদকদের বলেছেন, তিন লক্ষেরও বেশি শরণার্থী তাঁদের খাতাতে নাম রেজিস্ট্রি করেছে। স্থানীয় নিরোদচন্দ্র বালার বাড়িতে অবস্থিত রেজিস্ট্রি অফিসে কয়েক লক্ষ শরণার্থী নাকি নিজেদের নাম নথিভুক্ত করেছে। এই সব শরণার্থীরা অভুক্ত অবস্থাতে তিনদিন/চারদিন হেঁটে এখানে এসে পৌঁছেছেন। একটি শিবিরে গিয়ে দেখা গেল বিশাল লাইন পড়েছে সেখানে। একে একে নাম লেখানো চলছে। বিশাল সেই লাইনে দাঁড়ানো অনেকেই বললেন প্রতিবেদককে 'বাংলাদেশে ওরা আমাদের মারধোর করছে। জমিজমা থেকে উচ্ছেদ করেছে। 'আমাগো অবস্থা কী কী কইর‍্যাকমু।' এই কাতরোক্তি রণজিৎ বিশ্বাসের স্ত্রীর। আরেকজন জানালেন, 'ওখানে মেয়ে বউদের সম্মান বলতে কিছু নেই। বে আইনি ভাবে জমিজমা দখল করে তারা লুঠপাঠ শুরু করেছে। এ অবস্থা বেশিদিন চললে কী হবে তা বলা যাবে না।'

বাংলাদেশে ইসলামিকরণের বিষয়ে সোচ্চার হয়ে উঠেছেন আওয়ামী নেতারা। শেখ হাসিনা জানিয়েছেন, এরশাদের আমলে বিশ্বের দরবারে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হতে চলেছে। এ অবস্থার অবসান ঘটানো দরকার। অন্যদিকে নেত্রী খালেদাজিয়ার মহলেরও একই রকম প্রতিক্রিয়া। খালেদা জিয়ার ঘনিষ্ঠ এক ব্যক্তি বলেছেন, ইসলামী মৌলবাদী শক্তির কাছে আত্মসমর্পণের ফলে বাংলাদেশ মোটামুটি পাকিস্তানেরই পরিকল্পনার সামিল হয়েছে। বাংলাদেশের মুক্তি যুদ্ধে হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে লড়েছে। কি রকম রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা এসেছিল!···

উত্তর চব্বিশ পরগনার ওই বি এল ওর রেজেস্ট্রি অফিসে বার কয়েক এসেছেন ডি·আই·ডি· ট্রাের অফিসার অসিত চৌধুরী। দত্ত ফুলিয়ার রেজিস্ট্রি অফিসের নীরোদ বালা জানালেন, 'গত ১২ তারিখে ওরা এসে বলে গেছেন সমস্ত শরণার্থীদের তাঁদের হাতে দিয়ে দিতে। তাঁরা বাংলাদেশে পুশব্যাক করবেন।' এসেছিলেন বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সের ইন্‌সপেকটর মলয় কুমার রায়। তিনিও নাকি একই কথা বলেছেন। কিন্তু তাতে কি শরণার্থীদের নিরাপত্তা স্থাপিত হবে? বাস্তবিক, তাদের আবার পুশব্যাক করা হলে আবার তো তারা সেই একই পরিস্থিতির সম্মুখীন হবেন! সেক্ষেত্রে তাদের নৈতিক ও সম্ভাব্য পরবর্তী ঘটনার দায় কে নেবে?

মণিশংকর দেবনাথ ও গুরুপ্রসাদ মহান্তি

ব্যুরো রিপোর্টের সহযোগিতায়
ছবি: বিকাশ চক্রবর্তী

ইস্পাতকঠিন আত্মবিশ্বাস :

সমীর, ইলেকট্রনিক হাত লাগাবার পর

স্ত্রী শিপ্রার সঙ্গে সমীর

আট বছর বয়সে এক দুর্ঘটনায় সমীরের দুটো হাতই কেটে বাদ দিতে হয়েছিল। কিন্তু একটি মানুষের সাফল্যের পিছনে তার হাতই কি সব? বোধহয় নয়। ধীরে ধীরে সমীরের মধ্যে দেখা দেয় এক তীব্র আত্মবিশ্বাস। এবং এই ইস্পাত কঠিন আত্মবিশ্বাসই তাকে আজ পৌঁছে দিয়েছে জীবনযুদ্ধের বাঞ্ছিত সাফল্য-ভূমিতে।

সমীরের জন্ম ১৯৬০ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি। বাবার নাম সুনীলকুমার ঘোষ। রেলে চাকরি করতেন বিলাসপুরে। সমীরের জন্মও বিলাসপুরে। শৈশবে সমীরকে দেখে বোঝা গিয়েছিল, ছেলেটি ভীষণ বুদ্ধিমান হবে।

আট বছর বয়সে সমীরের একটা দুর্ঘটনা ঘটে। তারিখটা ছিল ১৯৬৮ সালে ৪ মে। তার বাবা সবে ডিউটি থেকে বাড়ি ফিরেছেন। মা, বাবার জন্য চা, জল খাবার নিয়ে সামান্য ব্যস্ত। সমীর বাইরে খেলতে যাবার জন্য ছটফট করছে, কিন্তু মা দরজা বন্ধ করে রেখেছেন। একটা তারের টুকরো দিয়ে বাইরের দরজার ছিটকিনি খুলে মায়ের অন্যমনস্কতার সুযোগে সমীর একছুটে বাইরে চলে গেল। কোয়ার্টারের কাছেই রেলের ইলেকট্রিক সাব স্টেশন, সেখানে ট্রান্সফর্মারে ১১০০০ ভোল্টের বিদ্যুৎপ্রবাহ। সমীর সেখানে ঢুকে পড়ে এবং দুর্ভাগ্যবশত ওখানে কেউ ছিল না তখন। সমীর সব তারগুলি ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখছিল। হঠাৎই একটা জায়গায় তার হাত দুটো যেন আটকে যায়, তীব্র চীৎকার করেই ছেলেটি জ্ঞান হারায়।

পাশ দিয়েই স্কুটার চালিয়ে যাচ্ছিলেন জনৈক ডঃ সন্ধু। তিনি সমীরদের পরিবারের পরিচিত। চীৎকারটা তার কানে যায়, তিনি সঙ্গে সঙ্গে স্কুটার থামিয়ে ভিতরে ঢুকে সমীরকে ঐ অবস্থায় দেখতে পান। এবং এক মুহূর্ত দেরি না করে পড়ে থাকা একটি বাঁশের লাঠি দিয়ে সমীরের হাত দুটো ছাড়িয়ে নিয়ে হাসপাতাল ছুটলেন। সমীরের বাবা-মা'র কাছে খবর গেল। পুরো পরিবারে শোকের ছায়া নেমে এল।

দ্বিতীয়দিন সমীরের জ্ঞান ফিরে এল। তার সারা শরীর ঝলসে গেছে। হাত দুটো কালো কাষ্ঠখণ্ডের মত পড়ে আছে, সেগুলো সে নাড়াতেও পারছিল না। চিকিৎসারত ডাক্তার মিঃ কোহলি সমীরকে কলকাতা নিয়ে যেতে পরামর্শ দিলেন, কিন্তু সুনীলবাবু দরিদ্রমানুষ, তার পক্ষে হট করে কলকাতায় ছেলেকে নিয়ে এসে চিকিৎসা করানো সে মুহূর্তে সম্ভব ছিল না। এদিকে তৃতীয়দিন সমীরের অবস্থার এত অবনতি ঘটল যে তাকে স্থানান্তরিত করাই অসম্ভব হয়ে পড়ল প্রায়। তার হাত দুটি পচতে শুরু করেছিল। এবং শেষপর্যন্ত হাতদুটি কাঁধ থেকে কেটে ফেলা ছাড়া কোনো উপায় রইল না।

বেশ কয়েকদিন সমীরকে জানতে দেওয়া হয়নি যে তার দুটো হাতই নেই। কিন্তু একদিন সে সব বুঝতে পারল। আড়াইমাস সে হাসপাতালে ছিল। এক লেডি ডাক্তার তাকে পা দিয়ে লেখার জন্য নিয়মিত অভ্যাসের পরামর্শ দিয়েছিলেন। এমনকি, সমীর গভীর বেদনার সঙ্গে সেই অল্প বয়সেই অনুভব করেছিল, সারাজীবন তাকে পা দিয়েই সব কাজ করতে হবে। বাড়ি ফিরে এসে বারংবার চেষ্টা এবং প্রচণ্ড জেদের সঙ্গে সে শুরু করল পা দিয়ে লেখার অভ্যাস। অবশেষে, প্রত্যেকটি অক্ষর সে লিখতে সক্ষম হল একদিন। সেদিন, বাস্তবিকই তার আত্মবিশ্বাস বেড়ে গিয়েছিল অনেকটাই।

দুর্ঘটনার আগে সমীর ২য় শ্রেণী পাশ করে গিয়েছিল, ফলে এবার তাকে ভর্তি করা হল ৩য় শ্রেণীতে। তার হাত নেই দেখে তাকে সমবয়সী দু'একজন সহপাঠী ঠাট্টাও করত, কিন্তু মাস্টার মশাইদের ভালবাসা সে পেয়েছিল। '৬৮ সালের ১১ সেপ্টেম্বর তাকে স্কুলে ভর্তি করা হয়, তার মাত্র চারদিন পরই হাফইয়ার্লি পরীক্ষা। সে পরীক্ষায় সমীর একাদশ স্থান পেল এবং এপ্রিলের বার্ষিক পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে সকলকে চমকে দিল।

৪র্থ শ্রেণীতে উঠে সমীর বার্ষিক পরীক্ষা দিতে পারল না, কেননা, সেসময় তাকে পুণেতে যেতে হল কৃত্রিম হাত লাগানোর ব্যাপারে। কিন্তু এই কৃত্রিম হাতগুলি তার কাজে লাগল না। ওগুলি ছিল বড্ড ভারি আর হাতের কিছুটা অংশ না থাকলে ওগুলো ব্যবহার করা মুস্কিল, কিন্তু সমীরের দুটো হাতই কাটা হয়েছিল একেবারে কাঁধ থেকে। যাইহোক, বার্ষিক পরীক্ষা না দিলেও ওর হাফইয়ার্লির ফল

দেখেই ওকে ৫ম শ্রেণীতে তুলে নেওয়া হল। বোর্ডের পরীক্ষায় সমীর পুরো বিলাসপুর ডিভিসনে ৫ম স্থান পেল এবং স্কলারশিপও পেতে থাকল।

সমীরের ইচ্ছে ছিল সায়েন্স নিয়ে পড়াশোনা করার। কিন্তু শারীরিক ত্রুটির জন্য স্কুল সে অনুমতি দিল না, তখন চুপিচুপি সমীর তৎকালীন রাষ্ট্রপতি ভি·ভি· গিরিকে চিঠি লিখল একখানা। রাষ্ট্রপতির নির্দেশমত তার কাছে শিক্ষাবিভাগ থেকে চিঠির উত্তর এল, তাকে দিল্লির রামযশ এইচ·এস· স্কুলে সায়েন্স গ্রুপে ভর্তি হবার জন্য অনুরোধ জানান হচ্ছে।

কিন্তু সমীর ততদিনে আর্টস নিয়ে পড়তে শুরু করে দিয়েছে, তাই ওই সুযোগটা সে নিতে পারল না। টেন ক্লাসে পড়তে পড়তে সমীরের বাবা সুনীল কুমার ঘোষ হঠাৎ মারা গেলেন। একেই দরিদ্র পরিবার, তার ওপর উপার্জনক্ষম কেউ নেই, ওরা সবাই পড়ল ভীষণ সংকটে। সমীরের বড়দা তখন বি·এস·সি· পড়ছে। সে বাবার চাকরিটা নিয়ে সংসারটা চালাতে থাকে কোনরকমে।

১৯৭০ সালে ব্লিৎস তথা আরো পত্রপত্রিকায় সমীর চিঠি লিখে আবেদন জানাল, লণ্ডনে গিয়ে সে ইলেক্ট্রিক হাত লাগাতে চায়, অর্থসাহায্য প্রয়োজন। তাতে প্রচুর সাড়াও পেল। রেলের প্রোজেক্ট অ্যাণ্ড ডেভলেপমেণ্ট বিভাগের চীফ ইঞ্জিনিয়ার মিঃ পরিমল মুখার্জী ১৯৬১ সালে অফিসের কাজে লণ্ডনে গিয়েছিলেন, তিনি সমীরকে এ ব্যাপারে সব খোঁজখবর দিলেন এবং নানাভাবে সাহায্যের প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিলেন।

সমীর কেন্দ্রিয় সরকারকে চিঠি লিখল। প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর নির্দেশমত মধ্যপ্রদেশের স্বাস্থ্যমন্ত্রক বিলাসপুরের কালেকটরকে একটা চিঠি দেন। কালেকটর থেকে মধ্যপ্রদেশ সরকারকে সমীরের জন্য ১০,০০০ টাকা সাহায্যের প্রস্তাব পাঠানো হয়। মধ্যপ্রদেশ সরকার প্রস্তাবটি খারিজ করে দেন।

সমীর এবার কেন্দ্রিয় সরকারের স্বাস্থ্যদপ্তরে চিঠি পাঠাল। স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডাঃ কর্ণ সিংহের নির্দেশমত সমীরকে এবার ৩০০০ টাকা সাহায্য দেওয়া হল। কিন্তু শর্ত ছিল, ভবিষ্যতে সে আর কোনো আর্থিক সাহায্যের জন্য আবেদন জানাবে না। শ্রীযুক্ত পরিমল মুখার্জীর আন্তরিক সহযোগিতা ও প্রচেষ্টায় শেষপর্যন্ত সমীর ২২ আগস্ট ১৯৭৭ লণ্ডন রওনা হয়ে গেল।

হিথরো বিমানবন্দরে তাকে নিতে এসেছিলেন ভারতীয় বিজ্ঞানী ডাঃ এস·এন· মহাপাত্র। তিনি সমীরকে ট্রেনে নিয়ে গেলেন এডিনবরায়। এডিনবরা রেলস্টেশনে সমীরকে নিতে এসেছিলেন স্বয়ং ডঃ টম ডিক। ইনি প্রিন্সেস মার্গারেট রোজ অর্থোপেডিক হসপিটালের ডিরেকটর।

এই হাসপাতালে সমীর ছিল সাত সপ্তাহ। ওখানের লোকজনের কাছে সে অগাধ স্নেহ ভালবাসা পায়। ভারতবর্ষে ফিরে আসার সময় দামী দামী উপহারে তার ছোট্ট ঘরটা ভরে গিয়েছিল। ইলেকট্রনিক হাতের উদ্ভাবক প্রোফেসর ডি·সি· সিমসন নিজে সমীরকে টেলিফোন করে বলেছিলেন, 'সমীর, তোমার মত প্রবল আত্মবিশ্বাসী ছেলের সঙ্গে মুখোমুখি দেখা হল না বলে আমি সত্যিই দুঃখ পাচ্ছি। আমি বড্ড ব্যস্ত জীবনযাপন করি, আমাকে ক্ষমা কোরো। তুমি এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে চাও শুনে খুব খুশি হয়েছি। এখানে সবসময়েই তুমি স্বাগত।'

৫ অকটোবর '৭৭ সমীর দমদমে নেমে বিলাসপুরে ফিরে গেল। বিমানবন্দরে তাকে নিতে এসেছিলেন পরমহিতৈষী শ্রী পরিমল মুখার্জী।

ইলেকট্রনিক হাত দুটো সমীরকে ব্রিটিশ সরকার বিনামূল্যে দিয়েছিলেন। এছাড়া খরচ হয়েছিল চল্লিশ হাজার টাকা। কলকাতা এবং বিলাসপুরের লায়ন্স ক্লাব ও ব্লিৎস পত্রিকার সৌজন্যে জনগণের আর্থিক সাহায্য সমীরকে ঐ টাকা সংগ্রহ করে দেয়।

ইলেকট্রনিক হাত লাগানোর ফলে সমীরের সব সমস্যার সমাধান হয়ে যায়নি। ওগুলির অনেক রকম যান্ত্রিক অসুবিধে রয়েছে। ঐ হাতগুলি চলত গ্যাস সিলিণ্ডারের সাহায্যে। গ্যাস ফুরিয়ে গেলে ভর্তি করা, হাতের সুইচ বন্ধ করা বা খোলা—এসব ব্যাপারে অন্য লোকের সাহায্য প্রয়োজন ছিল। ফলে, সমীর দেখল, আগের মত পা দুটোই তার বেশি নির্ভরযোগ্য। পায়ের সাহায্যে সমীর সব কাজ করত। বইয়ের পাতা ওল্টানো, লেখা, কাপড় কাচা, কাপড়চোপড় ইস্ত্রি করা, চান করা, খাওয়া, চা খাওয়া, পেন্সিল ছোলা, রেডিও চালানো, স্টোভ জ্বালানো, টেপরেকর্ডার বাজানো, বিছানা পাতা, ছবি আঁকা—এসব কাজ পা দিয়ে করাটা তার কাছে ভালরকম অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল।

লণ্ডন থেকে ফিরে এসে সমীর হায়ার সেকেণ্ডারি পাশ করে। তারপর সি·এম·ডি· কলেজ থেকে অঙ্ক, ভুগোল, ইংরেজি ও ফিলসফি নিয়ে বি·এ· পাশ করে। তারপর বোম্বাইস্থিত টাটা ইনস্টিটুট অফ সোসাল সায়েন্স—এ স্নাতকোত্তর অধ্যয়নের জন্য ভর্তি হল। ১৯৮২-৮৩ সালে পরীক্ষাফলের ভিত্তিতে সমীরকে টাটা ইনস্টিটিউটের শ্রেষ্ঠ ছাত্র বলে ঘোষণা করা হয়। এসময় তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী অর্জুন সিংহের সম্মতিক্রমে চারশত টাকার স্কলারশিপ দেওয়া হতে থাকে প্রতিমাসে।

সমীর-শিপ্রা, পরিবার বর্গের সঙ্গে

বোম্বাইতে ইউ·এন·ও· পরিচালিত ইণ্টারন্যাশনাল কাউন্সিল অফ সোস্যাল ওয়ার্ক প্রতিষ্ঠানে সমীর চাকরি নিয়ে লণ্ডনের স্কুল অফ ইকনমিকসে সোস্যাল প্লান নিয়ে পড়বার জন্য আবেদন পাঠালো। এসময় শিপ্রা নামে একটি মেয়ের সঙ্গে সমীরের আলাপ হয়। শিপ্রাও টাটা ইনসটিটিউট ট্রেনিং-এর জন্য পড়াশোনা করছিল। শিপ্রার বাবা একটি কলেজের অধ্যক্ষ, দাদা ইঞ্জিনিয়ার। একদিন শিপ্রা সিদ্ধান্ত নেয়, সে সমীরকেই বিয়ে করবে। দুজনে বিয়েও করে ফেলে।

এরপর লণ্ডন স্কুল অফ ইকনমিকসে পড়বার সুযোগ পেয়ে সমীর ঠিক করল লণ্ডনে চলে যাবে। এজন্য সে নিল ২৫০০০ টাকা লোন এবং মধ্যপ্রদেশ সরকারও তাকে ৬০,০০০ টাকার একটা স্কলারশিপ দিলেন।

স্ত্রী শিপ্রা কে নিয়ে সমীর এখন লণ্ডনে রয়েছে। তার জীবনকাহিনী অনেককে প্রেরণা যোগাবে। চেষ্টা, পরিশ্রম এবং আন্তরিকতার কোনো বিকল্প নেই, সমীরই তার জ্বলন্ত প্রমাণ।

"সস্তা বলেই আপনি, যত আজেবাজে স্টীলের আলমারীর পেছনে কেন দৌড়বেন... আর, তারপর তার, একেবারে বাজে কারিগরী, মরচে ধরা আর পেন্ট-এর চটা ওঠা এসব দেখে মাথা চাপড়াতে থাকবেন?"

তাই, নিয়ে আসুন একটা গোদরেজ স্টোরওয়েল

কারণ, গোদরেজ স্টোরওয়েল-এ এমন কতগুলি দারুন বিশেষত্ব থাকে, যার মোকাবিলা করা অন্য কোনো স্টীলের আলমারীর কর্ম নয়।

এ সেরামানের স্টীল ও অনন্য নির্মাণ-পদ্ধতি দিয়ে তৈরী হয়। এর জোড় বিহীন মেশিনের নির্মাণ, পোকামাকড় থেকে সুরক্ষিত রাখে। সম্পূর্ণ মরচে ধরা প্রতিরোধকারী ব্যবস্থা থাকার দরুন পাওয়া যায়, মরচেধরা প্রতিরোধকারী ক্ষমতা। বিশেষ ওভেন-বেক্ড অ্যালকাইড অ্যামিনো পেন্ট, দেয় বছরের পর বছর টেঁকে এমন আঁচড়লাগা প্রতিরোধক ফিনিশ।

ওছাড়াও, ৩-ওয়ে ভোল্টিং পদ্ধতির সঙ্গে সঙ্গে থাকে, সহজে খোলা যায়না এমন ৬-লীভার গোদরেজ তালা, যা সাধারণ-কাঠের বা স্টীলের আলমারীতে দেখাই যায় না।

গোদরেজ স্টোরওয়েল রঙ বা মডেলের দিক দিয়ে এমন বিস্তৃত শ্রেণীতে পাওয়া যায় যা, অন্য স্টীলের অলমারীতে একেবারেই অসাধারণ ব্যাপার। না ঢিলে-ঢলঢলে কব্জা, না চটা-ওঠা পেন্ট আর না বেশীদিন না টেঁকে এমন মরচে ধরা।

তাই বলছি, দামটি সস্তা দেখে, পরে আবার মুস্কিল বাধিয়ে বসবেন না। আজই গোদরেজ স্টোরওয়েল নিয়ে আসুন।

গোদরেজ স্টোরওয়েল—আপনার পয়সার পুরোপুরি মূল্য উসুল করে।

ULKA-GB-21-88 BEN

রাজীব গান্ধী: উত্তরপ্রদেশে কঠিন পরীক্ষা?

উত্তরপ্রদেশ কি রাজীব গান্ধীর ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করবে?

ভারতের ছজন প্রধানমন্ত্রী দিয়েছে যে রাজ্য সেই হিন্দি বলয়ের রাজনৈতিক প্রাণকেন্দ্র উত্তরপ্রদেশে এবার রাজীবের অবস্থা কেমন? বিরোধীদের তোড়জোড়ের বিরুদ্ধে কংগ্রেসী পক্ষের দুর্গরক্ষকদের প্রস্তুতির হাল হকিকৎ নিয়ে একটি বিশ্লেষণী প্রতিবেদন।

উত্তরপ্রদেশের দুই কর্ণধার: মুখ্যমন্ত্রী এন ডি তেওয়ারী ও কংগ্রেস সভাপতি বলরাম সিংহ যাদব

ছবি: রাজেন্দ্র কুমার

উত্তর প্রদেশ ভারতের এমন একটি রাজ্য যার ওপর নির্ভর করে দিল্লির সিংহাসন। সে কারণেই রাজীবের ভবিষ্যৎ–এর ওপর নির্ভরশীল। উত্তরপ্রদেশ লোকসভার ৮৫টি অর্থাৎ সর্বাধিক আসন বলেই নয়, হিন্দিভাষী এলাকার ২৫০টি লোকসভা সিটের হার-জিত নির্ধারণ করে এই রাজ্য। ভারতের মোট সাতজন প্রধানমন্ত্রীর ছজনই এই রাজ্য থেকে উঠে এসেছেন, তাঁদের মধ্যে চৌধুরী চরণ সিং ছাড়া বাকি চারজনই আবার কংগ্রেসের। চৌধুরী চরণ সিং যদিও জনতা সরকারের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তবুও তাঁর রাজনৈতিক জীবন শুরু হয় কংগ্রেসেই। সে কারণেই ধারাবাহিকভাবে উত্তরপ্রদেশ কেবল কংগ্রেসের মজবুত ঘাঁটি নয়, বিপক্ষ রাজনীতিরও কর্মস্থল। রাজীব গান্ধী, ভি·পি· সিংহ, অরুণ নেহেরু, চন্দ্রশেখর, হেমবতী নন্দন বহুগুণা, চন্দ্রজিৎ যাদব, অটলবিহারী বাজপেয়ী, কে·সি· পন্থ, অজিত সিং, এন·ডি· তিওয়ারি এবং বীর বাহাদুর সিং প্রমুখ বহু প্রভাবশালী নেতারা উত্তরপ্রদেশ থেকেই রাজনীতির রাষ্ট্রীয় মঞ্চে এসেছেন। স্বাভাবিক কারণেই পক্ষ-বিপক্ষ রাজনীতির সকল নেতারা স্বীকার করেন উত্তরপ্রদেশই দিল্লি দখলের একমাত্র লঞ্চিং প্যাড তথা প্ল্যাটফর্ম। আর এই প্ল্যাটফর্ম দখল করতে পারলে রাজীব গান্ধীকে উৎখাত করা সম্ভব। বিপক্ষের পার্টিগুলির এখানে একজোট হওয়ার চেষ্টা সে কারণেই। নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখার যুদ্ধে রাজীবও পিছিয়ে নেই। বিরোধী দলগুলির সক্রিয়তা দেখেই তিনি নারায়ণ দত্ত তিওয়ারিকে নিয়ে এলেন বীর বাহাদুরের জায়গায়। মুখ্যমন্ত্রীর পদে। শুরু করেন নির্বাচন লড়াইয়ের শঙ্খনাদ। আর সেইসঙ্গে বীর বাহাদুরকে সরিয়ে এন·ডি· তিওয়ারিকে আনার ফলে প্রমাণও হয় উত্তরপ্রদেশে রাজীব হাওয়ার সেই দিন আর নেই। আবার বীর বাহাদুরের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ বক্তব্যে, আগামী লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেস (ই)–র সেই অবস্থা আঁচ করা যায়। বীর বাহাদুর বলেছেন, 'উত্তরপ্রদেশকে সমস্যামুক্ত করে যাচ্ছি। আবার

যদি সমস্যা দেখা দেয় হাইকমাণ্ডের নির্দেশে তা সমাধান করতে প্রস্তুত।' অবশ্য কংগ্রেস (ই)–র অনেক নেতাই বীর বাহাদুরের এই বক্তব্যের ওপর এক হাত নিয়েছেন, কেউ এই বক্তব্যের ওপর টিপ্পনিও কেটেছেন, 'বীর বাহাদুর এখন তাঁর নিজের গদি সামলাতেই ব্যস্ত, আগামী লোকসভায় কংগ্রেস (ই)–র প্রাদুর্ভাব বজায় রাখার ক্ষমতা তাঁর নেই।'

আমরা দেখব বীর বাহাদুর সরকারের আমলে কংগ্রেস (ই)–র সেই সম্ভাবনা কতটুকু ছিল। দেখা বাহাদুরের ক্ষেত্রে এই একটা উদাহরণই যথেষ্ট নয়। প্রশ্ন অবশ্যই আসে বীর বাহাদুরের দ্বিতীয় নির্বাচন পরীক্ষা হয় মার্চ '৮৭তে। তিনটি বিধানসভা ও একটি লোকসভা–র নির্বাচনকে কেন্দ্র করে। এতে কাশীপুর বিধানসভা কেন্দ্রের কংগ্রেস প্রার্থীর পরাজয় হরিদ্বার লোকসভা এবং রাঠ ও পট্টি বিধানসভা–র জয়কে ম্লান করে দেয়। মাত্র দু'বছর আগেই এই কাশীপুর থেকে বিধানসভা নির্বাচনে জিতেছিলেন স্বয়ং নারায়ণ দত্ত তিওয়ারি। ওখান থেকে বীর বাহাদুর সরকারের মন্ত্রী অম্মার

পূর্বতন মুখ্যমন্ত্রী বীরবাহাদুর সিংহ: উত্তরপ্রদেশে আবার সক্রিয়! ছবি: মনমোহন শর্মা

গেছে বন্যা, শতাব্দীর ভয়ংকরতম খরা, অধ্যাপক ও রাজ্য কর্মচারীদের ধর্মঘট, বিদ্যুৎ সংকট, রাম জন্মভূমি বিবাদ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, টিকৈতের কিষাণ আন্দোলন প্রভৃতি একসঙ্গে জড় হওয়ায় উত্তরপ্রদেশকে ভয়ংকর অস্থিরতার মধ্যে নিয়ে গেলেও দীর্ঘ ১০০৫ দিন তাঁর গদি অটুট রাখতে পেরেছিলেন। এবং এই রেকর্ড একমাত্র গোবিন্দ বল্লভ পন্থের পর তাঁর ঝুলিতে।

বীর বাহাদুর এখনও উত্তরপ্রদেশকে সমস্যা মুক্ত করার দাবি করেন, কিন্তু কংগ্রেস (ই) নেতাদের লক্ষ্য তাঁর নির্বাচন জেতানোর ক্ষমতার ওপর। বীর বাহাদুর মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার তিন মাস পর ডিসেম্বর'৮৫–তে বিজনৌর লোকসভার উপ-নির্বাচন হয়। নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জগজীবন রামের মেয়ে শ্রীমতী মীরাকুমারী স্বয়ং নেমেছিলেন ময়দানে। এর একবছর আগে ডিসেম্বর '৮৪তে এক লাখ ভোটের ব্যবধানে জিতেছিলেন তিনি। এক বছর বাদে বীর বাহাদুরের প্রচেষ্টায় মীরাকুমারী জেতেন মাত্র পাঁচ হাজার ভোটে। কিন্তু বীর রিজবীকে নামানো হয়েছিল। তিওয়ারিও কাশীপুরে ভোটের জন্য ব্যাপক প্রচার চালিয়েছিলেন। হারের দায় অবশ্য বীর বাহাদুর চাপিয়েছিলেন তিওয়ারি ও তাঁর প্রিয়পাত্র সংসদ সদস্য সত্যেন্দ্র চন্দ্র গুড়িয়ার ওপর। এতে বীর বাহাদুরের রাজনৈতিক স্বপ্নের সূত্রপাত ঘটে। বলা বাহুল্য, ১৯৮৫–র আগে বীর বাহাদুর তিওয়ারি সরকারের সেচ উদ্যোগ মন্ত্রী ছিলেন। কিন্তু ৮৫–র পরেই তিওয়ারি তাঁর ওই ক্ষমতা ছিনিয়ে নেন। এতেই শুরু হয় দু'জনের মধ্যে রেষারেষি দ্বন্দ্ব। তিওয়ারি কেন্দ্রে চলে যাওয়ার পর বরেলী এবং মুরাদাবাদ–এ কেন্দ্রীয় পরিযোজনার রূপায়ণের সভায় বীর বাহাদুরকে আমন্ত্রণ না জানানোয় সেই রেষারেষির মাত্রা আরও প্রকট হয়। যাইহোক, ২০ ফেব্রুয়ারি '৮৮, লক্ষ্ণৌ–এ আয়োজিত অভূতপূর্ব কিষাণসভায় যে রাজীব গান্ধী বীর বাহাদুরের নেতৃত্ব এবং তাঁর সরকারের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন, জুন '৮৮তে এলাহাবাদ, টাণ্ডা, ছাপরৌলি–এই তিন লোকসভা আসনে উপ নির্বাচনের পর সেই

বিশ্বনাথ সিংহ: রাজীবের প্রবলতম প্রতিদ্বন্দ্বী!

রাজীবই মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে বীর বাহাদুরকে সরিয়ে দেওয়ার অন্তিম সিদ্ধান্ত নিয়ে নেন। প্রধানত এলাহাবাদের কংগ্রেসের হার কেবল প্রদেশ কংগ্রেস (ই) সংগঠনের ভিত নড়ায়নি, সারা ভারতের রাজনৈতিক মহলকেই নাড়া দেয়। কংগ্রেস (ই)–র সুনীল শাস্ত্রী জনবহুল লোকসভাকেন্দ্র এলাহাবাদে এক লাখ ভোটও পান নি। যেখানে '৮৪–র লোকসভা নির্বাচনে অমিতাভ বচ্চন হেমবতী নন্দন বহুগুণাকে প্রায় দু'লাখ ভোটে হারিয়ে ছিলেন। আসল কথা, ভি·পি· সিং জিতেছিলেন 'রাজীব হটাও' স্লোগান নিয়ে, সারা দেশে রাজীবের প্রতিস্পর্ধী হয়ে ওঠার পথে ভি·পি· সিং–এর এই জয় একটা বিরাট ধাক্কা দেয় কংগ্রেসকে। দিল্লি দরবারের চোটটা লাগে জোরালো। একদিকে যেমন রাজীব বিকল্পের সম্ভাবনা জাগে, অন্যদিকে বীর বাহাদুরের অক্ষমতা প্রকাশ পায়। ভি·পি· সিংও ব্যঙ্গ মন্তব্য করলে–'ভোটে বীর বাহাদুর ছলচাতুরি করার জন্য কংগ্রেস (ই) হারেনি, হেরেছে ছলচাতুরিতে তিনি সফল না হওয়ায়।' সেই সঙ্গে এলাহাবাদের নামায় বন্দী এক কুখ্যাত মাফিয়া নেতার বিবৃতিতে তার সহায়তা নেওয়ার ব্যাপারেও জড়িয়ে পড়েন বীর বাহাদুর। সমস্ত বিতর্কের শেষ হয় এলাহাবাদে কংগ্রেসের পরাজয়ের ফলে। আর পরাজয়ের দায় মাথায় নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে বীর বাহাদুরও সরে আসতে বাধ্য হন। শুধু তাই নয়, ১৯৮৪–র লোকসভা নির্বাচনের পর উত্তর প্রদেশে যতগুলি উপনির্বাচন হয়েছে, তাতে ভোটের ফলাফল কংগ্রেসের পক্ষে কোনও শুভসূচনার আভাস দেয়নি। যার প্রভাব নিশ্চয়ই ১৯৯০–র নির্বাচনে পড়বে। অবশ্য ১৯৮৪–র নির্বাচনে ইন্দিরা হত্যার পরবর্তী সহানুভূতির হাওয়া না বইলে ফলাফল অন্যরকম হতো নিশ্চয়ই। ইন্দিরা হত্যার

৯২ পৃষ্ঠায় দেখুন

ডুয়ার্সের বিভীষিকা

হাওড়ার নরেন্দ্রনাথ মিত্র ডুয়ার্সের মানুষখেকো বাঘের হাত থেকে উত্তরবঙ্গের মালবাজারের মানুষজনকে ত্রাস মুক্ত করলেন।

বিকেল মরে আসছিল। জঙ্গলের মাঝখানের সরু রাস্তার বুকে জিপটা এসে আচমকা ব্রেক কষল। অন্ধকার নামছে। দু'ধারে ঘন জঙ্গলে ঘরে ফেরা পাখির কিচিমিচি।

জিপটাকে দাঁড় করিয়ে শিকারী নরেন্দ্রনাথ মিত্র একটা পাইপ ধরিয়েছেন। খাকি রঙের জামা-প্যান্ট পরা। কাঁধে রাইফেল। ড্রাইভার আফতাব মুখ ঘুরিয়ে বলল, 'সাহাব, এখানেই তো গাড়ি রুখব?' নরেন্দ্রবাবু মাথা নাড়লেন।

ডুয়ার্সের জঙ্গল শুরু হয়েছে এক মাইল জুড়ে। সামনের গ্রামে মদেশিয়া লোকের বাস। এ জঙ্গলের মানুষ খেকো বাঘ তামাম গ্রামে ত্রাসের সৃষ্টি করেছে। অন্ততঃ পাঁচজন গেছে বাঘের পেটে। কত গরু ছাগল পেটে গেছে, ইয়ত্তা নেই। রাতের দিকে মানুষ খেকোটা নেমে আসে গ্রামে। মশাল জ্বেলে সড়কি বল্লম নিয়েও কোন সুরাহা হচ্ছে না। নরেন্দ্রবাবু এসেছিলেন কাছের মালবাজারে। শিকারের গন্ধ পেয়ে তিনি বেরিয়ে পড়েছেন। জঙ্গলের অনতিদূরে ফরেস্ট বাংলো। গরম কাল। মেঘমুক্ত রাতের আকাশে ঝিকমিক করছে তারা। বেশ একটু হাওয়া ছাড়ছে। জিপ নিয়ে যখন বেরিয়েছিলেন তখন বিকেল ছিল। জঙ্গলে পৌঁছুতেই রাত নেমে গেল। পাইপ মুখে দিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে নরেন্দ্রবাবু বললেন, 'এবার ভেতরে চল।' আফতাব জিপ স্টার্ট দিল। ঘন জঙ্গলের ভেতর ছুটতে লাগল গাড়ি। দু'পাশে ঘন জঙ্গলের প্রাচীর। আফতাব বলল, 'সাহাব, আর কতদূরে যাব?'

'এগিয়ে চল।'

নরেন্দ্রবাবুর কথায় নির্দেশের সুর বেজে উঠল।

ডুয়ার্সের জঙ্গল সম্পর্কে মোটামুটি ভৌগোলিক

বিবরণ জেনে নিয়েছেন নরেন্দ্রবাবু। বাঘের অবস্থান সম্পর্কেও জ্ঞাত হয়েছেন। সকালে এসেছিল বৃদ্ধ মদেশিয়া মৌলী। তার কাছ থেকে সব কিছু জেনে সকাল থেকেই প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন।

মৌলী বলল, বড় শাল গাছের কাছেই মানুষখেকোটা থাকে। ওখানে সে দাঁত-জিভ শানাচ্ছে। সেইমত তৈরিও হয়ে এসেছেন নরেন্দ্রবাবু। টাটকা কার্তুজ ভরা বন্দুক। দেহ মনে সবল এই মধ্যবয়স্ক মানুষটির মাথায় শিকারের নেশা চাপলে কোন কিছুর ঠিক থাকে না। জীবনে বহু শিকার করেছেন। ঘ্রাণশক্তি দিয়ে বুঝে নিতে পারেন কোথায় শিকার রয়েছে।

জিপের মধ্যে রয়েছে রাতের খাবার। ফ্লাস্কে চা। বাঘকে কব্জা করার জন্য একটি ছাগল। একজন পেশাদারি শিকারীর যা যা দরকার। আফতাব স্থানীয় লোক। জঙ্গলের নাড়িনক্ষত্র মোটামুটি জানা। জিপের মধ্যে বসে নরেন্দ্রবাবু পাইপ নিভিয়ে আলো জ্বাললেন। নৈশ ভোজ এখনই সেরে ফেলা দরকার। টিফিনকেরিয়ার খুলে খাবার দাবার বার করলেন। রাত নেমেছে। গাঢ় অন্ধকারে পেট্রো ম্যাক্সের আলোতে বনভূমি আলোকিত। সারা জঙ্গল এই সন্ধ্যাতেই ভয়ানক হয়ে উঠেছে। ঝিঁঝির ডাক। শাল, পলাশ এবং অজানা অচেনা গাছগুলি যেন নিশাচরের মত তাকিয়ে রয়েছে। অদ্ভুত এক হাওয়া। বুনো গন্ধে পরিবেশ কি রকম হয়ে উঠেছে। আচমকা বিকট শব্দ করে একটা নাম না জানা পাখি উড়ে গেল। খাওয়া শেষ হলে ছাগলটা টানতে টানতে সামনের গুঁড়িতে ঝুলিয়ে রাখা হল।

—সাহাব, পালিয়ে আসুন। আফতাবের গলাতে সতর্কবাণী। পাতা বিছান পথ মাড়িয়ে হাঁটতে হাঁটতে ফিরে এলন নরেন্দ্রবাবু। এবার রুদ্ধশ্বাস প্রতীক্ষা।

জিপটি রাখা অন্ধকারে, বন্দুকের মুখ তাক করা সামনে। আধঘন্টা কেটে গেল রুদ্ধশ্বাস প্রতীক্ষায়। এমন সময় শব্দ উঠল খস্‌খস্ করে। সঙ্গে সঙ্গেই কান খাড়া, চোখ তীক্ষ্ণ। দেখা গেল, ছোট আকৃতির একটি জন্তু খস্‌খস করে এগিয়ে আসছে। নরেন্দ্রবাবুর চোখের নির্ভুল নিশানা জানিয়ে দিল, এটি বন্য বরাহ। আফতাব ফিসফিস করে বলল, 'সাহাব, গোলি চালিয়ে দেবেন?'

—নাঃ। বাঘ পালাবে। উম্মাদের মত কর'না। বুনো শুয়োরটি এদিক ওদিকে তাকাচ্ছে। অন্ধকারে তাকে দেখা না গেলেও বোঝা যাচ্ছে নিশি অন্ধকারে খাবারের সন্ধানে এসেছে বরাহটি।

রাত নেমেছে গাঢ় হয়ে। নিশ্ছিদ্র অন্ধকার ঝিঁঝির ডাকে ভরাট। কত রাত হবে কে জানে! আফতাব বেচারা ঘুমে ঢুলছে। তবু মানুষখেকোটি এল না। উত্তেজিত হয়ে আবার পাইপ ধরালেন নরেন্দ্রবাবু।

ঠিক এমন সময় বনের ভেতর থেকে সোরগোল ভেসে এল। সচকিত হয়ে উঠলেন নরেন্দ্রবাবু। উত্তরদিক থেকেই আসছে সোরগোল। আরও কিছু পরে দেখা গেল, একদল গ্রামবাসী হ্যারিকেন আর সড়কি বল্লম নিয়ে ছুটে আসছে। নরেন্দ্রবাবুর জিপ দেখতে পেয়েছে তারা। ছুটে এল জিপের কাছে।

'সাহেব, বাঘ গ্রামে গেছিল। এবার জঙ্গলে ঢুকেছে। এইদিকে—'

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের ছেলেরা

আঙুল তুলে যেদিকে দেখাল সেদিকে ঘুরে তাকালেন নরেন্দ্রবাবু। তারপর টর্চ জ্বালালেন। দেখা গেল বিশাল দেহীকে। তৎক্ষণাৎ গুলি চালালেন। এক নয়, পরপর চারটি। ততক্ষণে গ্রামবাসীরা আলো সড়কি নিয়ে ছুটে এসেছে। আলোতে সদ্য নিহত বাঘটিকে দেখা গেল। রক্তে ভিজে উঠেছে সারা শরীর। নরেন্দ্রবাবুকে তারা কাঁধে তুলে নিল।

বাঘ শিকার কাহিনীর পরেই এবার শিকারীর জীবন বৃত্তান্ত শোনা যাক। বাঘ শিকারে দক্ষ শিকারী নরেন্দ্রনাথ মিত্রর জন্ম ১৮৮৯ খ্রীঃ হাওড়ার মুগকল্যাণ গ্রামে। ছোটবেলা থেকেই শিকারের প্রতি আগ্রহ। বয়স যখন কুড়ি বছর তখন নাগপুরে যান। দাদা জ্যোতিন্দ্রনাথ মিত্র ছিলে নাগপুরের ফরেস্ট অফিসার। ছাত্রাবস্থায় বছর চারেক কাটে নাগপুরে দাদার কাছে এবং একরকম ওখান থেকেই নিজেকে শিকারী হিসাবে চিহ্নিত করার সুযোগ ঘটে। প্রথমের দিকে হরিণ, পরে বাইসন শিকার করেছেন। সেসময় শিকারের উপর বিশেষ বিধি নিষেধ ছিল না। ফলে অবাধে চলত শিকার। শিকার করার পদ্ধতি ছিল বেশ রোমাঞ্চকর। আর বাঘ শিকার করার কৌশলটা বেশ অভিনব। দুর্গম জঙ্গলের মধ্যে গাছের ডালে মাংস বা ঐ জাতীয় খাবার ঝুলিয়ে দিয়ে অপেক্ষা করতেন। অন্য কোন গাছের উপর, প্রয়োজনে গাছের সঙ্গে নিজের শরীরকে বেশ মজবুত করে বেঁধে নিতেন শিকারীরা, যাতে করে কোন ছায়া না পড়ে দেহের। বাঘের গর্জন কিংবা কোন হিংস্র পশুর বিকট আওয়াজে নার্ভাস হয়ে পড়ে না যান সেই কারণেই এই সাবধান হওয়া। তারপর যখন ঘন্টার পর ঘন্টা অপেক্ষার পর মাংসের গন্ধ টের পেয়ে এগিয়ে আসত বাঘ, তখনই তাক করা হত। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে ঝোলান মাংসের চারপাশ ঘুরে ভয়ানক গর্জন করে চলে যেত শিকার। আবার ফিরে আসতো। লক্ষ একটাই, কিন্তু তা নাগালের বাইরে। শিকারী গাছের ডালে রুদ্ধশ্বাস অবস্থায় প্রতীক্ষা করছে কখন তাঁর গুলিটি ভেদ করে যাবে বাঘের শরীর।

একবার বাইসনের পাল্লায় পড়েছিলেন নরেন্দ্রবাবু। ফরেস্ট বাংলোর দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন, এমন সময় হাত পঁচিশ দূরে একটা বাইসন বীভৎস শব্দ করে ছুটে এল। প্রাণের ভয়ে দ্রুত গতিতে এসে পৌঁছোলেন বাংলোয়। তখন তার দাদা আর ফরেস্ট ডিরেক্টর বেশ চিন্তিত ছিলেন নরেন্দ্রবাবুর জন্য। সমস্ত ঘটনা শুনে তাজ্জব হয়ে গেলেন ডিরেক্টর পারকিংসন্ সাহেব। পিঠে হাত দিয়ে উৎসাহিত করলেন তাঁকে। নেশা চাপল আরও বেশি করে। এগুলো সবই ১৯১০ থেকে ১৯১৩ সালের ঘটনা। নেক নজরে পড়লেন ই·পারকিংসন-এর। নরেন্দ্রনাথবাবু ফিরে এলেন কলকাতায়। চাকরি পেলেন আর·বি· রডা কোংতে। যেখানে বন্দুকের গোলাগুলি, বন্দুক তৈরি ও মেরামত ছাড়াও বন্দুক রপ্তানি ও আমদানি করা হত। একেবারে সোনায় সোহাগা। সঙ্গী হিসাবে পেলেন

পদস্থ অফিসার ও সহকর্মী যাঁরা শিকারী হিসেবে বিশেষ পরিচিত ছিলেন।

এঁদের মধ্যে লরি সাহেব, হাউ সাহেব, প্রাইক সাহেব প্রমুখরা ছিলেন। ছিলেন শিরীষ মিত্র, যিনি গুলি চুরির দায়ে অভিযুক্ত হয়েছিলেন পরবর্তীকালে।

১৯২৪-এর জুলাই মাস। ইওরোপীয়ান শিকারী টিমের সঙ্গে ছিলেন নরেন্দ্রবাবু। সেবার নেপালের কাঠমাণ্ডু ফরেস্টে তারা গিয়েছিলেন। যখন কাঠমাণ্ডুতে পৌঁছলেন তখন সন্ধে। নেপালের নিয়মানুসারে সন্ধ্যার পর শহরে ঢোকা নিষিদ্ধ। ফলে রাত কাটাতে হল শহরের বাইরে। পরের দিন সকালে রওনা দিলেন চারজন শিকারী। ফোনে ফরেস্ট অফিসারের সঙ্গে যোগাযোগ করে জিপের ব্যবস্থা পাকাপাকি করে নিলেন। খেয়েদেয়ে তারা হোটেল থেকে বেরিয়ে পড়লেন। কাঠমাণ্ডুর গহীন অরণ্য যেখানে বাঘ ছাড়াও নানা ধরনের হিংস্র জন্তু জানোয়ার আছে। জানোয়ারের অত্যাচারে এলাকার মানুষ অতিষ্ঠ তাই শিকারী দলকে দেখে তারা যেন কিছুটা স্বস্তি বোধ করলেন। ফরেস্ট বাংলোতে থাকার সব রকম ব্যবস্থাই পাকা ছিল। স্নান, খাওয়া সেরে ফরেস্ট অফিসারের কাছ থেকে বিস্তারিত সব কিছু বুঝে নিয়ে তারা বেরিয়ে পড়লেন। জঙ্গলের ভেতরে জংলি রাস্তাকে অতিক্রান্ত করে প্রায় দশ কিলোমিটার যাওয়ার পর হঠাৎ ব্রেক কষে দাঁড়িয়ে যায় জিপটি। তারপরই চোখের পলক ফেলার আগেই এক ঝাঁক প্রায় সাত আটটি বাঘকে ঝোপ ঝাড়ের মধ্যে দলবদ্ধভাবে গর্জন করে ঘোরাফেরা করতে দেখা গেল। সঙ্গে সঙ্গে প্ল্যান ছকে ফেললেন তারা। জিপ থেকে সমস্ত সাজ সরঞ্জাম নামিয়ে খুব সন্তর্পণে পা পা করে এগিয়ে গেলেন বাঘগুলোকে লক্ষ্য করে। যে যার নিরাপদ স্থান বেছে নিয়ে গাছে চড়ে বসলেন। আশপাশের বিভিন্ন ডালপালায় বিষাক্ত সাপ ও জংলি পোকামাকড়। সব কিছুকে তুচ্ছ করে শিকারের নেশায় তারা ট্রিগারে হাত দিয়ে টাক করে বসে আছেন। বাঘেরা চলাফেরা ও হুংকারে জঙ্গল দাপাচ্ছে। বেশ কিছুক্ষণ সময় অতিবাহিত হওয়ার পর দলছুট একটা বাঘ এগিয়ে এল নাগালের মধ্যে। ব্যস সঙ্গে সঙ্গে গুলি। গুড়ুম্। রক্তে ভাসাভাসি। কিছুক্ষণ ছটফট করে নিথর হয়ে গেল বাঘটি।

এরকম ভাবেই ধীরে ধীরে নরেন্দ্রবাবু শিকারী মহলে পরিচিত হয়ে উঠলেন। পরবর্তীকালে স্বাধীন বাংলার প্রথম মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধান চন্দ্র রায় নরেন্দ্রনাথ মিত্রকে প্রশংসা করে একটি চিঠি পাঠিয়েছিলেন। এই প্রশংসা পত্র শ্রী মিত্রকে অনুপ্রাণিত করেছিল। শিকার যখন তাঁর একমাত্র ধ্যানধারণা তখন আর·বি· রডা কোম্পানি থেকে ১৯৩৮ সালে স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ করলেন। তারপর থেকেই আর কোন জীবিকার সঙ্গে যুক্ত হননি। নেশা শুধু শিকার আর শিকার। বিহারের হাজারীবাগ ফরেস্ট, সুন্দরবন ও ডুয়ার্সের জঙ্গলে তিনি বহুবার গিয়েছেন শিকার করতে। শিকার করেছেন বহু বাঘ, বাইসন, হরিণ, পশু পাখি। প্রাক্তজাত মিত্র পরিবারের এই ব্যক্তিত্বটি ছোটবেলা থেকে খেলাধুলা, নাটক এবং বিশেষ সামাজিক ও গঠনমূলক কাজে যুক্ত থেকে পারদর্শিতা দেখিয়েছিলেন। বর্তমান উত্তরসূরী বিমল, অনিল, শ্যামল, মৃণাল, কুশল ও চপল মিত্র–এঁরা কেউই শিকারী হতে পারেন নি। কিন্তু শিকারী হওয়ার একটা বাসনা আছে ছোটবেলা থেকে। এঁরা সকলে বিভিন্ন শিল্প সৃষ্টির সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছেন। একান্নবর্তী পরিবারের এই মিত্র পরিবারটিতে বাবার শিকারের নিদর্শন হিসাবে জন্তু জানোয়ারের মুখ এখনও যত্ন করে সাজিয়ে রাখা আছে। সেদিন সন্ধ্যায় মুগকল্যাণের এই বাড়িতে শ্রী নরেন্দ্রনাথ মিত্রের ছেলেদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে তাঁরা স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে জানালেন বাবার নানা ধরনের শিকারের কাহিনী এবং ডাইরির পাতা থেকে কিছু অজানা শিকারের তথ্য। বেশ রোমাঞ্চকর সব ঘটনা।

তাকিয়ে ছিলাম প্রয়াত শিকারীর তৈলচিত্রের দিকে। দু'পাশে হরিণ, বাইসনের মুখ। দেওয়ালে বাঘের নখ, চামড়া। পুরো দেওয়াল মিউজিয়ামের মত। স্তব্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে সম্ভ্রম জাগছিল। মনে হচ্ছিল এক ধ্যানমগ্ন শিকারীর সামনে বসে আছি। শিকারই যার ধ্যানজ্ঞান।

-আবদুল কাইউম

ছবি: দেবব্রত ব্যানার্জী, অজিত পাল, বিকাশ চক্রবর্তী

হাজি মস্তানের রাজনৈতিক অনুপ্রবেশ
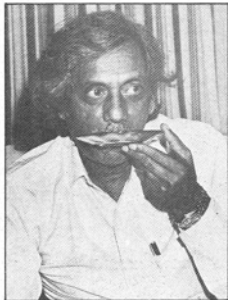
হাজি মস্তান ছবি। সুরেশ সুবর্ণ

বম্বের পাতালজগতের দীর্ঘদিনের একচ্ছত্র সম্রাট হাজি মস্তান সম্প্রতি এসেছেন রাজনীতিতে। তিনি নিজেই একটি সর্বভারতীয় দলের নেতা। কিন্তু কি উদ্দেশ্য তাঁর এই ব্যস্ত রাজনৈতিক কার্যকলাপের ? একটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদন।
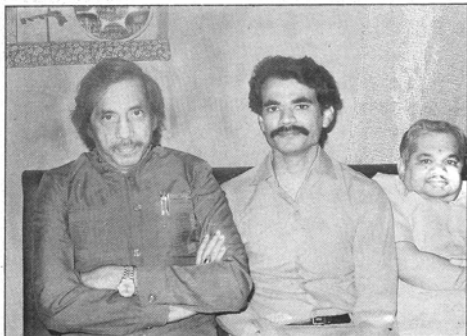
সহযোগীদের সঙ্গে
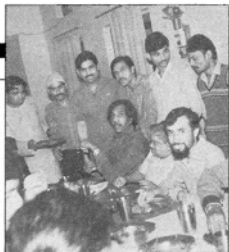
রাজনৈতিক কার্যকলাপ

বম্বেতে কুলির কাজ দিয়ে জীবন শুরু করে সমাজবিরোধী জগতের প্রাতঃস্মরণীয় পুরুষ মির্জা হাজি মস্তানের গতিবিধি উত্তরপ্রদেশের রাজনীতিতে ক্রমশ প্রকট হয়ে উঠেছে। যদিও রাজ্য সরকারের দিক থেকে তার লক্ষ্ণৌ প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা জারি করা আছে তবু এখানে তার আসা যাওয়া যে সম্প্রতি যথেষ্ট দ্রুত গতিতে বেড়ে চলেছে, তা অস্বীকার করা যাবে না। প্রশাসনিক তৎপরতার ভুলে গত ৯-১০ নভেম্বর বস্তি সহ উত্তরপ্রদেশের পূর্বাঞ্চলীয় জেলাগুলিতে কর্মতৎপরতার পর হাজি মস্তানের লক্ষ্ণৌ আসার খবর প্রশাসন পাক্কা ১২ ঘন্টা পরে পায়। খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ স্থানীয় এক হোটেলে হাজিকে ঘিরে রেখে তাঁকে লক্ষ্ণৌ ছেড়ে চলে যাওয়ার কথা বলে। প্লেনে তাকে রওনা করিয়ে দিয়ে প্রশাসন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। কিন্তু বিশ্বস্ত সূত্রের খবর হাজি মস্তান এর মধ্যেই কানপুরে সমাজবিরোধী গোষ্ঠের লোকজন এবং লক্ষ্ণৌ-এর কিছু ধর্মীয় কট্টরপন্থীর সঙ্গে আলোচনা সেরে নিয়েছিলেন।

বাস্তবিক হাজি মস্তান উত্তরপ্রদেশের পঞ্চায়েত, ব্লক ও জেলাস্তরের স্থানীয় নির্বাচনে নিজের লোকেদের সাহায্য করার জন্য বস্তিতে এলে জেলা প্রশাসনের নজরে পড়ে যান। ফলে জেলা প্রশাসন হাজিকে বোম্বাই ফেরৎ পাঠাবার জন্য একদল পুলিশ সহ লক্ষ্ণৌ পাঠায় কিন্তু তিনি যে কোনও কারণেই হোক বম্বেতে যাওয়ার পরিবর্তে লক্ষ্ণৌতেই থেকে যান। বস্তি পুলিশ তাঁর এই লক্ষ্ণৌতে থাকার খবর কিন্তু অতঃপর লক্ষ্ণৌ পুলিশকে দেয় নি। ফলে নিজেদের সূত্র থেকে এ খবর স্থানীয় প্রশাসন ১২ ঘন্টা পরে জানতে পারে।

উত্তরপ্রদেশ রাজনীতিতে নিজেকে অপরিহার্য করে তোলার এই চেষ্টা মস্তানের নতুন নয়। এর শুরু হয়েছিল আড়াই বছর আগে, তাঁর 'দলিত মুসলমান এবং সংখ্যালঘু সুরক্ষা মহাসংঘ' গঠন করার সময় থেকে। এই সংগঠনকে তিনি রাজনৈতিক গুরু নাগপুরের প্রফেসর যোগেন্দ্র কবাড়ের পরামর্শে তৈরি করেছিলেন। হাজি বুঝতে পেরেছিলেন শুধুমাত্র মুসলমানদের নিয়েই রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সফল হওয়া সম্ভব নয়, এই জনাই তিনি মহারাষ্ট্রে হরিজনদের প্রভাবশালী

সংগঠন 'দলিত প্যান্থার'-কেও নিজের সংগঠনে সামিল করে নেন।

সংগঠন স্থাপনার পর থেকেই হাজি মস্তানের উত্তরপ্রদেশে যাতায়াত বেড়ে যায়। হাজি অবশ্য উত্তরপ্রদেশ থেকেই একসময় বম্বেতে গিয়েছিলেন। ওয়াকিবহাল মহলের ধারণা অনুযায়ী গত এক বছরে হাজি দশবারেরও বেশি পূর্ব উত্তরপ্রদেশের জেলায় জেলায় ঘুরেছেন সংগঠনের কাজে। কিন্তু দলিত এবং সংখ্যালঘুদের সংগঠিত করে একটা ব্যানারের তলায় আনার পেছনে তাঁর উদ্দেশ্যটা কি? প্রশ্নের উত্তরে তাঁর বক্তব্য, 'আমার উদ্দেশ্য মুসলিম এবং গরীব মানুষদের 'সুরক্ষা মহাসংঘ'-এ একত্রিত করে তাদেরকে শোষণের হাত থেকে মুক্তি দেওয়া।' এর প্রত্যুত্তরে ওয়াকিবহাল মহলের বক্তব্য অন্যরকম, তা হল, 'হাজি মস্তানের আসল উদ্দেশ্য উত্তরপ্রদেশের পূর্বাঞ্চলে নিজের প্রসার ক্ষেত্রটি মজবুত করে ফেলা। কারণ ভারত-নেপাল সীমান্তে চোরাচালানীদের সব থেকে নিরাপদ ঘাঁটি এটাই।'

হাজি মস্তান ইদানীং তাঁর নিজের কারবার প্রসারের কেন্দ্র হিসেবে লক্ষ্ণৌকেই নির্বাচন করে রেখেছেন উত্তরপ্রদেশে। বিশ্বস্ত সূত্রের খবর এই জন্য লক্ষ্ণৌতে তিনি জমিজমাও কিনেছেন। একটি স্থানীয় সিনেমা হলের সংলগ্ন বাড়িও এই জমির মধ্যে আছে বলে শোনা যাচ্ছে। বাড়িটি ভেঙে সেখানে ১৭ তলার বিজনেস কমপ্লেকস তৈরির কাজও শুরু হয়ে গেছে।

হাজি মস্তান

অতর্কিতে একদল উত্তেজিত জনতা ঘিরে ধরল গাড়ি। দরজা ভাঙতে শুরু করল। কেউ কেউ আবার বনেটের উপরই নাচতে শুরু করল। উদ্দাম নৃত্য।

১৯৮৫ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি। মাঝরাত। গাড়ি ছুটে চলেছে কল্যাণের দিকে। থানে জেলার শহর কল্যান। তখন চারদিকে গাঢ় অন্ধকার। তারই বুক চিরে এগোচ্ছে ফিয়াটটা। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে। ১৯৬০ সালের পুরোনো মডেল। তার উপর অচেনা রাস্তা আর গাড়ির ব্যাকসিট থেকে মালিকের ঘন ঘন ঝাঁঝাল নির্দেশ–'লাইট বনধ করো, দেখকে নহি চলতা।' এমনিভাবে এগুতে এগুতেই পথে ক্ষিপ্ত জনতার হাঙ্গামা।

দু'সেকেন্ডের জন্য ড্রাইভার গাড়িটা থামিয়ে দেন। তারপর হুস করে বেরিয়ে যায় সামনে। জনতা বুঝতেই পারে নি গাড়িটা ধাঁ করে বেরিয়ে যাবে। একেবারে নাকের ডগার উপর দিয়ে। তাদেরকে একেবারে বেকুব বানিয়ে দেয় পাক্কা ড্রাইভার। এক পলকের জন্য তারা হতভম্ব হয়ে পড়ে। তারপর হৈ হৈ করে হাজারজনেরও বেশি চলন্ত গাড়িকে অনুসরণ করে ছুটতে থাকে। ড্রাইভারের দৃঢ় হাতে গাড়ি প্রচণ্ড গতিতে বেরিয়ে যায়। জনতার হল্লা ক্রমে ঝিমিয়ে পড়ে। কয়েক মিনিটের মধ্যে গাড়ি থামে নীল সাদা কাপড়ে তৈরি একটি প্যাণ্ডেলের সামনে।

প্যাণ্ডেলে তখন বক্তৃতা চলছে। এক কালো মতন মানুষ বক্তৃতা দিচ্ছেন মাইক্রোফোনের সামনে দাঁড়িয়ে। প্রচণ্ড ঝাঁঝ তাঁর গলায়। জনতাও ক্রমে তেতে উঠছিল তাঁর বক্তৃতায়। সারাটা অঞ্চল জুড়ে একটা চাপা উত্তেজনা ধীরে ধীরে ছড়িয়ে যাচ্ছিল। গাড়িতে আসতে আসতেই দূর থেকে শুনতে পাচ্ছিলেন তা গাড়ির মালিক সেই মানুষটি। তাঁর সারা মুখে ছড়িয়ে পড়ছিল একটা আশ্চর্য হাসি। গাড়িটা প্যাণ্ডেলের কাছে এসে থামতেই জনতা আরেকবার উত্তেজনায় ফেটে পড়ে। ঘিরে ধরল গাড়ি। মঞ্চের বক্তৃতার দিকে তখন কারোর আগ্রহ নেই। প্রাইভেট কারের আরোহীর জন্যই সবাই অপেক্ষা করছিল। গাড়ি থেকে নির্বিকারভাবে নেমে আসেন মানুষটি। হাজি মস্তান, হাজী মস্তান মির্জা। সামনের দিকের একটা চেয়ারে বসে বক্তৃতা শুনতে শুরু করেন।

ফেব্রুয়ারির শেষাশেষি। তবু বাতাসে হিম ভাবটা একদম কেটে যায় নি। সবাই শুনছে সেই বক্তার উজ্জীবিত বক্তৃতা। মাঝে মাঝে উত্তেজিত হয়ে পড়ছে। হাজি কিন্তু বরফের মত ঠাণ্ডা। আজ পরেছেন ক্রিম রঙের টেরিলিন যোধপুরী পাঞ্জাবী, আর আলিগড়ি পাজামা। অন্যান্য দিনে অবশ্য সাদা পোশাকই তাঁর বেশি প্রিয়।

সবাই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে কখন হাজি মঞ্চে ওঠেন। শুধু তাঁরই বক্তৃতা শোনার জন্য এত মানুষ জড়ো হয়েছে কল্যাণে। অবশেষে মঞ্চে এলেন হাজী। তুমুল করতালিতে ফেটে পড়ল জনতা। ইঙ্গিতে তাদের থামিয়ে গুরু গম্ভীর গলায় বক্তৃতা শুরু করেন তিনি।

এই সেই হাজি মস্তান, যাঁকে ঘিরে আছে অনেক অনেক আশ্চর্য ঘটনা। হাজি অবশ্য সব মনেও রাখেননি। কোনকালেই তারিখ আর নির্দিষ্ট কোন সংখ্যার কথা মনে রাখতে পারেন না হাজি, সব গুলিয়ে ফেলেন।

এমনকি মনে থাকে না তার দলকর্মীদের নাম ধাম। এর নামে ওকে ডাকেন, ওর নামে অন্যকে। বেমালুম ভুলে যেতে পারেন। তবু একটা দিকে কিন্তু তিনি ভীষণ রকম সচেতন। নিজের দলের উন্নতির দিকে কড়া নজর। পান থেকে চুন খসার উপায় নেই। আজকের হাজিকে দেখে কেউ ভাবতেও পারে না অসীম দুঃখের মধ্যে বড় হতে হয়েছে তাঁকে। অসীম দারিদ্র্যের মধ্যে জন্মেছেন হাজি।

মাথা তুলে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিচ্ছেন মঞ্চে, মাইক্রোফোনের সামনে। মঞ্চের আলোতে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে গভীর তীক্ষ্ণ দু'টো চোখ। উজ্জ্বল। কালো মেদহীন দৃঢ় চেহারা। অথচ এই মানুষটাই মহম্মদ আলি রোডের অফিসে একেবারে অন্যরকম। না দেখলে বিশ্বাস করা যাবে না।

বড় অদ্ভুত তাঁর অফিস। নতুন আর পুরাতন জিনিসপত্রে একেবারে শহরের ব্যতিক্রম বলতে গেলে। তাঁর অফিসে আছে কালো রংয়ের টেলিফোন। রিসিভার কিন্তু সারা সময় লক করা। যাতে করে না–চাওয়া কল থেকে বাঁচিয়ে রাখা যায় টেলিফোনকে। কিন্তু মস্তানভাই যে কারো সাথে কথা বলতে গেলেই তোলেন সেই কালো রিসিভার। হাতে সব সময়ই ধরা থাকে স্টেট একস্প্রেস সিগারেট। এই বিশেষ সিগারেট ছাড়া এক মুহূর্তও দেখা যাবে না। অফিসে একটা ভারী ভারী ভাব মুখ চোখে। একবার দেখলে যে কেউই সম্মান না জানিয়ে পারবে না।

অদ্ভুত কথা, এই মানুষটাকেই না শৈশবে কি কষ্টে দিন কাটাতে হত। থাকতেন ক্রাফোর্ড মার্কেটে। আর সিদ্দিকী রোডের ঝোপড় পট্টিতে। ভাঙ্গা ঝুপসি বাড়ি। বড় সড় মাপের একটা প্যাকিং বাকস বললেও ভুল হবে না। সে বাড়িতেই দু'বেলা ভরপেট না খেতে পাওয়া হাজি পরিবেশের সাথে যুদ্ধ করতে করতে বড় হন। নামেই মাত্র মিউনিসিপ্যালিটি স্কুলে ভর্তি করা হল তাঁকে। নাম ফতিমা বাঈ স্কুল। কিন্তু পড়াশুনায় মন থাকলে তো। পেটে ভাত আর গায়ে ভাল পোশাক নেই। তাতে কি। তখনই সে পাড়ার মস্তান। নামই হয়ে গেল মীর্জা মস্তান। বদমাশিতে সে অঞ্চলে তার জুড়ি মেলা ভার। ক্লাস করত না, প্রায় বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গী করে ছুটি হবার আগে ভেগে যেত। তাও বেশিদিন চলল না এভাবে। স্কুল ছাড়তে হল।

স্কুল ছাড়লেও বাড়িতে বসে বসে মিছিমিছি সময় কাটানোর উপায় ছিল না। নেমে পড়তে হল কাজে। চায়ের দোকানের বয়গিরি দিয়ে জীবন শুরু। তখন কতই বা বয়স তার। চায়ের দোকান থেকে ম্যাগাজিন বেচা, ফল বেচা থেকে কি নয়। বয়স তখন মোটে বার। ভকে কাজ পেল সে। কিছুদিন কাজ করল সেখানে। মন বসল না। ছেড়ে দিল ডকের কাজ। এরপর এক সাইকেল দোকানে মেকানিকের কাজ। তাও পোষাল না শেষ পর্যন্ত। সব ছেড়ে দিয়ে বিড়ির কারখানায় কাজ করতে গেল। সারাদিন দোকানে কাটে। সন্ধ্যায় রাস্তায় বেরিয়ে দেখে কত মানুষ। তাদের দামী- দামী পোশাক, গায়ে বিলিতি আতর ছড়ানো। গাড়ি করে আসে, চলে যায়। কিশোর হাজী তাদের দিকে তাকিয়ে থাকে, স্বপ্ন দেখে কবে সেও এমন গাড়িতে করে ঘুরে বেড়াতে পারবে। রাত দিন অমানুষিক পরিশ্রম করে।

সেদিনের হাজি আর আজকের হাজিতে মেলা ফারাক। বিড়ির দোকানে বসে গাড়ির জন্য স্বপ্ন দেখা হাজির কাছে আজ গাড়িটা কোনও সমস্যা

খোঁজখবর

হাজি মস্তানের নিশ্চিত ধারণা অর্থ ও শক্তি দিয়ে মুসলিম এবং গরীব মানুষদের মধ্যে নিজের সমর্থন তৈরি করা সম্ভব। এ কারণেই গোন্ডা, আজমগড়, ফৈজাবাদ, বস্তি উত্তরপ্রদেশের এইসব পূর্বাঞ্চলীয় জেলায় মানুষদের আর্থিক ও আনুষঙ্গিক সহায়তা দিয়ে সমর্থন পাবার চেষ্টায় তিনি লেগে আছেন। এ কথার সত্যতা পাওয়া গিয়েছিল ১১ ডিসেম্বর ১৯৮৬ তে। জৈনপুর কোতোয়ালির সাব ইন্সপেকটর জয়শঙ্কর তিওয়ারি জনৈক নাসিরের কাছ থেকে ৬ লাখ ৭২ হাজার টাকা উদ্ধার করেছিল। এই অর্থ হাজি মস্তান জৈনপুরের এক মাদ্রাসার জন্য দান হিসেবে দিয়েছিলেন। হাজির শুভানুধ্যায়িদের বক্তব্য 'হাজি গত দু'বছরে রাজ্যের পূর্ব জেলাগুলিতে ১০ কোটি টাকারও বেশি দান করেছেন।'

ওয়াকিবহাল মহলের বক্তব্য হাজির পক্ষে সরকার ও বিরোধী পক্ষের প্রায় দু'ডজন বিধায়কেরও সমর্থন আছে। কিছুদিন আগে হাজি মস্তান 'বাবরী মসজিদ সংঘর্ষ সমিতি'কে আড়াই কোটি টাকা দেওয়ার প্রস্তাব রেখেছিলেন। এই প্রস্তাবের পর সমিতির বেশ কিছু নেতা হাজির প্রতি আকর্ষিতও হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু গত ২৬-২৭ নভেম্বরে দিল্লির ঐ সম্পর্কিত সম্মেলনে হাজিকে আমন্ত্রণ জানানোর ব্যাপারে সমিতির নেতাদের মধ্য মতভেদ দেখা দেয়। এ বিষয়ে সমিতির সংযোজক জাফর ইয়াব জিলানির বক্তব্য, 'আমি হাজিকে আমন্ত্রণ করতে চেয়েছিলাম কিন্তু দিল্লি

নয়। হাইসোসাইটির তাবড় তাবড় লোকের সাথে তাঁর ওঠাবসা। বয়স তখন খুব বেশি হলে ১৭।১৮ হবে। উষ্ণ রক্ত গায়ে। উঠতি যৌবন। কারুকে পরোয়া করার প্রশ্নই ওঠে না। কোনদিকে একটু উসকে দিলেই হয়। সে সময় ডকে নৌবহর এসেছে। হুজুগ উঠল সাহেবদের মারলে কেমন হয়। এক মুহূর্তও অপেক্ষা নয়। সে সবার আগে। লাফিয়ে উঠে সেই-ই প্রথম শুরু করল ইঁট পাটকেল ছোঁড়া। দেখা দেখি অন্যরাও। সাহেবদের একেবারে নাজেহাল অবস্থা। তাদের নেতা বলেছিল গুলি চালাবে না। কিন্তু গুলি না চালিয়ে তাদের উপায় ছিল না। গুলিতে হাজির সহযোগীরা অনেকেই মারা গেল। সেদিন তাঁর প্রাণে প্রচণ্ড শক লাগল। অতটা বাড়াবাড়ি না করলেই হত। হাজি নিজেকে একটা সেলুনের আড়ালে রক্ষা করেছিল কোনক্রমে। সেদিনের কথা মনে পড়লে আজও কিছুক্ষণের জন্য নির্বাক হয়ে যান।

হাজির এর পরের জীবন অন্ধকারের জীবন। বম্বে মহানগরীর অন্ধকার জগতকে শাসন করত যে কজন, হাজি তাদের অন্যতম। ১৯৮৫ সালের গোড়ার দিকে রাজনীতিতে আসার ইচ্ছে হয় তার। একটি অফিস খোলার ইচ্ছাও প্রকাশ করলেন। দ্রুত স্থান নির্বাচন হয়ে গেল। প্রায় ১৫ বর্গ ফুটের একটি জঞ্জালময় জায়গা সাফ করালেন। এখানেই অফিস বসাবেন। নাম হবে 'দলিত মুসলিম মহাসংঘ' প্রারম্ভিক কাজকর্ম শুরু হয়ে গেল। তার এই কাজের খবর ঠিক পৌঁছে গেল পুলিশের ডেপুটি কমিশনারের কাছে। চমকে উঠলেন তিনি। ডেপুটি কমিশনার প্রমাদ গুনলেন। বিন্দুমাত্র দেরি না করে তিনি তদন্ত শুরু করলেন। তারপরেই তিনি তাঁকে বাধা দিয়ে একটি আদেশ জারি করলেন। হাজি একটুও বিস্মিত হলেন না। এমন যে কিছু একটা ঘটবে তা তিনি আগে থেকেই আঁচ করেছিলেন। কিন্তু রাজনীতিতে তিনি অতঃপর এলেন, আর অফিস করলেন বম্বেতেই।

দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতায় পোড় খাওয়া শরীর হাজির। এসব সাধারণ বাধায় ভেঙে পড়ার কথা চিন্তাই করতে পারেন না। বরং এক মুহূর্তের জন্য থেমে গিয়ে নিজের খেয়ালে 'শের' আবৃত্তি করতে শুরু করেন। শের আবৃত্তি হল হাজির প্রিয় অভ্যাস। সেই প্রিয় শেরটি:

'ভেশ বদলা, ক্যা হুয়া
দিল কো বদলানা চাহিয়ে
দলিত আউর মুসলমানোকা টুকরাগেকে লিয়ে
কলেজা চাহিয়ে।'

এক বিচিত্র ইতিহাস। ১৯৬৪ সাল। হাজিকে বন্দী করা হল। কারাবাসের দিনগুলো দুঃসহ লাগছিল। পরিশ্রমী হাজির কাজবিহীন দিনগুলোতে প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে পড়ছিল। হঠাৎই বুদ্ধি খেলে গেল মাথায়। পড়াশুনা শুরু করলে কেমন হয়! সময়ও কাটবে মনও ভাল থাকবে। হাজি তখনি পড়া শুরু করলেন। হাতের অঢেল কাজহীন সময় কাটাবার জন্য। হিন্দি পড়তেও যেমন বলতেও তেমনি সুবিধে। পড়াশুনা শিখবে এই একটাই তাঁর কানে মন্ত্র তখন। সারাটা সময় বই নিয়ে পড়া আর অক্ষরে অক্ষরে মকস করা। তাড়াতাড়িই হিন্দি শিখে নিলেন হাজি। পড়া দেখিয়ে দেবার লোক ছিল না কেউ। নিজের শিক্ষক তিনি নিজেই। হিন্দি তো শিখেছেনই, ইচ্ছে আছে সময় সুযোগ পেলে উর্দুও শিখে নেবেন।

শুধু একবার নয়, বারবার হাজিকে জেলে যেতে হয়। এমন কি হাজিই বম্বেতে একমাত্র ব্যক্তি, হাইকোর্ট যার জামিনের টাকার অংক ছিল ২০ লাখ টাকার। কাগজওলাদের কাছে হাজি তখন মুখরোচক সংবাদ। হাজি বেশ জানেন সাধারণ মানুষরা তাঁকে অপরাধী ভাবে। হাজি বলেন, কথাটা শুনে তাঁর হাসি পায়। আসলে সরকার যাকে অপরাধী বলতে শেখায় সাধারণ মানুষেরা সেই কথাই উগরে দেয়। ওরা তো জানে না হাজি পকেটে ছুরি নিয়ে ঘোরেন না, মাস্তানিও করেন না। এ দেশের মুসলিম নেতৃত্বেও আস্থা নেই হাজির। তিনি দেশের বর্তমান অবস্থা খুব ভাল মতই জানেন। তবে হাজি মুসলমানদের স্বার্থে যোগ্য দাবির পক্ষে সব সময়ই। তাদের খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থানের আজও সুষ্ঠু ব্যবস্থা করেনি সরকার–তাঁর অভিযোগ। শরিয়ত রক্ষার্থে এখন জোর লড়াই করছেন তিনি। তাঁর হাতে গড়া 'দলিত মুসলিম সুরক্ষা মহাসংঘ' মুসলমান সমাজের যোগ্য দাবি নিয়ে লড়ে যাচ্ছে।

হাজি ভালই জানেন হিন্দু মৌলবাদী নেতৃত্বের কাছে মুসলমানরা একতরফা এ্যান্টি ন্যাশনাল। তারা নাকি গোপনে পাকিস্তানের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে। ভবিষ্যতে পাকিস্তানে চলে যাবার মতলব আঁটছে। এই সব ছেঁদো কথায় হাজি তাচ্ছিল্যের হাসি হাসেন। তিনি বলেন, ধর্মনিষ্ঠ মুসলমানেরা শান্তিপূর্ণ কমিউনিস্ট। তাদের যথার্থ সুরক্ষা থাকলে তারা কখনও একথা চিন্তাই করবে না। তাছাড়া মুসলিমরা তো ভারতের জন্য অনেক আত্মত্যাগ করেছে। আত্মত্যাগের ঢের নজির আছে তাঁর কাছে। তারা যুদ্ধ বিপ্লবেও সমানভাবে অংশ নিয়েছে। আব্দুল হমিদের মত বীরেরা পাকিস্তানী ট্যাংকের সামনে বুক পেতেছে। যারা পাকিস্তানে যাবার তারা আগেই চলে গেছে। মুসলমানরা সবাই ওদেশে যাবার জন্য আগ্রহী হলে আজ পর্যন্ত এখানে থাকার কোন প্রশ্নই উঠত না।

পদত্যাগ করার পর কেন্দ্রিয় মন্ত্রী মহম্মদ আরিফ হাজিকে সরাসরি আক্রমণ করেছিলেন। শরিয়ত বিল নিয়ে হাজি মাতামাতি করছেন। অন্যায়ভাবে সরকারি বিলের বিরোধিতা করছেন। সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের দিকে একদলকে টেনে নিয়ে যেতে চাইছেন। এই কথা আরও অনেকেই বলেছেন।

হাজিকে নিয়ে নাকি ছবি হচ্ছে এবার। হাজিরই জীবনের চাঞ্চল্যকর সব কাহিনী নিয়ে। ছবির নায়ক হাজি নিজেই।

আবর্জনার মত বেড়ে ওঠা হাজি আজ পশ্চিম ভারতের এক বিতর্কিত চরিত্র। তাঁকে যেমন ঘিরে রয়েছে সমাজবিরোধী নামের অপবাদ, তেমনি কিছু মানুষদের কাছে হাজিই দেবতা রবীনহুডের মত। শৈশবের স্বপ্নগুলো আজ আর স্বপ্ন নয় তাঁর কাছে। আরাম আয়াস সবই সহজলভ্য। তবু হাজী কেমন অনাড়ম্বর। পায়াভারি রাজনীতির নেতাদের মত চালচলন নেই।

তবু সদালাপী মানুষটি মাঝে মাঝে কেমন গম্ভীর হয়ে যান। এখনকার, প্রত্যেক রাতের স্বপ্নগুলো আর শৈশবের স্বপ্নের মত রঙিন নয়। শুধু আতংকের স্বপ্ন, ভীতির স্বপ্ন তাঁকে ছেঁকে ধরে। জানেন সারা দিনের কাজকর্ম মস্তিষ্কে যে প্রভাব ফেলে যায় তাই-ই রাতে স্বপ্ন হয়ে আসে। আসলে সমাজ ব্যবস্থার অবস্থা আজ এতই শোচনীয় যে চারদিকে অন্ধকার ছাড়া কিচ্ছু নেই। একটা ভীষণ ভীতি রাতের ঘুম কেড়ে নেয় হাজির। বিছানায় হুড়মুড় করে উঠে বসেন। কখনও মুখ থেকে বেরিয়ে যায় সেই প্রিয় 'শের'টা–'ভেশ বদলা ক্যা হুয়া। দিলকো বদলানা চাহিয়ে।'

-গুরুপ্রসাদ মহান্তি

সাক্ষাৎকার

‘গরীব লোকেরা আর যাই হোক দাঙ্গা করতে যায়না’ হাজি মস্তান

প্রশ্ন : আওরঙ্গাবাদে কিছুদিন আগে যে দাঙ্গা ঘটে গেল, এরজন্য কাকে দায়ী করবেন আপনি?

উত্তর : দাঙ্গাটার জন্য আর যেই হোক, গরিব এবং দুর্বল শ্রেণীর লোকেরা দায়ী নয়। ওরা প্ররোচিত হয়েছিল শিবসেনা–র জন্য। শিবসেনা পুরসভায় নির্বাচনে জয়লাভ করলে কি হবে, কতকগুলো ব্যাপারে ওরা বিশ্বস্ততা অর্জন করতে পারেনি। দুর্ভাগ্যবশত, দাঙ্গাটা ঘটলো ঠিক ঈদের আগে। ফলে, মুসলমানদের ঘাড়েই দোষটা চাপল। সে যাই হোক, আসলে কিন্তু কংগ্রেস (ই) আর শিবসেনার প্রতিদ্বন্দ্বিতাই হচ্ছে মূল ব্যাপার। দুর্নীতিমূলক আচরণ এবং কাজকর্মে শিবসেনা প্রায় সরকারেরই সমকক্ষ। দেখি, আমরা লক্ষ্য রাখছি দাঙ্গা–র জন্য কি পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রীর কথাবার্তা শুনে মনে তো হচ্ছে, কতকগুলো খুনখারাপি যেন ঠিক দাঙ্গার পর্যায়ে পড়ে না।

প্রশ্ন : পুণে বা আওরঙ্গাবাদে বা বম্বেতেও এই বারবার দাঙ্গা ঘটে, এর আসল কারণ কি হতে পারে, আপনার মতে?

উত্তর : পুণে এবং পৈঠানে মুসলমানদের সংখ্যা খুব অল্প। ১০০টা অন্য সম্প্রদায়ের পরিবার পিছু দশটা মাত্র মুসলমান পরিবার। আর, ঐ দশটি পরিবার সব ব্যাপারেই স্থানীয় যে বাকি অন্য সম্প্রদায়ের লোকজন, তাদের উপরই নির্ভরশীল। একজন লোক, সে যার ওপর নির্ভরশীল, তাকে আক্রমণ করতে যাবে কেন? আরো একটা বড় ব্যাপার হচ্ছে, এখানকার মুসলমানরা ভীষণ গরিব। ওরা হয় পান-বিড়ি বেচে খায় অথবা কঠোর কায়িক শ্রমের বিনিময়ে জীবিকা নির্বাহ করে। মূর্তির ওপর ওইসব জঞ্জাল-উঞ্জাল ছোঁড়ার মত ওদের সময় কোথায়? গণ্ডগোল পাকানোর জন্য এসব খুব ক্ষতিকর পরিকল্পনা যেই হোক কোনও ষড়যন্ত্রকারীর। যেভাবেই হোক, দুটো ভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করতে আর কত সময় লাগে? ঘটনা এটাই। যতটা আমি জানি মুসলমানরা এই দাঙ্গা শুরু করার ব্যাপারে আদপেই জড়িত ছিল না।

প্রশ্ন : সম্প্রতি বোম্বাইতে বস্তি উচ্ছেদের ঘটনা নিয়ে যে হৈ চৈ হল–সে সম্পর্কে আপনার মতামত?

উত্তর : আইন তো বলে যে, কোনো লোক কোনো জায়গায় যদি একাদিক্রমে এগারো মাস দখল করে বাস করে থাকতে পারে, সে জায়গার ওপর তার একটা অধিকার জন্মায়। তাহলে, ঐ যে ঝোপড়পট্টির লোকগুলি যারা ওখানে দশ থেকে বারো বছর যাবৎ বাস করছে, তাদেরকে সেই অধিকারটা দেওয়া হবে না কেন? সরকার ওদেরকে ভাড়াটে হিসেবে অধিকার দিয়ে ভাড়া আদায় করছেন না কেন? তার বদলে, ধনীদের প্রয়োজনমতো জায়গাগুলি যেভাবে হোক, খালি করে দেওয়া হয়। কিছুদিন আগে, নৌপাড়ায় ৫০০ ঝোপড়পট্টি জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। বেশ কিছুদিন সেখানে চলেছে সন্ত্রাসের রাজত্ব। ভিকারোলি আর সন্নিহিত এলাকায় ২৫০ ঝোপড়ি ভেঙে ফেলা হয়েছে। পরিণামে যা হয়, বস্তিবাসী ও পুলিশের মধ্যে সংঘর্ষ–তাতে বহু বস্তিবাসী জখম, বহু গৃহহীন অর্থাৎ বেশকিছু গরীব মানুষ মারা যায়।

প্রশ্ন : এই যে দাঙ্গাগুলো ঘটছে, এগুলো কিভাবে থামানো যেতে পারে?

উত্তর : আপনি কোন সমাধানের কথা বলতে চাইছেন? মহামারীর মতো এই ব্যাধি ছড়িয়ে পড়ছে। শিবসেনা তাদের হিন্দু নামক হাতের তাস খেলে যাচ্ছে, কাজের সময় ওদের সামান্যই দেখা যায়। মহালক্ষ্মীতে একটি হনুমান মন্দির ভেঙে ফেলার কথা হয়েছে। বিষয়টি এখনো বিতর্কের পর্যায়ে। আমি কিন্তু ভেঙে ফেলার বিপক্ষে, কিন্তু শিবসেনা তো এই উচ্ছেদের বিরুদ্ধে এগিয়ে আসছে না। মূর্তিগুলিকে তাদের মন্দির বা পবিত্রস্থানটি থেকে ভেঙে ফেলা হোক, আমি চাই না। সবচেয়ে ভালো, মন্দিরটাকে ছোট করে ফেলা যেতে পারে। এইসব দাঙ্গাটাঙ্গা একেবারেই নিরর্থক।

প্রশ্ন : আপনার 'দলিত মুসলিম মাইনরিটিজ সিকিউরিটি অর্গানাইজেশন'–এর উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যটা কি?

উত্তর : আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে, সরকারের অবিচারের বিরুদ্ধে লড়াই করবার জন্য সংখ্যালঘু এবং দলিত সম্প্রদায়ের মানুষদের সংঘবদ্ধ করা। এইজন্যেই আমি দলিত পার্টিগুলিকে একটি মাত্র ফ্রন্টে ঐক্যবদ্ধ হতে আহ্বান জানিয়েছি। তারজন্য যদি কিছু নীতি বাদ দিতে হয় বা বোঝাপড়া বাদ দিতে হয়, তাও ঠিক আছে। প্রত্যেকে যদি এক পা–ও এগোতে পারেন, আমি নিশ্চিত যে আমরা ঐক্যবদ্ধ হতে পারি। ভর্তি পেট যদি রাজনীতির মানদণ্ড হয়, তাহলে, খালি পেট হচ্ছে বিপ্লবের জন্যই।

প্রশ্ন : বিশ্বনাথ প্রতাপ সিংহ কি দলিত সমর্থক?

উত্তর : হ্যাঁ, এটা আমি পূর্ণ বিশ্বাস নিয়েই বলতে পারি যে, বিশ্বনাথ প্রতাপ সিংহ দলিত এবং অন্যান্য দুর্বল শ্রেণীর মানুষদের প্রতি প্রকৃত সহানুভূতি পোষণ করেন। এলাহাবাদ উপনির্বাচনের সময়ে তাঁর মোটর সাইকেলে প্রচার অভিযান একটা জিনিস প্রমাণ করে যে দরিদ্ররাও নির্বাচনে সক্রিয় অংশ নিতে পারে।

প্রশ্ন : মহারাষ্ট্রের রাজনীতি সম্পর্কে আপনি কি ভাবেন?

উত্তর : মহারাষ্ট্রে রাজনীতি এখন একটা বাজে পর্যায়ে। কতকগুলো লোকের হাতেই যেন পুরো ব্যাপারটা। মানসম্মান খুইয়ে নিজেদের কাজ গুছিয়ে নেওয়াটাই এখানকার রাজনীতির একটা অঙ্গ। দুর্বল শ্রেণীর মানুষদের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষ ঘটিয়ে ওরা অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিতে ওস্তাদ। ওই বিভিন্ন আলাদা আলাদা ক্যাম্পে থাকাটাই একটা বিভ্রান্তিকর ব্যাপার!

–প্রেম উপাধ্যায়

অভ্যর্থনা সমিতির চেয়ারম্যান আহমেদ বুখারী আর জাভেদ হাবিব-এর আপত্তির জন্য তাকে আমন্ত্রণ করা সম্ভব হয় নি।'

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে হাজি মস্তানের প্রভাব যে দিন দিন বেড়ে চলেছে তার প্রমাণস্বরূপ বলা যায় ব্লক প্রমুখ বা স্থানীয় নির্বাচনে তাঁর পক্ষের প্রতিদ্বন্দ্বীরা অনেকেই জয়ী হয়েছে। হাজীর সক্রিয়তার প্রশ্নে তার সংগঠনের লোকজনের বক্তব্য, '১৯৯০-এর নির্বাচনের আগেই হাজী নিজের সংগঠনকে মজবুত করার চেষ্টায় আছেন। এজন্য প্রয়োজনীয় কাজও শুরু হয়ে গেছে। জেলাস্তরে সংগঠনকে একত্রিত করা হয়েছে। যদিও হাজির প্রকৃত উদ্দেশ্য 'বোর্ড' স্তরে ঐক্য স্থাপন করা।'

হাজির ঘনিষ্ঠ লোকজনের বক্তব্য অনুযায়ী বলা যায়, হাজি বম্বের স্থায়ী বাসিন্দা হলেও শুরু থেকেই উত্তরপ্রদেশের পূর্বাঞ্চলের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক আছে। জেলা স্তরে নিযুক্ত তাঁর সংগঠনের লোকজন তাঁর সঙ্গে যোগাযোগের জন্য তাঁর বোম্বাইস্থিত কার্যালয়ের ফোন নং ৩৯২৯৩০–এই কথাবার্তা বলে থাকেন।

যাই হোক, ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্খা দেখে মনে হয় আগামী সাধারণ নির্বাচনে তিনি বা তাঁর দলের প্রার্থীরা জেতার জন্য সবরকম চেষ্টাই করবেন। এভাবে রাজনীতির জগতে তাঁর ক্রমপ্রবেশ বিভিন্ন রাজনৈতিক মহলেও আলোড়ন তুলেছে। এ প্রসঙ্গে হাজির ঘনিষ্ঠ জনৈক রাজনীতিকের বক্তব্য, 'মুসলমান আর শোষিত মানুষের এই একতা দেখে আসলে মৌলবাদী আর ঘুঘু রাজনীতিকেরাই আশংকিত হয়ে উঠছে অতঃপর।'

রাজীব সাকসেনা

প্রায় ৪০০০ মন্দির
৪০টি স্নানের ঘাট
১৬০০ গোপিকার কাহিনী
আর অবশ্যই রাসলীলা।

মথুরা আপনাকে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছে। আপনি মাথাপিছু ১০ থেকে ৭৫ টাকার বিনিময়ে থাকার সুব্যবস্থা পাবেন।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবকিছুই পাবেন এই মথুরায়। এই মথুরায় পাবেন থাকার সুব্যবস্থায়। মাথাপিছু ১০ টাকায় ডরমিটরিতে থাকুন বা ৭৫ টাকায় থাকুন বাতানুকূল কক্ষে, আর জপ করুন শ্রীকৃষ্ণের নাম, যা এখানকার প্রায় ৪০০০ মন্দিরে গুঞ্জিত হচ্ছে। ব্রজভূমিতে এমন রাখালের দেখাও আপনার মিলবে, যে হয়ত যাদববংশের উত্তপ্রজন্মের।
মথুরা আর তার চারধারে আছে অনেক দর্শনীয় স্থান। বরষণা, গোকুল, রাধাকুণ্ড, বৃন্দাবন, নন্দগ্রাম এমনি আরও অনেক।
যে কোনও জায়গায়ই আপনি যান, যাত্রী নিবাস বা ট্যুরিস্ট বাঙ্গলোতে আপনার থাকার জায়গা সুনিশ্চিত।

আপনাকে একটি ধারণা দেওয়ার জন্য:

ট্যুরিস্ট বাংলো
বরষণা – ২০ শয্যার
(দিল্লি থেকে ১৯৫ কি·মি· দূরে)
ট্যুরিস্ট বাংলো
গোকুল
ফোন–৪৩ – ২০ শয্যার
(দিল্লি থেকে ১৫৩ কি·মি· দূরে)
ট্যুরিস্ট বাংলো
সিভিল লাইনস
মথুরা ১৪ শয্যা
(দিল্লি থেকে ১৪৫ কি·মি· দূরে)
ট্যুরিস্ট বাংলো
রাধাকুণ্ড
(দিল্লি থেকে ১৬৯ কি·মি· দূরে)

বেরিয়ে পড়ুন, দেখুন স্বর্গীয় সুরলহরীর স্রষ্টার নিবাসস্থল। কান পাতলে হয়তো শুনতে পাবেন সেই বাঁশির সুর··· দিল্লি থেকে নিয়মিত কণ্ডাকটেড ট্যুরের ব্যবস্থা আছে:
বিশদ বিবরণের জন্য যোগাযোগ করুন:

উত্তর প্রদেশ ট্যুরিজম ডেভলপমেন্ট করপোরেশন লিমিটেড
চন্দ্রলোক
৩৬, জনপথ, নতুন দিল্লি–১১০০০১
ফোন: ৩৩২২২৫১
বা দেশের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত উত্তর প্রদেশ সরকারের ট্যুরিস্ট অফিসগুলিতে।
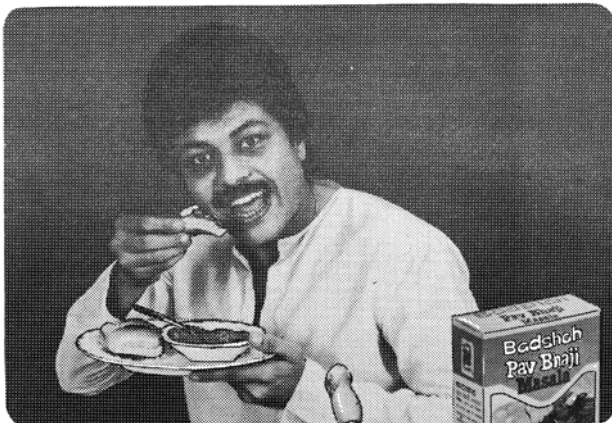
৫ পৃষ্ঠার পর

তার গভীর প্রেম শুরু হয়েছে। একদিন জামাইবাবু অজয়ের ব্যাপারে ইরাকে সরাসরি প্রশ্ন করলেন। ইরা সংকোচ না করে সবকথা জানিয়ে দিল। সে যে জীবনে অজয়কে ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করার কথা ভাবতেই পারে না, সেকথাও স্পষ্ট জানাল। ডাঃ বিষ্ণু আপত্তি করলেন না।

জামাইবাবু রাজী হয়েছেন দেখে ইরা একদিন অজয়কে আবেগের সঙ্গে সেকথা জানিয়ে জিগ্যেস করল তারা কবে বিয়ে করবে। অজয় গম্ভীরভাবে ইরাকে প্রত্যাখ্যান করে জানাল, সে ইরাকে বিয়ে করতে পারছে না। সামনের সাতই ডিসেম্বর তারিখে তার বিয়ে অন্যত্র ঠিক হয়ে গেছে। ইরা প্রথমে বিশ্বাস করতে পারেনি সেকথা। কিন্তু বিশ্বাস করতে হল। দীর্ঘদিনের প্রেম, পারস্পরিক বিশ্বাস এবং ভালবাসাকে এত সহজে ধুলোয় মিশে যেতে দেখে তার মাথা ঘুরতে লাগল। সে সোজা বাড়ি চলে এল। সারারাত যন্ত্রণায় ছটফট করতে থাকল।

দিদি জামাইবাবুও সব ঘটনা শুনে হতভম্ব।

ইরাদেবী, জেলে যাবার আগে

রাত আটটা নাগাদ একটি পুলিশ জীপ ডাঃ বিষ্ণুর বাংলোর সামনে এসে দাঁড়াল। ইরাকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেল, তার বিরুদ্ধে অভিযোগ, সে নাকি পাগল হয়ে গেছে। এস আই শ্রী বি এন সাহার অভিযোগের ভিত্তিতে ইরাকে গ্রেপ্তার করা হয়। ব্যস, এইদিন থেকেই শুরু হলো শ্রীমতী ইরাদেবীর জীবনের বিপর্যয়।

সমাজসেবী এবং আইনজীবী শিবশঙ্কর চক্রবর্তী

তাঁরা অজয়ের বিরুদ্ধে আদালতে যাবার কথা ভাবলেন, কিন্তু ইরা তাতে রাজী হল না। দিদি জামাইবাবু অনবরত সান্ত্বনা দিয়ে দিয়ে অবশেষে ইরাকে অফিসে জয়েন করতে রাজী করালেন। ১৯৬২ সালের ৫ ডিসেম্বর। আর দুদিন পর অজয়ের বিয়ে। অফিসে চুপচাপ বসে আছে ইরা। তার কিছুই ভাল লাগছে না, অস্থির মনে হয় সবসময়, অফিসের কাজেও মন বসে না। এসময় হঠাৎ এস আই সাহেব শ্রী বি এন সাহা ইরাকে ডেকে পাঠালেন। একটি জরুরী কাজে একটা ফাইল নিয়ে ইরাকে কয়েকদিনের জন্য পুরুলিয়ার বাইরে যেতে অনুরোধ করলেন। ইরা হিসেব করে দেখল, অজয়ের বিয়ের দিন সে ফিরতে পারবে না। সে অনুনয়ের স্বরে বলল, 'স্যার, অন্য কাউকে পাঠান, আমি যেতে পারবো না।' এস আই বললেন, 'কেন? আপনার অসুবিধেটা কোথায়? তাছাড়া, আর তো কেউ নেই এমুহূর্তে এখানে, এই কাজে পাঠানোর মত।' ইরা অসুবিধের কথা খুলে বলতেও পারে না, শুধু 'আমি যাব না, যেতে পারবো না' এই কথা বলতে থাকে। এস আই-এর ধৈর্যচ্যুতি ঘটতে থাকে, তিনি কড়াস্বরে ধমকে ওঠেন ইরাকে। ইরা-ও একটা পেপার ওয়েট নিয়ে এস আই-এর দিকে ছুঁড়তে যায়। কিন্তু উপস্থিত আর্দালি তাকে সামলে নেয়। অফিস সুদ্ধ হৈ চৈ পড়ে যায়।

ঐদিন রাত আটটা নাগাদ একটি পুলিশ জীপ ডাঃ বিষ্ণুর বাংলোর সামনে এসে দাঁড়াল। ইরাকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেল, তার বিরুদ্ধে অভিযোগ, সে নাকি পাগল হয়ে গেছে। এস আই শ্রী বি এন সাহার অভিযোগের ভিত্তিতে ইরাকে গ্রেপ্তার করা হয়। ব্যস, এইদিন থেকেই শুরু হলো শ্রীমতী ইরাদেবীর জীবনের বিপর্যয়। এই নারকীয় মানসিক ও শারীরিক অত্যাচারের কাহিনী যেমন অবিশ্বাস্য, তেমনই করুণ।

ডাঃ বিষ্ণু ইরাকে ছাড়াবার খুব চেষ্টা করলেন। কিন্তু পুলিশ ইরাকে ছাড়ল না, সে নাকি এখন মানুষ খুন করতেও পারে! ৬ ডিসেম্বর ১৯৬২ পুরুলিয়া পুলিশ ভারতীয় উন্মাদ অধিনিয়ম ১৯১২-এর ৩৮ নম্বর ধারায় ইরাকে আদালতে পেশ করে নিয়ে গেল পুরুলিয়া জেলে। ১৯৬৩ সালের জানুয়ারিতে ইরাকে পাঠানো হয় রাঁচী মেন্টাল হাসপাতালে। তার একমাস পর ফের পুরুলিয়া জেলে। এই জেলে ইরা চারবছর কাটান। ইরার বক্তব্য, জেলে তার ওপর অকথ্য মানসিক ও দৈহিক নির্যাতন চলত। লেডি জেল মেট তার মাথায় লাঠি দিয়ে দিয়ে অকারণে মারতেন। মাথায় এহেন নিয়মিত আঘাতের ফলে ইরাদেবীর মাথায় সত্যি সত্যি সামান্য গণ্ডগোল দেখা দেয়। পুরুলিয়া জেলে চারবছর কাটানোর পর ইরাকে পাঠানো হয় লালগোলা জেলে। কয়েকবছর পর ফের আনা হয় পুরুলিয়া জেলে। ১৯৭৫ সালের গোড়ায় ইরাকে আবার রাঁচী মেন্টাল হাসপাতালে পাঠানো হয়। ছ'মাস পর্যবেক্ষণ করে ডাক্তাররা রিপোর্ট দিলেন,

ইরাদেবী পুরোপুরি সুস্থ। ৭৫ সালের শেষদিকে ইরাদেবীকে মুক্তি দেওয়া হয়। ১৩-১৪ বছর জেলে কাটিয়ে ইরাদেবী পুরনো চাকরিতে ফের যোগ দিলেন। প্রেমিক অজয়কে খুঁজলেন। কিন্তু অজয় স্বেচ্ছায় ট্রান্সফার নিয়ে বাইরে চলে গেছে ততদিনে। ইরা খোঁজখবর নিয়ে জানতে পারলেন, অজয় ইরার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে অন্য মেয়েকে বিয়ে করেছিল শুধু প্রচুর পণের লোভে। অজয়ের নীচতার কথা ভেবে ইরাদেবী ফের মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন। পুরুলিয়া জেল, বছরখানেক সেখানে রেখে তাকে পাঠানো হল প্রেসিডেন্সি জেলে। এখানেও তাকে প্রায়ই মারধোর করা হত। তিনি বহুবার জেল কর্তৃপক্ষকে একথা জানিয়েছিলেন, কোন ফল হয়নি।

প্রেসিডেন্সি জেলে ছ'বছরের মতো কাটিয়ে ১৯৮'৩ নাগাদ ইরাকে নিয়ে আসা হয় পুরুলিয়া জেলে আবার। দু'বছর পর ১৯৮৫ তে ফের প্রেসিডেন্সি জেল। এখানে কতকগুলি প্রশ্নের সদুত্তর কিছুতেই পাওয়া যায়নি—প্রথমত, ইরাকে এভাবে অনর্থক জেল থেকে জেলে কি উদ্দেশ্যে বারবার পাঠানো হল? দ্বিতীয়তঃ সে যদি পাগলই হবে তবে তার চিকিৎসার জন্য বিন্দুমাত্র চেষ্টা করা হয়নি কেন? এরকম বহু প্রশ্ন।

এই দীর্ঘ সময়ে ইরার জামাইবাবু ডাঃ বিষ্ণু, দুই ভাই স্বপন ও তপন মিত্র নিয়মিত চেষ্টা চালিয়ে গেছেন ইরাকে জেল থেকে ছাড়িয়ে আনবার জন্য। তাদের সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়। ইতিমধ্যে ১৯৭৩ সালে স্বপনবাবুর এবং ১৯৮০ তে তপন বাবুর বিয়ে হয়ে গেছে। স্বপন-এর দুটি ট্যাক্সি আছে তপনবাবু স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার ভবানীপুর শাখায় কর্মরত। ১৯৮৮ সালের এপ্রিল মাসে পার্কসার্কাসের লুম্বিনী পার্ক মেন্টাল হাসপাতালে ইরাদেবীকে পাঠানো হয়। ডাক্তার রঞ্জন সেন ইরাদেবীকে পরীক্ষা করে জানালেন, ইরাদেবী সম্পূর্ণ সুস্থ।

পুরুলিয়ার এস ডি জে এম শ্রীযুক্ত এ সি দত্ত ১৮ জুলাই ১৯৮৮ তারিখে প্রেসিডেন্সি জেলের জেলার শ্রী এ কে ঘোষকে নির্দেশ দিলেন, ইরাকে যেন মুক্তি দেওয়া হয়। ইরার ভাই স্বপন মিত্র সেই আদেশের প্রতিলিপিসহ জেলারের সঙ্গে দেখা করলেন। কিন্তু দেখা গেল, আদালতের নির্দেশও এখানে গুরুত্বহীন। স্বপনবাবু প্রখ্যাত সমাজসেবী ও নামকরা আইনজীবী শ্রীযুক্ত শিবশঙ্কর চক্রবর্তীর সঙ্গে দেখা করলেন আগস্ট মাসের চার তারিখে। শিবশঙ্করবাবু সমস্ত ঘটনা শুনে বিচলিত হয়ে পরের দিনই দেখা করলেন সমাজকল্যাণ ও কারামন্ত্রী বিশ্বনাথ চৌধুরীর সঙ্গে। তাতেও কোন কাজ হল না দেখে আগস্টের সাত তারিখে শিবশঙ্করবাবু ফের মন্ত্রীমহোদয়ের কাছে গেলেন। তিনি জানালেন, ইরাদেবীকে অবিলম্বে মুক্তি না দিলে মন্ত্রীর বাসভবনের সামনে তিনি আমরণ অনশন শুরু করবেন। এবার কাজ হলো, মন্ত্রী মহাশয় ডি আই জি (জেল) শ্রী কে এস মোহন-কে ডেকে ইরাকে অবিলম্বে মুক্তি দিতে বললেন।

ছাব্বিশ বছর জেলে কাটানোর পর ইরাদেবী ৭ আগস্ট ১৯৮৮ মুক্তি পেলেন। বিনা অপরাধে জীবনের সবচাইতে ভালসময়টা তার অকারণে নষ্ট হয়ে গেল! এর মধ্যে ১৯৮৪ সালের ২২ জুন ওদের মা-ও মারা গেছেন। আইনজীবী শিবশঙ্করবাবুর সহায়তায় ইরাদেবী চেষ্টা করছেন, চাকরিটায় যদি ফের জয়েন করা যায়।

এই প্রতিবেদক ইরাদেবীর সঙ্গে দেখা করেছিলেন। ইরাদেবীর কথাবার্তা, আচার আচরণ, পুরনো দিনের স্মৃতি নিয়ে আলোচনা এসবে বিন্দুমাত্র মনে হয় না যে তিনি অপ্রকৃতিস্থ। কতকগুলি নতুন কেনা খেলনা দেখিয়ে জিগ্যেস করলাম, ওগুলো কার জন্য কিনেছেন? ইরাদেবী বললেন, অজয়ের ছেলেমেয়ের জন্য। মেয়েটা অবশ্য বড় হয়ে গেছে, ছেলেটা ছোটই, বারো বছরের। কিন্তু ভয় হয়, অজয় আমায় চিনতে পারবে তো?

ইরাদেবীর দুটি চোখ ছলছল করে উঠল।

—বিশেষ প্রতিনিধি

মহিন্দর অমরনাথের বাদ যাওয়া ও কিছু প্রশ্ন

ভারতীয় ক্রিকেটে অনেক যুদ্ধের নায়ক মহিন্দর অমরনাথকে আবারো বাদ দেওয়া হলো। এই বাদ দেওয়াকে কেন্দ্র করে দেশ জুড়ে বিতর্ক। অমরনাথ ঘোষণা করেছেন যোগ দিতে চলে যাবেন দক্ষিণ আফ্রিকান ক্রিকেটে। সত্যিই কি তাই? প্রয়োজনীয় ফর্ম থাকা সত্ত্বেও কেনই বা তাকে বাদ দেওয়া হলো?

বিগত কয়েক বছর থেকে ভারতীয় ক্রিকেটে দেখা যাচ্ছে সিজন শুরু হওয়া থেকেই কোন না কোন বিবাদ বিতর্ক শুরু হয়ে যাচ্ছে। কোনও না কোনও খেলোয়াড় নির্বাচক মণ্ডলীর পক্ষপাতের শিকার হচ্ছেন। প্রশংসিত ভূমিকা নেওয়া সত্ত্বেও তাঁকে টিম থেকে বসিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এ প্রসঙ্গে ১৯৮৬ সালের কথা উল্লেখ করা যায়। ১৯৮৬ সালে অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে 'ওয়ান ডে' খেলাগুলিতে সুনীল গাভাসকারকে টিমের বাইরে রাখা হয়েছিল।

এ বছর নিউজিল্যান্ডের সঙ্গে টেস্ট শুরু হতেই সেই কোঁদলের স্পষ্ট রূপ আবারও সামনে এসে পড়ে। এই খেলার ১৪ জনের যে লিস্ট দেওয়া হয়েছিল দেখা গেল তা থেকে মহিন্দর অমরনাথের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে। অথচ ঢাকাতে গত এশীয় কাপে অমরনাথের ভূমিকা অবশ্যই প্রশংসনীয় ছিল। ভারতের জয়লাভে তাঁর ভূমিকাকে প্রাধান্য দিলেও খুব ভুল হবে বলে মনে হয় না। একটানা ক্রিজে টিকে থেকে ৭৪ রান করে ভারতের জয়কে এগিয়ে দিয়েছিলেন তিনি।

এশীয় কাপে ভারত-পাকিস্তানের খেলায় পাকিস্তানের ১৪২ রানের মোকাবিলায় ভারত যখন ব্যাট করতে ময়দানে আসে প্রথমদিকে খেলা খুব একটা উৎসাহব্যাঞ্জক ছিল না। কিন্তু মহিন্দর অমরনাথ ও শ্রীকান্ত খেলায় একটা স্থিরতা আনতে সক্ষম হন। ৭৬ রানের মাথায় যখন কাদির শ্রীকান্ত এবং অধিনায়ক বেঙ্গসরকারের উইকেট দুটি নিয়ে নেয়। তখন ভারতীয় টিম যথেষ্ট শঙ্কটের মধ্যে পড়ে। এ অবস্থায় অমরনাথ যথেষ্ট সংযমের সঙ্গে খেলে ভারতকে জয়ের মুখ দেখায়।

নির্বাচক মণ্ডলীর এই পক্ষপাতদুষ্ট দৃষ্টিভঙ্গীর পাশাপাশি এবার আরো দুটি খবর মাথা চাড়া দিয়েছে অমরনাথ সম্পর্কে। প্রথমটি তিনি ক্রিকেটের নির্বাচক মণ্ডলীকে জোকার বলেছেন এবং দ্বিতীয়ত তিনি দক্ষিণ আফ্রিকা যাচ্ছেন! ব্যক্তিজীবনে মহিন্দর অমরনাথ মৃদুভাষী, অমায়িক, সজ্জন মানুষ। টেস্ট ক্রিকেটে ১৯ বছর অতিক্রম করে এসেছেন তিনি। এই ১৯ বছরে কম করে তিনবার তিনি নির্বাচক মণ্ডলীর আঘাত মুখ বুজে সহ্য করে এসেছেন। কিন্তু এবারেও ক্রিকেট কর্তাদের সিদ্ধান্তে তিনি বিমর্ষ হয়ে পড়েন। এবং

ক্ষোভে জর্জরিত হয়ে পড়ায় তাঁর মুখ থেকে এই ক্ষেদোক্তি প্রকাশ হওয়া কিছু অস্বাভাবিক নয়।

এটাও সত্য যে নির্বাচকরা একবার রবি শাস্ত্রীকেও টিম থেকে বের করে দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তারই তিন সিজন পূর্বে একবার কপিলদেবকে এবং তারও আগে একবার গাভাসকারকে টিম থেকে বের করে দেওয়ায় তাঁদেরকে যে পরবর্তী পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হয়েছিল সম্ভবত সেই স্মৃতিই তাঁদের নিরস্ত্র করেছিল।

কিন্তু অমরনাথকে বার বার এইভাবে বসে যেতে হচ্ছে কেন? ভাল ভূমিকা, ভাল ফর্মে থাকা সত্ত্বেও নির্বাচক মণ্ডলী তাঁকে কোণঠাসা করে রাখছে কেন? এ প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন 'আমাকে বাদ দেওয়া হচ্ছে কারণ আমার নামের সঙ্গে অমরনাথ শব্দটি জুড়ে আছে যে,' অমরনাথের চোখে মুখে ক্ষোভ ফুটে ওঠে। 'নির্বাচক মণ্ডলীর খেলোয়াড় নির্বাচনের দুটি মানদণ্ড আছে। একটা আমার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য অন্যটি বাকি যে কোন খেলোয়াড়ের জন্য।'

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে ১৯৭৯-৮০ অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে বোম্বাইতে টেস্ট খেলায় অস্ট্রেলিয়ার দুর্ধর্ষ বোলার রডনী হগের বাম্পার বলের সামনে ঠিকভাবে মোকাবিলা করতে না পারার জন্য তাঁকে টিমে চান্স দেওয়া হয়নি। কিন্তু ১৯৮২-৮৩র পাকিস্তান এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজের সঙ্গে খেলায় পাকিস্তান ও ওয়েস্ট ইন্ডিজের সব থেকে তুখোড় বোলার ইমরান, সরফরাজ, রবার্টস, হোল্ডিং, গার্নার এবং মার্শালের মত বোলারদের বলে অবিস্মরণীয় সব ইনিংস খেলে এই সব নির্বাচকদের এবং বিভিন্ন সমালোচকদের উপযুক্ত জবাব দিয়েছিলেন তিনি। তাঁর মতে নির্বাচকমণ্ডলী যে পক্ষপাত দোষে দুষ্ট তার প্রমাণ রবি শাস্ত্রী ও আজাহারউদ্দীন। নির্বাচন যদি সঠিক হত তাহলে রবি শাস্ত্রী বা আজাহারউদ্দীন এমন অবলীলায় ভারতীয় টিমে থাকতে পারতো কিনা সে ব্যাপারে সন্দেহ আছে।

১৯৮৯র মার্চে দক্ষিণ আফ্রিকা ক্রিকেট ইউনিয়ন তাঁদের ইউনিয়ন স্থাপনার শতবর্ষ উদযাপন করবেন। গত জুলাই মাসে লণ্ডনে ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট কনফারেন্সে (আই সি সি) দক্ষিণ আফ্রিকার ক্রিকেট ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট এবং ম্যানেজার ডাঃ আলি এচার এবং পামেস্কি দুজনেই উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে তাঁরা আই-সি-সি-র সমস্ত সদস্যকেই আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

১৯৮২ সালে ওয়েস্ট ইন্ডিজের ব্যাটসম্যান আলভিন কালিচরণকে অস্ট্রেলিয়ার সফর থেকে বাদ দেওয়ায় তাঁর মানসিক অবস্থা যে একাকীত্বে তাঁকে এনে দাঁড় করিয়েছিল ভারতীয় টিম থেকে বাদ পড়ায় মহিন্দর অমরনাথের মানসিক অবস্থাও আজ সেই অবস্থায়।

দক্ষিণ আফ্রিকায় যাবার মত সংকীর্ণ মনোভাব কেন নিলেন কালীচরণ? প্রশ্ন করা হলে তাঁর বক্তব্য ছিল 'না গিয়ে কি এখানে না খেয়ে মরবো?' আজ যদি অমরনাথও কালীচরণের মত অসহায় বোধ করে দক্ষিণ আফ্রিকা যাবার কথা বলেন তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই। একদিকে তার ক্রিকেট কেরিয়ার নষ্ট হতে চলেছে অন্যদিকে মোটারকমের অর্থের প্রলোভন, যা সোনালী দিন তা তো প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে রেকর্ডবুকেই।

কিন্তু সত্যিই কি অমরনাথ দক্ষিণ আফ্রিকা যাচ্ছেন? অমরনাথের খবরের পাশাপাশি ক্রিকেটসূত্র থেকে এমনও শোনা যাচ্ছে শুধু তিনিই নন তাঁর মত যাঁদের হয় টিম থেকে বাদ দেওয়া

ভারত আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক মঞ্চে সর্বদা দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধেই সোচ্চার হয়েছে। যদি এর পরিপ্রেক্ষিতে কেউ দক্ষিণ আফ্রিকায় অংশ গ্রহণ করে তাহলে ভারতীয় রাজনীতিতে যথেষ্ট সোরগোল পড়ে যাবে-এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

হয়েছে বা টেস্ট টিমে চান্সই দেওয়া হয়নি এমন অনেক ভারতীয় খেলোয়াড়কেই দক্ষিণ আফ্রিকা যাওয়ার ব্যাপারে রাজি করানো হয়েছে। যাঁরা তাঁর মতই আশা নিরাশার দ্বন্দ্বে ঝুলে আছেন। শোনা যাচ্ছে এঁদেরকে মোটারকম অর্থের প্রলোভন দেখানো হয়েছে। এ অবস্থায় বিদ্রোহী হয়ে ওঠা অস্বাভাবিক নয়। কেরি প্যাকারের সময়ও এরকম ঘটনার কথাও শোনা গিয়েছিল একবার।

অপরদিকে রাষ্ট্রসংঘ দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত খেলোয়াড়দের একটা ব্ল্যাক লিস্ট তৈরি করেছে। রাষ্ট্রসংঘের পক্ষ থেকে সমস্ত আন্তর্জাতিক ক্রীড়া সংগঠনগুলিকে অনুরোধ করা হয়েছে যাতে কালো তালিকার এই সব খেলোয়াড়দের অন্তরাষ্ট্রীয় খেলায় অংশ গ্রহণের অনুমতি না দেওয়া হয়। প্রতিবন্ধকতা জারি হওয়ার পর ইতিপূর্বে কোন ভারতীয় খেলোয়াড় খেলতে দক্ষিণ আফ্রিকায় যায় নি। ভারত আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক মঞ্চে সর্বদা দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধেই সোচ্চার হয়েছে। যদি এর পরিপ্রেক্ষিতে কেউ দক্ষিণ আফ্রিকায় অংশ গ্রহণ করে তাহলে ভারতীয় রাজনীতিতে যথেষ্ট সোরগোল পড়ে যাবে—এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। এতে ভারতের বৈদেশিক নীতির উপরও আত্মঘাতী আঘাত পৌঁছোতে পারে।

এদিকে দক্ষিণ আফ্রিকার শতাব্দী সমারোহে কাদেরকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে এ বিষয়ে ডাঃ এচারকে প্রশ্ন করা হলে উত্তরে তিনি বলেন, 'অনেকের সঙ্গেই যোগাযোগ করা হয়েছে অনেকে সম্মতিও দিয়েছেন। কিন্তু এ প্রসঙ্গে নাম উল্লেখ করা সম্ভব হচ্ছে না।' এ জাতীয় উত্তরে রহস্য আরও ঘনীভূত হয়ে উঠেছে। এই সূত্র থেকে ধরা হচ্ছে বিভিন্ন দেশের ২৫০ জন ক্রিকেট নির্বাচক এবং ৫০ জন খ্যাতিমান খেলোয়াড়কে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। এর মধ্যে অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যাণ্ড, ভারত, পাকিস্তান, নিউজিল্যাণ্ড, শ্রীলঙ্কা এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজের বোর্ড সদস্যরাও নাকি আছেন। কোনও খেলোয়াড়ের দক্ষিণ আফ্রিকায় যাওয়ার ব্যাপার হলে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়ে থাকে। কিন্তু এখন ক্রিকেট নির্বাচকদের প্রশ্নও এসে যাচ্ছে এখন কি ব্যবস্থা নেওয়া হবে?

নির্বাচক মণ্ডলীর শিকার মহিন্দর অমরনাথ দক্ষিণ আফ্রিকা যাবেন কিনা তা সময়ই বলবে। আবার অন্যমহলের মন্তব্য সম্ভবত তাঁর নামে এইসব কথা ফেনিয়ে তোলা হয়েছে যাতে ক্রিকেট বোর্ডের নির্বাচক মণ্ডলীরা নিজেদের ভুলকে বুঝতে পারেন। এবং অমরনাথের পুনরায় টিমে ফিরে আসার পথ সুগম হয়। এখন আমাদের সঠিক সময়ের অপেক্ষায় থাকা ছাড়া কিছু করার নেই।

তবে এ প্রসঙ্গে লালা অমরনাথ যাই বলুন ভারতীয় ক্রিকেট টিমের নির্বাচকমণ্ডলীর সদস্যরা মহিন্দরের এই বাদ যাওয়ার ব্যাপারটাকে খুব একটা অন্যায্য কিছু মনে করছেন না। তাঁদের বক্তব্য 'উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম এইসব প্রান্তীয়তাবাদ কারা রটায় বলুন তো! দিল্লি, বম্বে আবার কি? একজন খেলোয়াড় যখন দেশের জাতীয় টিমের হয়ে নিয়মিত খেলা শুরু করে, তখন সে কোনও প্রান্তের থাকেনা—সর্বভারতীয় হয়ে যায়।'

তবে নির্বাচকদের মধ্যে মতভেদ তো আছেই। মনসুর আলি খান পতৌদি যেমন বলেছেন, 'যদি ওয়ান ডে ম্যাচ না থাকত, তাহলে কপিলদেবের এতদিন ভারতীয় টিমে টিকে থাকাটাই আশ্চর্যের!' এ ব্যাপারে কে কি বলবেন?

—রবি চতুর্বেদী

সেই অভিশপ্ত ছবিটি

পৃথিবীতে দু'একটি এমন বিস্ময়কর ঘটনা ঘটে, যার ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া সহজসাধ্য হয়ে ওঠে না। একটি ছবিকে ঘিরে নানা অলৌকিক ঘটনা ঘটে যাওয়ার এই কাহিনীটিও অবিশ্বাস্য মনে হতে পারে। ছবিটি হচ্ছে একটি ক্রন্দনরত শিশুর।

ইটালীর এক শিল্পী গ্রাহাম ব্রাগোলিন অঙ্কিত একটি পেন্টিং থেকে ছবিটির অনুলিপি বহু ক্রেতাকে আকৃষ্ট করেছিল সেসময়। ব্রাইন স্টারফোর্ড একজন রাজমিস্ত্রি। ছবিটি তিনিও কিনে ফেললেন নিজের লিভিংরুমে টাঙিয়ে রাখবেন বলে। বাস্তবিক, ছবিটির মধ্যে একটা সজীব মানবিক আবেদন ছিল, যা প্রকৃতই মর্মস্পর্শী।

কিন্তু স্টারফোর্ড ছবিটি যেদিন বাড়িতে এনে টাঙালেন, ঠিক তারপর থেকে ঘটে যেতে থাকল নানারকম ভয়াবহ সব ঘটনা। পরের দিনই সকালে দেখা গেল লিভিংরুমটি যেন কেউ তছনছ করে গিয়েছে। সমস্ত জিনিসপত্র লণ্ডভণ্ড। রাত্রিবেলা যেন একটা ভূমিকম্প ঘটে গেছে ঘরটায়। এমনকি দেয়ালের অন্যান্য পেন্টিংগুলোকেও কেউ যেন উপড়ে মেঝের কার্পেটে ফেলে রেখে দিয়েছে। আশ্চর্যের বিষয়, 'ক্রন্দনরত শিশু' ছবিটি কিন্তু যথাস্থানে। অক্ষত অবস্থায় রয়েছে।

দ্বিতীয় রাত্রে স্টারফোর্ডের বাড়ির সকলে সারারাত ঘুমোতে পারলেন না। তাঁরা সারারাত ধরে সমস্ত বাড়ি জুড়ে একটা পায়ের আওয়াজ শুনতে পেলেন। যেন অদৃশ্য কেউ আস্তে আস্তে পায়চারী করেই চলেছে।

আতঙ্কিত এবং বিভ্রান্ত স্টারফোর্ড পরিবার কিছুই বুঝতে পারছিলেন না। তৃতীয় রাত্রে তাদের বাড়ির সমস্ত আলোগুলো আপনা আপনি জ্বলতে থাকল, আবার নিভতে থাকল। দরজা জানলাগুলি আপনা আপনি খুলে যেতে থাকল আবার বন্ধও হতে থাকল। চতুর্থ রাত্রিও কাটল এভাবেই যেন একটা দুঃস্বপ্নের মধ্যে দিয়ে।

পঞ্চম রাত্রে স্টারফোর্ডের পাঁচবছরের মেয়ে রেবেকা হঠাৎ তীব্র চীৎকার করে নিজের বিছানা ছেড়ে ছুটে এল মা-বাবার বিছানায়। ভয়ে তার মুখ সাদা হয়ে গেছে। সে দেখেছে, একটা বৃদ্ধা স্ত্রীলোক যেন তার বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে আছে।

পরের দিন স্টারফোর্ডের একটা দুর্ঘটনা ঘটল। একটা বাড়ি তৈরির কাজে তিনি ব্যস্ত ছিলেন। দশমিটারের মত উঁচু মাচানে দাঁড়িয়ে কাজ করছিলেন তিনি, হঠাৎ তাকে কেউ যেন ধাক্কা দিয়ে নিচে ফেলে দেয়। সুস্থ হতে দিন দুয়েক লেগে গেল তার।

যে অগ্নিকাণ্ডে লোহালক্কড় পর্যন্ত গলে গিয়েছিল, সে আগুনে একটা সামান্য ছবির কিছুই হয়নি। ছবিটি ছিল একটি ক্রন্দনরত শিশুর। ব্রিটেনে দারুণ জনপ্রিয় ছিল সেসময়। ছবিটিকে ঘিরে ঘটে যেতে থাকে রহস্যময়, ভয়ানক, অলৌকিক সব ঘটনা…।

ব্রাইন স্টারফোর্ড একটা জিনিস উপলব্ধি করছিলেন, সেটা হল, এসব দুর্ঘটনার মূলে যে কোন একটাই কারণ কাজ করছে, কিন্তু সেটা কি, তিনি বুঝতে পারছিলেন না।

দু'একদিন পর স্টারফোর্ড ফের দুর্ঘটনায় পড়লেন, গাড়ি চালাতে চালাতে হঠাৎ স্টিয়ারিং হুইলের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন তিনি এবং গাড়ি সজোরে ধাক্কা খায় একটা লাইটপোস্টে। অল্পবিস্তর আহত হলেন তিনি, সৌভাগ্যক্রমে বড় চোট লাগে নি।

স্টারফোর্ড এবার কিম লিমেজ নামে জনৈক ব্যক্তির শরণাপন্ন হলেন। কিম সেসময় ওঝা হিসেবে বেশ নামকরা। কিম এলেন স্টারফোর্ডের বাড়িতে। এসেই ঘোষণা করলেন, যত নষ্টের মূল হচ্ছে ঐ 'ক্রন্দনরত শিশু' ছবিটি, ওটা অভিশপ্ত। অবিলম্বে ঘর থেকে ওটা বাইরে নিয়ে গিয়ে পুড়িয়ে ফেলতে হবে। স্টারফোর্ড তো সব শুনে হতভম্ব। ছবিটা তার ভীষণ প্রিয়।

কিন্তু নিরুপায় স্টারফোর্ডকে ছবিটা পুড়িয়ে ফেলতেই হল। আশ্চর্যের বিষয়, ছবিটা পুড়তে সময় নিল পুরো আড়াইঘণ্টা। দগ্ধ ছবিটি থেকে নির্গত চাপচাপ কালো ধোঁয়া চারদিক ঘিরে ফেলল। ভীত স্টারফোর্ড দ্রুত ডেকে আনলেন কিম লিমেজকে। কিম তার ঝাড়ফুঁক দিয়ে ধোঁয়াটাকে সরাতে সক্ষম হলেন। ঠিক সে মুহূর্তে চারপাশ থেকে ভেসে আসতে থাকল একটি শিশুর মৃদু ক্রন্দনধ্বনি।

পরে জানা গেল ব্রিটেনে যাদের যাদের বাড়িতে ঐ ছবিটা ছিল প্রত্যেককেই কিছু না কিছু অশান্তি ভোগ করতে হয়েছে। ছবিটার কিন্তু দারুণ বিক্রি ছিল সেসময়। জানাজানি হয়ে যাবার পর ছবিটার বিক্রি বন্ধ হয়ে গেল, যাদের বাড়িতে ছিল তারা ওটা নষ্ট করে ফেললেন। পরবর্তীকালে মানুষের মধ্যে এমন ভয় ঢুকে গিয়েছিল যে তাঁরা কোন ক্রন্দনরত বাচ্চার ছবি দেখলেই শিউরে উঠতেন।

বহু প্যারা-সাইকোলোজিস্ট ঘটনাটি সম্পর্কে অনুসন্ধান চালাচ্ছেন। 'ওয়ার্ল্ড সাইকিক্যাল রিসার্চ সোসাইটি'-ও এই বিচিত্র ঘটনার আসল কারণ কি হতে পারে, তা জানবার জন্য প্রয়াস করে চলেছেন।

মজার ব্যাপার হচ্ছে, বেশ কিছু অগ্নিকাণ্ড বিধ্বস্ত বাড়ি থেকে ঐ ছবিটিকে অক্ষত অবস্থায় পাওয়া গেছে। লোহা, ধাতুদ্রব্য সব পুড়ে গেছে, অথচ একটা ছবির কিছু হয়নি, এটা খুবই আশ্চর্যের। এটা ফায়ার ব্রিগেড কর্তৃপক্ষও স্বীকার করেছেন। ●

নতুন প্রজন্মের নায়িকা সোনমের সঙ্গে

গত ১৫ নভেম্বর ১৯৮৮, বোম্বাই–এর ব্রাবর্ণ স্টেডিয়ামে ভারত ও নিউজিল্যাণ্ডের টেস্ট ম্যাচ দেখে মানুষ হয়রান হচ্ছিল এই ভেবে যে এ ম্যাচ তো ব্যাঙ্গালোরে হচ্ছে, আর আজ তো রেস্টের দিন! ম্যাচের খবর শুনেই সাধারণ দর্শকদের সঙ্গে সঙ্গে ক্রীড়া সাংবাদিকরাও ভীড় করে আসেন। তাঁদের মনেও তখন এই একই প্রশ্ন উঁকি দিচ্ছিল, 'বিনা প্রচারে এই খেলা এখানে শুরু হল কিভাবে!' সকলেই যখন এ কথা ভাবছে তখন হঠাৎ তাদের চোখ মাঠের মধ্যে এক ব্যক্তির উপর আটকে গেল, যিনি খেলোয়াড়দেরকে কিছু উপদেশ দিচ্ছিলেন। কিন্তু, এ লোকটি তো ক্রিকেটের ধারেকাছেরও লোক নন!

আসলে এটা সত্যিকারের কোন ম্যাচ নয়। একটা ছবির শুটিং। মাঠের মানুষটি দেব আনন্দ! দেব আনন্দ তাঁর নতুন ছবি 'অব্বল নম্বর'–এর শুটিং করছেন। এই খেলায় বিদেশী 'নিউজিল্যাণ্ড' টিমের খেলোয়াড়দের ভাড়া করা হয়েছে। আর ভারতীয় টিমে আছেন মূলত একস্ট্রা অভিনেতারাই। দেব আনন্দ যাকে উপদেশ দিচ্ছিলেন তিনি চলচ্চিত্রের নবানায়ক আমীর খান। দু'জনের মধ্যে বয়েসে প্রায় ৪৮ বছরের ফারাক, কিন্তু স্মার্টনেস, উদ্যম, কর্মক্ষমতায়, সব দিক থেকে দেব আনন্দকে আমীরের থেকে অনেক উজ্জ্বল অনেক সপ্রতিভ মনে হচ্ছিল।

১৮ বছর আগে নার্গিস একবার দেব আনন্দ সম্পর্কে নাকি বলেছিলেন, 'এই বুড়োকে দেখ, যখন ও আমার সঙ্গে নায়ক হয়ে কাজ করতো তখনো যেমন ছিল। পরে আমার ভাইঝি জাহিদার সঙ্গে 'গ্যাম্বলার'–এ নায়ক হয়ে কাজ করেছে তখনও এমন ছিল। যদি ও নিজের নাতনির বয়সী মেয়ের সঙ্গেও কাজ করে তখনও ওকে এমনই লাগবে ২২-২৫ বা ত্রিশ বছরের তরতাজা তরুণ। সময় এবং বয়স সকলকেই প্রভাবান্বিত করে কিন্তু দেব আনন্দ দুটোই নিজের কব্জায় রেখেছেন।'

নার্গিসের কথা বাস্তবিক সত্য। ৫০ বছর বয়েসে দেব আনন্দ অষ্টাদশী যে জাহিদার বিপরীতে নায়ক হিসেবে কাজ করেছেন, সেই জাহিদারই শরীরে এখন বয়েসের ছাপ। নার্গিস বেঁচে থাকলে আজ ঠাকুমা, দিদিমার পর্যায়ে চলে যেতেন। সুরাইয়া আজ বৃদ্ধ বয়সের মধ্য-অঙ্গনে দাঁড়িয়ে। বৈজয়ন্তীমালা, ওয়াহিদা রহমান, হেমা মালিনী, রাখীরা আজ মাঝবয়সকে মেকাপে ঢেকেও নায়িকার রোল করার কথা ভাবতে পারেন না, কিন্তু দেব আনন্দ এই সব প্রজন্মকে ছুঁয়ে ছুঁয়েও নিজেকে যেন একই জায়গাতে ধরে রেখেছেন। আজ ১৫-১৬ বছরের একতা, সোনম তাঁর সঙ্গে রোমান্টিক চরিত্রে অভিনয় করার জন্য উঁচিয়ে আছে। আজও ১২-১৩ বছরের কিশোরীদের স্বপ্নের রাজপুরুষ দেব আনন্দ। এইসব কিশোরীদের ঠাকুমা দিদিমারাও এক সময় দেব আনন্দকে তাঁদের স্বপ্নের রাজপুরুষ ভেবে তার ছবি গোপনে

তিন প্রজন্মের নায়ক !

হেমা মালিনীর সঙ্গে দেব আনন্দ

বয়ে বেড়াতেন। এমনিতেও বোম্বাইতে বেড়াতে আসা যে কোন বয়সের মহিলাই দু'জন ব্যক্তির দেখা পাওয়ার প্রত্যাশায় থাকেন, তাঁরা হলেন দেব আনন্দ আর অমিতাভ বচ্চন।

প্রায় সওয়া চার দশক ধরে তিনি দর্শকের হৃদয়ে রাজত্ব করে আসছেন, যা সম্ভবত বিশ্বের চলচ্চিত্র ইতিহাসে অভূতপূর্ব। দেব আনন্দের জনপ্রিয়তাকে সভা সমিতিতে দর্শকবৃদ্ধির কাজে স্বাধীনতার আগে যেমন তার পরেও এই চার দশকে রাজনৈতিক নেতারা ব্যবহার করেছেন। এ প্রসঙ্গে জওহরলাল নেহেরুর নামও উল্লেখ করা যেতে পারে। নেহেরুজী একাধিকবার কংগ্রেসের

মীণাক্ষী শেষাদ্রী ও দেব আনন্দ

ছবি: টি-এস- প্রসাদ

বম্বের চিত্রজগতে প্রায় অর্ধশতক পার করে দিতে চলেছেন দেব আনন্দ। প্রকৃত অর্থেই তিনি বোধহয় চিরতরুণ! যাদের সঙ্গে তিনি অভিনয় শুরু করেছিলেন নায়ক হিসেবে সেই সব নায়িকার নাতনীদের সঙ্গেও এখন সমানে নায়কের অভিনয় করে চলেছেন তিনি। এই চমকপ্রদ ব্যক্তিত্বটিকে নিয়ে এক আকর্ষণীয় প্রতিবেদন।

অধিবেশনে দেব আনন্দকে আমন্ত্রণ করেছেন, নেহেরুজীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক চিরদিনই মধুর ছিল।

১৯৭৭ সালে জরুরী অবস্থা শেষ হওয়ার পর বিরোধী দল নেতারা জনতা পার্টি তৈরি করলে ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রীর অনেকেই তাঁদের সমর্থন করার কথা বললেও যতক্ষণ দেব আনন্দ প্রকাশ্যে সামনে না এসেছেন সকলেই পর্দার আড়ালে থেকে আশ্বাস দিয়েছেন। কিন্তু দেব আনন্দ যখন প্রকাশ্যে জনতা পার্টির সমর্থনে এগিয়ে এলেন এবং জনতা পার্টির পক্ষে রাম জেঠমালানীর হয়ে প্রচারে নামলেন তখন প্রাণ থেকে শুরু করে বিজয় আনন্দ, শত্রুঘ্ন
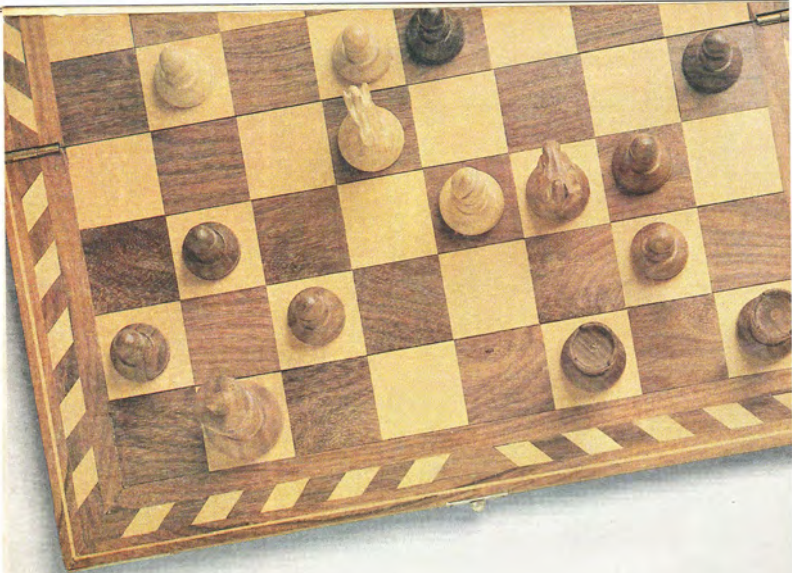
চিরতরুণ!
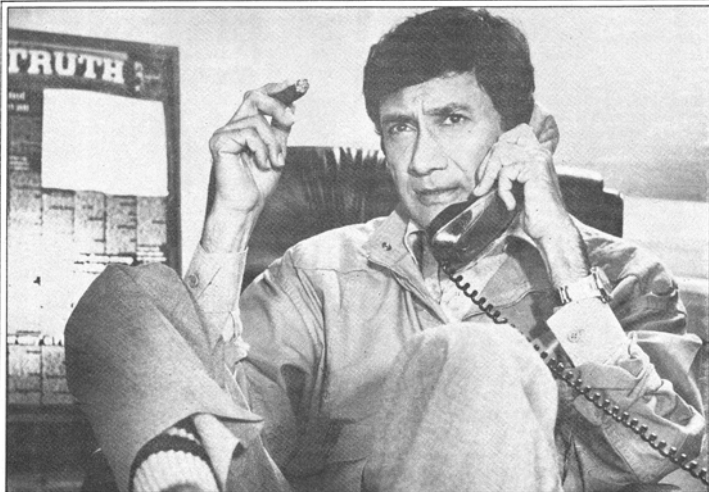
সিনহা, হেমা মালিনী প্রত্যেকেই সামনে এগিয়ে আসেন। এব্যাপারে দেবী আনন্দ বলেন, 'এসব আমি নেতা হওয়ার জন্য করিনি। একজন সচেতন নাগরিক হিসেবে করেছিলাম। যে কোন অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার অধিকার সব নাগরিকের আছে। আর এমন মানুষকেই সংসদে পাঠানো উচিত যে সাধারণ মানুষের সমস্যাগুলি জানবে, বুঝবে। তাদের সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করবে। আমি ১৯৪৪-এ যখন বোম্বাই আসি তখন গান্ধীজীর এক ভাষণ শুনেছিলাম। সেদিন থেকে গান্ধীজীর অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর উপদেশ আর ভাবমূর্তি আমার হৃদয়ে গেঁথে আছে।'

সিনেমার জগতে কিভাবে এলেন? প্রশ্ন করা হলে প্রবীন বৃদ্ধীদীপ্ত দুই চোখে যৌবনের ঝিলিক খেলে যায়। বেশ কিছু বছর পিছিয়ে যান দেব আনন্দ-স্মৃতির সরণী দিয়ে। তারপর কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলেন, -'আমার বাবা উকিল ছিলেন, মোটামুটি নামকরা উকিলই। হঠাৎ বাবার প্র্যাকটিস মন্দ গতিতে চলতে লাগল। তখন আমি লাহোরের গভর্নমেন্ট কলেজ থেকে বি এ (অনার্স) পাশ করেছি। এম·এ· করার ইচ্ছা ছিল ইংরেজি সাহিত্যে কিন্তু সেসময় পড়াশুনার খরচ দেবার মত অবস্থাও ছিল না বাবার। আমি সিভিল সার্ভিস বা কোন সরকারি চাকরি পাচ্ছিলাম না, কারণ আমার দাদা স্বদেশি নেতা ছিলেন। বাবা আমাকে কোন ব্যাঙ্কে চাকরি পাইয়ে দেবার চেষ্টায় ছিলেন কিন্তু তাতে আমার ইচ্ছা ছিল না, সেসময় ব্যাঙ্কের চাকরি ভীষণ অনিশ্চিত ছিল। তখন সেই সাড়ে আঠারো বছর বয়েসে লাহোর ছেড়ে বোম্বাইতে আসি। সেটা ছিল ১৯৪৪ সাল। বোম্বাই-এ যখন পৌঁছই তখন আমার কাছে মাত্র ৩০ টাকা! সম্পূর্ণ অচেনা অজানা শহর। কিছুদিন এটা সেটা করে সেন্সর বোর্ডে ১৬০ টাকার একটা ক্লার্কের চাকরি পাই। সেই সময়েই হঠাৎই একদিন সিনেমাতে অভিনয়ের সুযোগ পেয়ে গেলাম। বাস তারপর থেকে আর পেছন ফিরে তাকাতে হয়নি আমাকে।'

স্মৃতিচারণার পরই দেব আনন্দ জানান তিনি কখনো পেছনে ঝুঁকে দেখা পছন্দ করেন না। সর্বদা বর্তমানকে নিয়েই ভাবেন। ভবিষ্যতকে নিয়েও কখনো বিচলিত হতে চান না। এজন্য তাঁর অতীতের ফেলে আসা সুবর্ণ দিনগুলির কথা

সাড়ে আঠারো বছর বয়েসে লাহোর ছেড়ে বোম্বাইতে আসি। সেটা ছিল ১৯৪৪ সাল। বোম্বাই-এ যখন পৌঁছই তখন আমার কাছে মাত্র ৩০ টাকা! সম্পূর্ণ অচেনা অজানা শহর। কিছুদিন এটা সেটা করে সেন্সর বোর্ডে ১৬০ টাকার একটা ক্লার্কের চাকরি পাই। সেই সময়েই হঠাৎই একদিন সিনেমাতে অভিনয়ের সুযোগ পেয়ে গেলাম।

হামেশাই নতুন নায়িকাদের সঙ্গে

জিজ্ঞাসা করলেই এক নিশ্বাসে বলে ওঠেন, 'যা কাজ হয়ে গেছে তাকে নিয়ে ভেবে আজ কেন হয়রান হব। অতীতের গৌরবের দিনগুলির কথা ভেবে কেন বর্তমানকে ভুলে থাকব? আমার বর্তমান আমাকে নতুন কিছু করার প্রেরণা দেয়, ভাববার প্রেরণা দেয়। আমি বর্তমানকে নিয়েই ভাবি, করি এবং হাতের কাজ শেষ করে নতুন কাজ শুরু করি।'

বোধহয় অতীতে ঝুঁকে না দেখার দুশ্চিন্তায় আর ভবিষ্যতের দুঃস্বপ্নে বিব্রত না হওয়ার জন্যই আজও দেব আনন্দ তরতাজা, দুশ্চিন্তামুক্ত ও স্মার্ট। তার কোন ছবি বক্স অফিসে সফল হোক বা না হোক এর কোন প্রতিক্রিয়া তার শরীরে বা মনে পড়ে না। যার জন্য তার প্রায় সমবয়সী দিলীপকুমারের থেকেও তাকে ছোট মনে হয় এবং এজন্যই তাঁর অর্ধেক বয়সী অভিনেতা অভিনেত্রীরা তাঁর মা-বাবার চরিত্রে স্বচ্ছন্দে অভিনয় করে। বক্স অফিসে চিরদিন হিট ছবির প্রযোজক মহবুব খান তাঁর একটা ছবি (সন অফ ইন্ডিয়া) ফ্লপ হওয়ার পর শক পেয়ে হার্টফেল করেছিলেন। এমন অনেকেই আছেন যাঁরা ছবি ফ্লপ করলে তার পরের

> ***এমন কি রাজ কাপুরও অনেক রাত পর্যন্ত মদ খেতেন কোন ছবি ফ্লপ হওয়ার দুঃখকে ভুলে থাকার জন্য। কিন্তু দেব আনন্দ এক্ষেত্রে বর্তমানের মধ্যেই নিজেকে ব্যস্ত রাখেন যাতে কোন প্রতিক্রিয়া তাঁর মধ্য মাথা চাড়া না দেয়। এপ্রসঙ্গে তিনি বললেন, 'আমি কখনো হিসাব করি না যে আমার কটা ছবি হিট হল আর কটাই বা ফ্লপ।***

কয়েকদিন কয়েকদিন প্রচুর মদ খেয়ে থাকেন এবং উল্টো-পাল্টা আচরণ শুরু করেন। ষাটের দশকে প্রেমনাথ একবার গলায় তুলসীর মালা নিয়ে শান্তির খোঁজে তীর্থভ্রমণে বেড়িয়ে পড়েছিলেন। ফ্লপ বিজয় আনন্দও রজনীশের আশ্রয় গিয়েছিলেন মানসিক শান্তির খোঁজে। অন্যদিকে কোনও ছবি ফ্লপ করলে ফিরোজ খান মদ খেয়ে গালাগালি, মারপিট পর্যন্ত করতেন। এমন কি রাজ কাপুরও অনেক রাত পর্যন্ত মদ খেতেন কোন ছবি ফ্লপ হওয়ার দুঃখকে ভুলে থাকার জন্য। কিন্তু দেব আনন্দ এক্ষেত্রে বর্তমানের মধ্যেই নিজেকে ব্যস্ত রাখেন যাতে কোন প্রতিক্রিয়া তাঁর মধ্য মাথা চাড়া না দেয়। এপ্রসঙ্গে তিনি বললেন, 'আমি কখনো হিসাব করি না যে আমার কটা ছবি হিট হল আর কটাই বা ফ্লপ। তবে এও ঠিক যদি কোন ছবি ফ্লপ করে–তো কিছুটা মানসিক এফেকট তো পড়বেই। আমিও সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে এমন ভাবে ব্যস্ত রাখার চেষ্টা করি যাতে মনখারাপের ভাবটা মনকে অধিকার করে না ফেলে।'

১৯৪৬ সালে তাঁর প্রথম ছবি রিলিজ করার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি স্টার হয়ে যান। তারপর তিন

বছর বাদে পয়সাকড়ি জুটিয়ে নিজেই ছবি তৈরির জন্য সংস্থা করেন। তখন তিনি তার দুঃসময়ের সঙ্গী গুরু দত্তকে 'বাজী' ছবিতে প্রথম সুযোগ দেন পরিচালক হিসেবে। এরপর বন্ধু রাজ খোসলাকে পরিচালক তৈরি করেন। বড় ভাই চেতন আনন্দ তাঁর অধিকাংশ ছবিরই পরিচালনার কাজ তো করতেনই, ছোট ভাই বিজয় আনন্দকেও নির্দেশনার কাজে তিনি নিয়ে আসেন। এরপর ২৪ বছর পরে ১৯৭০ সালে নিজেরই অভিনীত ছবি 'প্রেম পূজারী' থেকে নির্দেশনার কাজ শুরু করেন নিজে। তার আগে শুধু অর্থনৈতিক সহায়তাই দিয়ে খ্যাতিপ্রাপ্ত স্টারদের নিয়ে তিনি তাঁর পরিচালকের জীবন এই ছবি দিয়েই শুরু করতে চেয়েছিলেন আন্তর্জাতিক ভূমিকা। এজন্য তাঁকে বেশ কয়েকবার নিউইয়র্ক ও রোমে যেতে হয়। যদিও পরে তিনি কোলাবরেশানে ছবি করার ভাবনা ত্যাগ করেন।

'অব্বল নম্বর' ছবিটি ক্রিকেট খেলোয়াড়দের জীবন পটের ছবি। তাদেরই গল্প নিয়ে দেব আনন্দ ছবি শুরু করেছেন। এই ছবি সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন করা হলে উনি বলেন, 'আমার হঠাৎই একদিন মনে এলো নভেম্বর থেকে মার্চ-এপ্রিল পর্যন্ত

ছবির কাজ যখন শুরু হয়েছে হঠাৎই রাষ্ট্রপতি জিয়াউল হকের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে ইমরানের মন্ত্রী হওয়ার স্বপ্ন নষ্ট হয়ে গেলে তিনি নাকি দেব আনন্দের সঙ্গে যোগাযোগও করেছিলেন। কিন্তু তখন ছবির শুটিং অনেকটা এগিয়ে গেছে। ফলে ক্ষমা প্রার্থনা করা ছাড়া দেব আনন্দের কিছুই করার ছিল না আর।

দেব আনন্দ তাঁর ৪২ বছরের ফিল্ম কেরিয়ারে মোট ১০৮টি ফিল্মে কাজ করেছেন। তিনিই একমাত্র অভিনেতা যিনি আন্তর্জাতিক ফিল্মের জগতেও তাঁর সমসাময়িক অভিনেতাদের থেকে

এসেছেন রাজনীতিতেও

ছবি: কল্যাণ চক্রবর্তী

'সচ কা বোলবালা' ছবিতে

ছবি: কল্যাণ চক্রবর্তী

এসেছেন।

পরিচালক হতে এত দেরি কেন করলেন? ঘরে দুই ভাই পরিচালক তথাপি আপনার মাথায় নির্দেশনার কাজ করার ইচ্ছা বা কেন এল? প্রশ্ন শুনে হাসেন দেব আনন্দ, 'নিজের কাজ চালিয়ে কোন কিছু শিখতে সময় তো লাগবেই। আমাদের সময়ে কোন এ্যাকটিং স্কুল ছিল না—আমি একই অভিনয় বা তৎ সম্পর্কিত সব কিছুই বারবার করে করেছি, শিখেছি। ভুল করেছি আবার শুধরে নিয়েছি। এভাবে থাকতে থাকতে যখন আমার মনে হয়েছে যে আমি নিজেও ডাইরেকশান করতে পারবো, তখন তাও শুরু করে দিলাম।'

কিন্তু এই অবস্থায় আসার আগে দেব আনন্দের বেশ কয়েক বছর সময় চলে যায়। 'গাইড' তৈরির সময় তিনি আমেরিকায় রোজিন্যান্ড ম্যাসীর প্রখ্যাত কীর্তি 'দ্য ইমিগ্রেন্টস' এবং মনোহর মালগাওকরের উপন্যাস 'দ্য প্রিন্সেজ'এর কপি রাইট কিনে নেন। ইংরাজী ও হিন্দির আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের সীজন। আর ক্রিকেট নিয়েই মানুষ পাগল। ক্রিকেট এবং তার দর্শক এই দুই শব্দ থেকেই আমার মাথায় আইডিয়া আসে। আমিও স্ক্রিপ্ট লেখা শুরু করে দিই।'

'অভিনেতা চয়নের প্রশ্নে প্রথমেই আমার ইমরান খানের নাম মনে আসে। আমি লন্ডনে ইমরানকে ফোনও করি। ওকে না পেয়ে আমি ওকে একটা চিঠি দিই তার সঙ্গে ছবির সিনপসিসও পাঠাই। তারপর আমি ব্যাঙ্গালোর চলে আসি। ব্যাঙ্গালোরে এসে আমার মনে হল চিঠি পৌঁছাতে, পড়তে, উত্তর পেতে বেশ সময় লেগে যাবে। মনে হতেই আমি লন্ডনে যাবার টিকিট কেটে নিই। ইমরান তার অনেক আগে থেকেই আমার ভক্ত। কিন্তু শুনলাম জিয়াউল হক ওঁকে পাকিস্তানের ক্রীড়া মন্ত্রী বানাতে চান, আর ইমরানও ফিল্মি হিরো হতে চায় না। তখন আমি ফিরে আসি। এখানে এসে এরপর আমীর খান আর আদিত্যপাঞ্চালিকে নিয়ে শুটিং শুরু করি, বাস।'

বেশি জনপ্রিয়। তিনি একমাত্র অভিনেতা যাঁর ছবি সিনেমাহলে প্রদর্শিত হলে একসময় ৭৫ ভাগ মহিলা দর্শকে হল ভরে যেত। রাজেশ খান্না থেকে অমিতাভ বচ্চন কারোরই 'ফ্যানশিপ' দেব আনন্দের মত অত বিপুল সংখ্যক নয়। দেব আনন্দই সেই দীর্ঘ ঐতিহ্যের অভিনেতা যিনি বিভিন্ন সময়ে যুব মানসকে শুধু প্রভাবিতই করেননি তাদেরকে লিভিং স্টাইলও দিয়েছেন। চলা-ফেরা কথাবলার কায়দা, ফ্যাশান শিখিয়েছেন।

তার অতীতের এই সমস্ত সুবর্ণ সময়কে নিয়ে আলোচনা করতেই তিনি দুটি হাত হাওয়ায় মেলে দেন। 'আজকের কথা বল বন্ধু। যে সময় শেষ হয়ে গেছে তা নিয়ে ভেবে কি লাভ? আমি আজকের ভারতবর্ষ, আজকের মানুষকে নিয়ে বাঁচতে চাই। 'আজ' আমাকে বাঁচবার শক্তি দেয়। বর্তমান সময়ের ভেতর থেকেই আমি উৎসাহ পাই কিছু করার। অতীত তো শুধু অতীতই!'

বম্বে ব্যুরো

৭১পৃষ্ঠার পর

উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীর রণনীতি

ছবি: মান সরোবর শর্মা
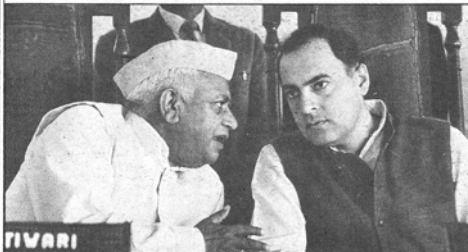
প্রদেশ কংগ্রেস (ই) সভাপতি হিসেবে তিন মাসেরও বেশি কাটল বলরাম সিং যাদবের। দুঃখের বিষয় আজও তিনি সাংগঠনিক বিচক্ষণতা দেখাতে পারলেন না। বহাল তবিয়তে পার্টির মধ্যেকার কলহগুলি বজায় রয়েছে। জেলা ও ব্লক স্তরের নেতা নির্বাচনের লড়াই চলছে সমানে। জেলা ছাড়িয়ে সেই সমস্যা এখন প্রদেশ কংগ্রেস (ই) প্রধান কার্যালয় তাতিয়ে তুলছে। আসলে সরকার আর সংগঠনের মধ্যে রয়েছে বোঝাপড়ার অভাব। মন্ত্রীদের মধ্যে রয়েছে প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক মনোভাব। দেখা যাচ্ছে একই হাল কংগ্রেস (ই) বিরোধী শিবিরেও।

তিওয়ারি এখন কিন্তু প্রতিপক্ষের নিন্দা কিংবা তাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের বদলে সকলের সহযোগিতা কামনা করছেন, যাতে প্রদেশের বর্তমান দারিদ্র্য দূর করা যায় অন্তত। এতে পার্টির মধ্যে কিছু পরিবর্তন অবশ্যই এসেছে। যদিও ধীরে ধীরে আসলে দারিদ্র দূরীকরণের প্রচেষ্টাটিই আবার অন্ধকারে চাপা পড়ে গেছে। এই সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন বিরোধীরা। কিন্তু কাজে লাগানোর বদলে বিরোধীরা যে যার নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে আছেন। নিজের অস্তিত্ব নিয়ে সজাগ হওয়ায় নিজেদের মধ্যেই বেড়ে ওঠে ঝগড়া ঝাটি।

বীর বাহাদুর উত্তরপ্রদেশ বিরোধী শিবিরের কেন্দ্রবিন্দু করেছিলেন ভি·পি· সিং–কে। এলাহাবাদে ভি·পি· সিং–এর জয় কংগ্রেস (ই)কে কোণঠাসা করে কার্যত। 'রাজীব হটাও' স্লোগানের বাস্তব সাফল্য অনুভব করেন বিরোধীরা। ভি·পি· সিংকে তাঁরা নেতৃত্বেও মেনে নেন। বলাবাহুল্য হিন্দি এলাকায় প্রায় ২৫০ লোকসভা সিটের নির্বাচনী পরিণাম প্রভাবিত করে উত্তরপ্রদেশের ৮৫টি সিট। স্বাভাবিক কারণেই উত্তরপ্রদেশে শক্তি অর্জন করে যে কোন রাজনৈতিক ব্যক্তি দেশের নেতা হওয়ার ক্ষমতা রাখেন। এমন কি প্রধানমন্ত্রীও হতে পারেন তিনি। এই সম্ভাবনাই বিরোধী শিবিরের কাল। এলাহাবাদের জয় ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাকে উজ্জ্বল করলে বিরোধী নেতারাও নিজেকে এক নম্বরে নিয়ে যাওয়ার প্রতিযোগিতায় নামেন। ভাঙন শুরু হয় এখানেই।

উত্তরপ্রদেশ জয় করার রেসে প্রথম পা বাড়ান জনতা পার্টির নেতা চন্দ্রশেখর। আমেথিতে জনতা, লোকদল–অ, সঞ্জয় বিচার মঞ্চ এবং কংগ্রেস–জ–এর ঐক্য ঘোষণা করেন। অবশ্য কিছুদিনের মধ্যে এই প্রয়াসের ব্যর্থতা প্রকাশ পায়। বিধানপরিষদের দ্বিবার্ষিক নির্বাচনে এই একতার চিড় পরিষ্কার বোঝা যায়। জনতা পার্টির বিদ্রোহী নেতা রামকরণ সিং ভোটে জেতেন। সেই সঙ্গে সঞ্জয় বিচার মঞ্চের দুই বিধায়ক আকবর আহমেদ ডাম্পী এবং বীরেন্দ্র প্রতাপ শাহীকে শৃঙ্খলা ভঙ্গের কারণে পার্টি থেকে সাসপেন্ড করা হয়। যদিও সঞ্জয় মঞ্চ ও জনতা পার্টির অধিক সংখ্যক বিধায়ক এতে নারাজ ছিলেন। কারণ নব গঠিত জনতা পার্টির সব শীর্ষপদে বসানো হয় লোকদল নেতাদের। চন্দ্রশেখর ও অজয় সিং মিলে লোকদল (অ)–র মনোহর লালকে প্রদেশ সভাপতি ও সত্যপাল যাদবকে জনতা বিধানপরিষদ দলের নেতা করেন। ফলে জনতা পার্টির নেতারা তীব্র বিরোধিতায় মুখর হন। তাঁদের এক বিধায়ক হর্ষবর্ধন তো বিধানসভা অধ্যক্ষকে লিখিত জানান, বিধানসভায় সত্য পাল যাদবকে যাতে নতুন পার্টির নেতা মেনে না নেওয়া হয়।

এদিকে বিধানসভার অধিবেশন শুরু হল। পুরোনো জনতা পার্টি সত্য পাল যাদবকেই বহাল রাখলেন। আবার জনতা পার্টি, লোকদল–অ, সঞ্জয় বিচার মঞ্চ এবং কংগ্রেস–জ নিজের সংগঠনকে অহেতুক ভাঙলেন না। পুরোনো জনতা পার্টি লোকদল–(ব)র নেতা মুলায়ম সিং যাদবের ক্রান্তিকারী মোর্চায় মিলিত হলো। ক্রান্তিকারী মোর্চার সদস্যপদ নিয়ে নতুন জনতাপার্টির নেতাদের মধ্যে মতভেদ তো ছিলই। এমন কি নতুন জনতাপার্টিতে কংগ্রেস (স) লোকদল এবং জনমোর্চাকে মিলিয়ে নতুন পার্টির গঠনের প্রারম্ভিক ঘোষণা ও ব্যাঙ্গালোরে আয়োজিত সম্মেলন নিয়েও বিবাদ দেখা দিল। জনতা দল থেকে বেরিয়ে এল কংগ্রেস (স)।

ব্যাঙ্গালোরে নব গঠিত জনতা দলে লোকদল (ব) মিলিত হলেও, উত্তরপ্রদেশে এই একতার কোন আভাষ মেলে নি। এদিকে জনতা পার্টিতে মিশে যাওয়া সঞ্জয় বিচার মঞ্চেরও টানাপোড়েন শুরু হয়। নিজের অস্তিত্ব নিয়ে তাঁরা শঙ্কিত মনোভাব পোষণ করতে থাকে। মেনকা গান্ধী কিছুতেই স্বীকার করতে পারছেন না যে জনতা দলের নামে গঠিত নতুন দলের ওই মঞ্চে তিনি বসবেন, যেখানে সঞ্জয় সিংও বর্তমান। এক সময় আমেথিতে মেনকা গান্ধীকে হারানোর জন্য সঞ্জয় কেন্দ্রের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ছিলেন। সেই পুরোনো যন্ত্রণা কিছুতেই ভুলতে পারছেন না মেনকা। এদিকে আকবর আহমেদ ডাম্পী এখন নতুন রাস্তা ধরছেন। শোনা যায় তিওয়ারি তাঁকে কংগ্রেস–ইতে নেওয়ার চেষ্টা করছেন।

তবুও বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে একতার বিভিন্ন প্রচেষ্টা নতুনভাবে একজোট হয়ে বিশাল বিপক্ষকে তছনছ করার ইঙ্গিত দিচ্ছে। ভি·পি· সিং–এর জনমোর্চা এর পরিপন্থী নয় নিশ্চয়ই। যদিও এখনও পর্যন্ত তার এম·পি·ও বিধায়কেরা আইনগত জটিলতার দরুন যে যার রাজনৈতিক দলে যুক্ত আছেন। হয়তো বা নিজেদের বিধায়ক পদটি ছাড়তে প্রস্তুত নয়। তাই জনমোর্চা নেতাদের একটি বড় অংশ মনে করছেন, কংগ্রেসের বিস্ফোরণ ঘটলে তার টুকরোগুলিকে নিয়ে নিজের সত্ত্বা টিকিয়ে রাখা মুসকিল হবে। মুসকিল হবে পার্টিকে নিজের কব্জায় রাখা।

বিপক্ষের এই দুঃশ্চিন্তাকে কাজে লাগাচ্ছেন তিওয়ারি। বিপক্ষ নেতাদের তোয়াক্কা না করে যে কোন আলোচনায় নিজের সহযোগীদের প্রাধান্য দিচ্ছেন। ফলে ক্ষোভ বাড়ছে বিরোধী দলের মধ্যে। সেই ক্ষোভকে কাজে লাগিয়ে তিওয়ারিও আগামী নির্বাচনের মুনাফা লুটতে প্রস্তুত। তার সম্ভাবনাও জোরালো। প্রমাণও পাওয়া গেছে ব্লক নির্বাচনে। এলাহাবাদ, টাণ্ডা এবং ছাপরৌলীর উপনির্বাচনে পরাজয়ের পর আশংকা ছিল যে ব্লক নির্বাচনে কংগ্রেস (ই) হয়তো মুছে যাবে।

দেখা যাচ্ছে বিরোধী শিবির যতই উত্তেজিত হবে ততই প্রসন্ন হবেন নারায়ণ দত্ত তিওয়ারি। শুধু লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে কংগ্রেস–এর কোন নেতা তিওয়ারির এই খুশি ছিনিয়ে নিতে এগিয়ে না আসেন। এমন নজির অবশ্য এখনও আসেনি। শুধু অপেক্ষা, নির্বাচনের ভবিষ্যৎ কি দাঁড়ায়।

-রামপাল সিং

আমেথির সঞ্জয় সিংহ: জনতা দলের দিল্লির উদ্দেশ্যে পদযাত্রা?

ছবি: রাজেন্দ্র কুমার

ফলশ্রুতিতে সহানুভূতি নিয়ে ৮৫টি লোকসভা আসনের মধ্যে কংগ্রেস (ই) জিতেছিল ৮৩টিতে। তার চেয়েও বড় কথা সে সময় এই প্রদেশের নেতৃত্বে ছিলেন ভি·পি· সিং ও নারায়ণ দত্ত তিওয়ারি। লোকসভা নির্বাচনের মাত্র তিনমাস পরেই মার্চ ১৯৮৫–তে বিধানসভা নির্বাচনেও রাজীব এই দুই নেতার ওপর দায়িত্ব আরোপ করেছিলেন। এই তিন মাস পরেই সেই সহানুভূতির স্রোতে ভাটা পড়ার প্রমাণ পাওয়া গেছিল। মোট ৪২৫টি বিধানসভা আসনের মধ্যে কংগ্রেস (ই) প্রত্যাশিত ৪০০টি সিটের মধ্যে পায় মাত্র ২৬৭টি। উত্তরপ্রদেশ থেকে সঙ্গে সঙ্গে দিল্লি চলে আসেন ভি·পি· সিং। মাস ছয় বাদে এন·ডি· তিওয়ারিকেও মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে সরিয়ে দিল্লিতে ডেকে নেন রাজীব।

১৯৮৫–র সেপ্টেম্বরে দিল্লি ফিরে যাওয়ার সময় তিওয়ারি বলেছিলেন, 'উত্তরপ্রদেশ কাজ করার উপযুক্ত জায়গা নয়। এখানে পার্টির একে অপরে দ্বন্দ্ব লেগেই আছে।' সেজন্যই দিল্লি ছেড়ে বীর বাহাদুরের জায়গায় না আসার জন্য উঠে পড়ে লেগেছিলেন তিওয়ারি। কিন্তু না চাইলে হবে কি, জায়গার অদল বদল ঘটলই। ১৯৭৬–এর ইমার্জেন্সির সেই দুর্যোগ সময়ে শ্রীমতী গান্ধী প্রথম তাঁকে উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী করেন। যতদূর মনে

সোনিয়া গান্ধী: উত্তরপ্রদেশে নির্বাচনপ্রার্থী হবেন?

পড়ে ১৯৮৪র আগস্টে দ্বিতীয়বার যখন মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন শ্রীপতী মিশ্র, সে সময় ৮টি উপনির্বাচনে কংগ্রেসের হার হয়েছিল ৬টিতে। মাথার ওপর ছিল আগামী লোকসভার দুঃশ্চিন্তাও। কিন্তু সে দিন আর এদিনের সমস্যা এক নয়। তখন শ্রীমতী গান্ধীর ওপর পূর্ণ বিশ্বাস ছিল, কিন্তু সাম্প্রতিক আবহাওয়ায় সেই সম্ভাবনার পরিবর্তন ঘটেছে। আর সেজন্যই মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ গ্রহণের সময় তিওয়ারি বলেছিলেন–'আমি তো কংগ্রেস হাইকমাণ্ডের অধনীস্থ সিপাই। হাইকমাণ্ড যা বলবে তাই করব।' বিচক্ষণ তিওয়ারি স্পষ্ট ভাবেই জানতেন এই দায়িত্ব চিরস্থায়ী নয়। কেবল দিল্লির সিংহাসন বাঁচানোর প্রাদেশিক যোদ্ধা করা হয়েছে মাত্র।

নারায়ণ দত্ত তিওয়ারির সামনে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ এখনও বীর বাহাদুরই। কারণ বীর বাহাদুর যে কেবল লক্ষ্ণৌয়ের মসনদে ফিরে আসার স্বপ্ন দেখছেন তাই নয়, কংগ্রেস (ই) নেতৃত্বের একাংশের সহানুভূতিও আছে তাঁর প্রতি। রাজীব গান্ধী আমেথির কার্যকলাপ দেখভালের দায়িত্বও দিয়েছেন তাঁর ওপর। তা ছাড়া উত্তরপ্রদেশের সংগঠন ও প্রশাসন দেখার জন্য নবগঠিত তিন সদস্য সমন্বিত সমিতিতেও আছেন বীর বাহাদুর সিং। দেখা যাচ্ছে উত্তরপ্রদেশের নির্বাচনী রথের সারথি আপাতত নারায়ণ দত্ত তিওয়ারিকে করা হলেও লাগাম একরকম আছে বীর বাহাদুরের হাতেই।

এলাহাবাদে কংগ্রেস (ই) পরাজয়ের শোক সংবাদ দিল্লিতে পৌঁছোনোর পর লন্ডন থেকে তিওয়ারিকে জরুরী বার্তায় ডেকে চটজলদি

উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী করা হয়। বীর বাহাদুরকে কেন্দ্রে একটা নাতি গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর দেওয়া হয়, যোগাযোগ দপ্তর। তবে একা বীর বাহাদুরের ওপরেই নয় এই পরাজয়ের দায় এসে পড়ে মন্ত্রী শ্যামসুরৎ উপাধ্যায়, গোপীনাথ দীক্ষিত, আর রায়বেরিলির কংগ্রেসী নেতা অরুণ কুমার সিং—এর উপর। কিন্তু নিজের সরকার চালানোর জন্য মনমত সঙ্গীদের বেছে নেওয়ার সময়ও তিওয়ারির হাতে ছিল না। সুযোগ পেলে তিনি অন্তত শ্রীনাথ সিং, শিবনাথ সিং কুশবাহা, সুরেন্দ্র সিং চৌহান, রাম অবতার দীক্ষিত, চেতরাম গঙ্গওয়ার এবং গুলাব সিং প্রমুখ তথাকথিত বীর বাহাদুর সমর্থকদের নিতেন না মন্ত্রী পদে। সে তো হলোই না, বরং বীর বাহাদুরের সুপারিশ অনুযায়ীই মন্ত্রীপদে নিতে হলো রমানাথ মুন্সী, রণজিৎ সিং জুদেব, দিলদার হুসেন আন্সারী, রাম সিং সৈনী, মদন মোহন শুক্লকেও। বাধ্যবাধকতা তো ছিলই, তা না হলে এমন একজনকে নিশ্চয়ই মন্ত্রী করতেন না যিনি মিলিটারি ডাক্তারের প্রমাণপত্র দিয়ে বুন্দেলখণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন পরীক্ষায় একজন সঙ্গীকে বসিয়ে প্রশ্নের উত্তর লিখিয়ে নিয়েছিলেন এবং তাঁর ওপর আরোপ সি বি আই—এর তদন্ত সত্য বলে প্রমাণিতও হয়েছিল। প্রদেশ রাজনৈতিক মহলও অবাক হয় শৈলেন্দ্রকুমারকে মন্ত্রীমণ্ডলে দেখে।

তেওয়ারি সরকারের আজ এই রকম অবস্থা। মাদকদ্রব্য সংক্রান্ত এমনকি খুনের মামলায় জড়িত লোকেরাও মন্ত্রীপদ অলংকৃত করছেন। কিন্তু মন্ত্রী যেমন বীর বাহাদুর বিরোধী আবার স্বয়ং তিওয়ারি বিদ্বেষীও। অরুণ সিং ও ডঃ কৃষ্ণবীর কৌশল বীর বাহাদুর বিরোধী বলে চিহ্নিত কিন্তু তাঁরা মন্ত্রীপদে রয়েছেন।

মুখ্যমন্ত্রী তিওয়ারির নিজস্ব মন্ত্রীমণ্ডল নিয়েই টানাপোড়েন যথেষ্ট। প্রায় প্রত্যেক মন্ত্রীই তো মনে করছেন তাঁরা তিওয়ারির কৃপাধন্য নন, কেন্দ্রের তথা হাইকমাণ্ডের কৃপাধন্য। তাই সব দিক থেকেই তিওয়ারির হাত বাঁধা। চটজলদি কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়াও সম্ভব নয়। এদিকে প্রদেশ কংগ্রেস—এর নেতৃত্বে বসে আছেন বীর বাহাদুরের পছন্দ মাফিক নেতা বলরাম সিং যাদব। তাঁর নিজের মন্তব্য হল, 'বর্তমানে উত্তরপ্রদেশে মুসলিম ভোটাররা কংগ্রেস (ই)—বিদ্বেষী। মীরাটের দাঙ্গার পর সেই বিদ্বেষ আরও বেড়ে গেছে। বাবরি মসজিদ যথেষ্ট সেন্টিমেন্টাল ইস্যু। বরং মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে মহসীন কিদওয়াইকে আনলে এই সমস্যা দূর হতে পারে।' কিন্তু তিওয়ারির এই অভিপ্রায় বাস্তবায়িত করেত দেওয়া হয়নি। '৮৪—র লোকসভা নির্বাচনের সময় তিওয়ারির সঙ্গে ছিলেন ভি·পি· সিং। কিন্তু বর্তমানে ভি·পি· সিং—ই তো কংগ্রেস (ই)—র প্রধান শত্রু। তাঁর ওপর প্রদেশ নেতারাও গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে ভুগছেন, এমন কি তাঁরা তিওয়ারির বিরুদ্ধাচারণেও ব্যস্ত। এমন অবস্থায় নির্বাচন জেতার সম্ভাবনা কতটুকু?

বোফর্স-এর কামান: আগুন এখনও নেভেনি!

উত্তরপ্রদেশ পার্টি সংগঠনের পুনর্গঠন তিন মাসেরও বেশি হয়ে গেল। এই তিনমাসে তিনি সাংগঠনিক কার্যকলাপের উন্নতি তো দূরের কথা, সংগঠনের প্রধান বলরাম সিং যাদবকেও তার স্বপক্ষে টানতে পারেন নি। জেলায় জেলায় নেতারা নিজেদের মধ্যেই লড়াই করে চলেছেন। কোথাও কোথাও মারপিটও হয়ে গেছে।

প্রদেশের ২৫টি জেলায় কোনও নির্বাচিত নেতা নেই। জেলা কমিটিগুলি কয়েক বছর ধরে ভাঙাচুরো অবস্থায়। মোরাদাবাদ, দেরাদুন, মৈনপুরী, দেওরিয়া, মুজফ্ফরনগর, বহরাইচ, বারাণসী, এলাহাবাদ, ফারুখাবাদ, ইটাওয়া, কানপুর, বুলন্দশহর এবং গাজিয়াবাদে অন্তর্দলীয় গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব এখন চরম সীমায়। আগরা জেলায় গুলাব সেহরা বনাম আজাদ কুমারের কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি চরিত্র হননের স্তরকেও টপকে গেছে। আবার প্রদেশ কমিটির ২৩ সদস্যের মধ্যে বীর বাহাদুর সমর্থকেরাই ভরপুর। পুনর্গঠিত কমিটিতে তিওয়ারি সমর্থকদের সুযোগ দেওয়া হয়নি। প্রবীণ নেতাদের উপেক্ষা করে কংগ্রেস হাইকমাণ্ড গড়ে তুলেছে এমন একটি জগাখিচুড়ি পরিস্থিতি। ফলে দুটি সমান্তরাল গোষ্ঠীর দ্বন্দ্ব চলছে সমানেই।

প্রদেশ কংগ্রেস সংগঠন ঋণে ডুবে যাওয়াও আর এক দুর্ভাগ্যজনক লক্ষণ। সরকারের প্রায় দেউলিয়া অবস্থা। কংগ্রেসী সংগঠনের আর্থিক অবস্থা এমন জায়গায় পৌঁছেছে যে অনেকেই মনে করছেন আগামী নির্বাচনে সরকার বদলে গেলে 'নেহেরু ভবন' নিলাম করেও প্রদেশ কংগ্রেস ঋণ শোধ করতে পারবে না। উত্তর প্রদেশে সরকারের প্রাপ্য খাজনার অনেকটাই বাকি পড়ে আছে। আর রাজ্যের আয়ের তুলনায় সরকারি কর্মচারীদের বেতন বেশি হওয়ায় অর্থনৈতিক ভাবে প্রদেশ নেতৃত্ব ভীষণ বিপাকে। স্বয়ং তিওয়ারিই দুঃশ্চিন্তায় ভুগছেন। রাজ্যের আইন শৃঙ্খলাও দুর্দশাগ্রস্ত। তিওয়ারির মুখ্যমন্ত্রিত্বের চার মাসের মধ্যে সৈয়দ মোদি হত্যা এবং দেবরিয়ার বিধায়ক রণজিৎ সিং হত্যার মত দুটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে। এছাড়া জেলায় জেলায় খুনখারাপি তো আছেই। গ্রাম শহরে চুরি ডাকাতি এবং খুনখারাপির গরম হাওয়া বাড়ছেই। অন্যদিকে পুলিশের জুলুম চলছে নিরীহ ও নিরপরাধ মানুষদের ওপর। সাহারনপুর, উন্নাই, গাজীপুর, লক্ষ্ণৌ, জৈনপুর এবং কানপুর—এ পুলিশ জুলুমের ব্যাপক ঘটনা এর প্রমাণ স্বরূপ। থানা ঘেরাও—এর ফলে মৃত্যু নিরীহ মানুষের। গৃহমন্ত্রী সুশীলা রোহতগীও এসবের দায়িত্ব এড়িয়ে চলছেন। সেই সঙ্গে রাম জন্মভূমি ও বাবরী মসজিদ নিয়ে বিতর্ক উঠেছে চরমে। একে ইস্যু করে গোটা উত্তরপ্রদেশেই একবার ভয়ংকর মারদাঙ্গা হয়ে যায়। তার ওপর মুজফ্ফরনগর, আলিগড় ও ফৈজাবাদ—এ হয় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা নয়ত তুষানলের মত সাম্প্রদায়িকতার আগুন ছড়াচ্ছে। বছর কয়েক আগেকার শান্ত ফৈজাবাদ ও মুজফ্ফরনগর আজ সম্পূর্ণ পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে। এই সাম্প্রদায়িকতার আগুনে মারা গেছেন মুজফ্ফর নগরের মত একটি ছোট্ট জেলাতেই ২৬ জন। দেখা যাচ্ছে পার্টির আর্থিক সংকট এবং আইন কানুনের দুর্দশা তিওয়ারি সরকারের সামনে যে বিরাট সমস্যা হিসেবে দাঁড়িয়েছে, তার সঙ্গে অনিশ্চয়তা ও অন্তর্দলীয় কোন্দল যুক্ত হয়ে প্রদেশের কংগ্রেসী সরকারকে করে তুলেছে দুর্বল।

সব মিলিয়ে নারায়ণ দত্ত তিওয়ারি তাঁর রাজনৈতিক জীবনের কঠিনতম পরীক্ষায় অবতীর্ণ। যে সব বাধা তার চারদিকে ছড়িয়ে আছে তাকে টপকানো যে কোন মুখ্যমন্ত্রীর পক্ষেই

কাশ্মীর ১৯৭৫ ১৯৮৬-তেও মুখ্যমন্ত্রীদের সামনে সমস্যা দেখা দিয়েছিল কিন্তু এমন ব্যাপকভাবে তা কখনও জন্মায়নি। এক প্রবীণ অফিসারের কথায়, 'প্রদেশে সমস্যা আছে সত্যি, কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী এসব রোখার জন্য বারবার অস্ত্র এগিয়ে দিচ্ছেন কেন জানি না'

কিন্তু নারায়ণ দত্ত তিওয়ারি দক্ষ রাজনীতিক চারদশক ধরে প্রত্যক্ষভাবে তিনি রাজনীতিতে যুক্ত। দিল্লির রাজনীতিতে তাঁর কিছুটা প্রভাব তো আছেই। তাঁর নীতি হল চুপচাপ কাজ করে যাওয়া। এই নীতিই তিওয়ারির সমস্ত কূটকৌশলকে গোপন রাখে। কেউ কেউ মনে করছেন, তিনি আস্তে আস্তে চক্রব্যূহ রচনা করে চলেছেন। উদ্দেশ্য দুটি। অফিসারদের নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখা, দ্বিতীয়ত মন্ত্রীদের কার্যকলাপ চোখ সজাগ রেখে চালিত করা। যাতে মন্ত্রীদের ব্যর্থতা প্রকাশ না পায়। তিনি ভালভাবেই জানেন সরকার মন্ত্রীরা চালায় না। চালায় অফিসাররা। আর একবার যদি প্রশাসন সিস্টেমকে নিজের কব্জায় নিতে পারেন তবে বহু সমস্যাই মেটানো যাবে।

তাই একদিকে তিনি যেমন মন্ত্রীদের খুশি রাখার প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন, অন্যদিকে বীর বাহাদুরের মত সমস্ত ক্ষমতা নিজের কুক্ষিগত করতে চাইছেন না। সেচ, সমাজ কল্যাণ, বিদ্যুৎ, নগর বিকাশ প্রভৃতি বিভাগগুলি সহযোগীদের হাতেই ছেড়ে দিয়েছেন। সম্প্রতি সীতাপুর যাওয়ার সময় তিওয়ারি যখন হেলিকপ্টারে বসেন, সে সময় সিকিউরিটি অফিসারকে নামিয়ে তিওয়ারির পাশে বসেন মন্ত্রী অম্মার রিজবী। তিওয়ারির কাছে তা অপমানকর, তবুও তিনি হাসিমুখে নিরাপত্তা অফিসারকে বলেন, 'আপনি বরং গাড়ি করেই এসে যান।' কেননা মন্ত্রীদের কার্যকলাপে তিনি তেমন হস্তক্ষেপ করেন না। সীতাপুরের ডি এম ডাকাত তথা অন্য অপরাধীদের ধরপাকড় শুরু করলে সম্ভবত অম্মার রিজবীর কিছু স্থানীয় সমর্থক অসুবিধায় পড়েন। তাই রিজবীর কথা মত তিওয়ারি সেই জেলা অধিকারীকেও ট্রান্সফার করিয়ে দেন বলে অভিযোগ। লক্ষ্ণৌ-এর স্থপতি 'কৃষ্ণা কালোনাইজার'-এর কাছ থেকে বেশ মোটা ঘুষ নিয়ে তিওয়ারির এক মন্ত্রী বেআইনি ভাবে জমি দেন বলে অভিযোগ উঠলেও তিনি চুপ করে থাকেন। সেইসঙ্গে কেন্দ্রেরও বহু নির্দেশ মানতে হয় তাঁকে। ফলে তাঁর বক্তব্য অনুযায়ীই, সৈয়দ মোদী-র খুনীকে জানা গেলেও কেসটি সি·বি·আই-এর হাতে ছেড়ে দিতে হয়। এক প্রবীণ অফিসারের কথায়, 'সে সময় গৃহসচিব কে·কে· বক্সী চাননি সি·বি· আই-এর হাতে কেসটি ছেড়ে দিতে। কারণ তাঁর বিশ্বাস ছিল স্থানীয় পুলিশই এর সমাধান করতে পারবে। গৃহসচিব যখন সি·বি·আই-র হাতে মামলাটি তুলে দেওয়ার বিরোধীতা করেন তখন কেন্দ্রের কথা মত তিওয়ারি গৃহসচিবকে বদলি দেন।'

রাজ্য মন্ত্রীদের পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা কাটিয়ে তোলার দৃঢ় প্রচেষ্টা চালিয়ে একদিকে তিনি যেমন মন্ত্রীদের ব্যাপারে সমস্যা কাটিয়ে উঠছেন, অন্যদিকে তিনি সরকারি-প্রশাসনের ওপর পুরো নিয়ন্ত্রণ আনার জন্য নিজের সমস্ত ক্ষমতা আরোপ করছেন। মন্ত্রীত্বে রাজনৈতিক নেতাদের পাল্টাতে না পারলেও মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ নেওয়ার পরই তিনি তাঁর দপ্তরের সমস্ত স্টাফ পাল্টে দেন। রাজ্য সরকার থেকে সরে যাওয়ার আগে বীর বাহাদুর নির্দেশ দিয়েছিলেন লক্ষ্ণৌ ডেভলপমেন্ট অথরীটির চেয়ারম্যান শৈলেশ কৃষ্ণকে বারাবঙ্কিতে, ইনফরমেশন ডিরেকটর অশোক প্রিয়দর্শীকে এলাহাবাদের তথা জয়েন্ট ডিরেকটর সুখদেব প্রসাদ ত্রিপাঠীকে জৈনপুর জেলার ডি এম করার। কিন্তু তিওয়ারি সেই নির্দেশের কোন আমলই দেন নি।

ছবি: [illegible]

সতীশ শর্মা: রাজীব গান্ধীর নির্বাচনী ক্ষেত্রের দায়িত্বে

মুখ্যমন্ত্রী সচিবালয় থেকে এস·পি আর্য, এস·পি· সিং, নূর মহম্মদ, মুকেশ মোহন মিশ্র এবং সুখদেব প্রসাদ ত্রিপাঠীকেও এখানে ওখানে সরিয়ে দেওয়া হয়। প্রায় আট বছর ধরে উত্তরপ্রদেশের কার্যরত নির্বাচন অধিকারী জে·সি· পন্থকে সরিয়ে বীর বাহাদুর অখণ্ড প্রতাপ সিংকে এনেছিলেন সেই জায়গায়। তিওয়ারি আবার অখণ্ড প্রতাপ সিংকে সরিয়ে জে·সি· পন্থকে ফিরিয়ে আনেন সেইসঙ্গে।

আবার বীর বাহাদুর যে সব অফিসারদের প্রতি বিরুদ্ধাচারণ করেছিলেন তিওয়ারি তাদেরই গুরুত্বপূর্ণ পদে বসিয়ে দেন। মুখ্যমন্ত্রীর আবাস ও সচিবালয়ে অগ্নিকাণ্ডের দরুন বীর বাহাদুর যে অফিসারদের বদলি করেছিলেন, সেই মহাবীর প্রসাদ ও অগ্রসেনকে আবার আগের দায়িত্বে ফিরিয়ে আনেন। লক্ষ্ণৌ ডেভলপমেন্ট অথরীটির প্রাক্তন প্রধান এস·পি· গুপ্তার বিরুদ্ধে বিভিন্ন দুর্নীতির অভিযোগ বিধানসভা অবধি পৌঁছেছিল বীর বাহাদুর তাঁর বিরুদ্ধে তদন্ত কমিশনও গড়ে দিয়েছিলেন। তদন্ত কমিশনের রিপোর্টে অবশ্য এস·পি· গুপ্তার বিরুদ্ধে আরোপিত কোটি কোটি টাকা তছরূপের কোন প্রমাণ মেলেনি। তিওয়ারি তাঁকে সম্মানীয় পদ দেন রাজ্যের দুটি জেলার জেলা অধিকারী ছিলেন সিং পদবীধারী। তিওয়ারি মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পরই তাঁকে হটিয়ে দেন। ঝাঁসী, মজফ্ফরনগর, কানপুর, বারাবঙ্কির পুলিশ অধিকর্তাদের বদলে দেওয়া হয় কেবল বীর বাহাদুরের পছন্দের লোক ছিলেন বলে। এলাহাবাদের পুলিশ অধিকর্তারও হয় একই হাল। তিওয়ারি প্রশাসনকে নিজের কব্জায় রাখার কোন ত্রুটি করেন নি, সে কারণেই মুখ্যসচিব, গৃহসচিব এবং ডিরেক্টর জেনারেল অব পুলিশের মত গুরুত্বপূর্ণ পদগুলিতে নিজের পছন্দের ব্রাহ্মণ অধিকারীদের নিযুক্ত করেন।

এখন পর্যন্ত সরকারী অর্থকোষের ব্যাপারে তেমন কোন চিন্তা করেননি তিনি। সরকারের ওপর কোটি কোটি টাকার অতিরিক্ত বোঝা চাপিয়েও তিনি উকিলদের জন্য ভবিষ্যৎ যোজনা, রাজ্য কর্মচারীদের কেন্দ্রের সমান বেতন, স্থানীয় সংস্কার ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের বোনাস, সচিবালয়ের কর্মীদের বিশেষ ভরতুকি, অধ্যাপকদের বেতন বৃদ্ধি, তথা কানপুরে নতুন সমিতি গড়ার মত প্রশংসনীয় পদক্ষেপ নেন যাতে লক্ষ লক্ষ লোকের উপকার হবে। এইভাবে তিওয়ারি ধীরে সুস্থে তার রাজনৈতিক চাল খেলছেন। আর মুখ্যমন্ত্রীত্ব পাওয়ার চার মাসের মধ্যেই সমস্ত প্রশাসনের ওপর নিজের ক্ষমতা মজবুত করেন। তিওয়ারি বলেন, 'আমার কাছে নিজের কাজটাই বড়। আমি কাজের প্রচার করার পক্ষপাতি নই। প্রথমবারের তুলনায় এখন আমার সামনে সমস্যা অনেক। কিন্তু লক্ষ্যে পৌঁছানো নিয়ে আমি কোন চেষ্টা বাকি রাখব না।'

যাইহোক তিওয়ারি রাজনীতিতে কাঁচা খেলোয়াড় নয়। উত্তরপ্রদেশের বিপক্ষ শিবিরে রাজনৈতিক কোন্দল বেড়ে উঠছে দিন দিন। রাজীব বিরোধী দল গড়তে গিয়ে আজও একজোট হওয়ার সম্ভাবনা তাঁরা দেখাতে পারেনি। এ সুযোগ তিওয়ারি নেবেন নিশ্চয়ই। তাঁর অতীত দৃষ্টান্ত দেখে সেই আশা করা যায়। অবশ্য যদি কংগ্রেস-ই নেতারা বীর বাহাদুরের তিওয়ারির বিদ্বেষ মনোভাব কাটিয়ে তুলতে পারেন, এবং প্রদেশ সংগঠন প্রভৃতির ব্যাপারে তিওয়ারি বাধা দূর করে সহযোগিতা করেন। তা হলে তিওয়ারি কংগ্রেস-ইর নির্বাচন রথটিকে মনোমত জায়গায় নিতে যেতে সফল হবেন। এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছুই নেই। নইলে এই বৃহত্তম জনসংখ্যার ভোটব্যাঙ্কটির একাধিক ফাকফোকর দিয়ে কংগ্রেসী ভোট বেরিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাই সর্বাধিক। কারণ সম্প্রতি রাজ্যের ৫৩টি জেলায় পঞ্চায়েত ও ব্লক স্তরের নির্বাচনে বিরোধী দলগুলি কংগ্রেসকে বেশ একহাত নিয়েছে।

-অজয় কুমার

বইমেলার জন্য

মহানগরে এখন বইমেলার হিড়িক। পুস্তকপ্রেমী লোকদের ভিড়ে মুখরিত হয়ে উঠেছে। লেখক, পাঠক আর প্রকাশক। বিভিন্ন রকমের মানুষ এই মেলায়। বই এসেছে বহির্বঙ্গ থেকেও। সাহিত্য সৃষ্টির পাশাপাশি আর একটা জিনিস—তা হল বইয়ের ব্যবসা। হালফিল বইয়ের ব্যবসা কেমন চলছে। বাংলা বইয়ের মধ্যে উপন্যাসের বিক্রি সবচেয়ে বেশি। বাণিজ্যিক বইয়ের পাশাপাশি সৃষ্টিশীল বইয়ের ব্যবসায়ে কাজ করছেন আরেক ধরনের প্রকাশক। প্রমার সুরজিৎ ঘোষ, অনুষ্টুপের অনিল আচার্য্য, প্রতিভাসের বিজেশ সাহা। সুরজিৎ ঘোষ বললেন, দীর্ঘদিনের প্রচেষ্টার একটা ভাল ফল পাওয়া যায়। আমাদের প্রকাশিত বই রাষ্ট্রপতি পুরস্কার পেয়েছে। দেশ বিদেশ ঘুরেছি, নতুন ধরনের প্রকাশনের আইডিয়া এসেছে আমাদের মাথায়। বিভিন্ন বিষয়ে প্রবন্ধ, ছোটগল্প, কবিতা উপন্যাসের বই ছাপি আমরা। ভাল পলিসি থাকলে সব রকমের বই ছেপেই ব্যবসা করা যায়। একটু অন্যরকমের বই ছাপেন অনিল আচার্য্য। প্রগতিশীল বামপন্থী ধ্যান ধারণায় পরিপুষ্ট সাহিত্য পত্রিকা 'অনুষ্টুপ'কে ঘিরেই এই প্রকাশন সংস্থাটি। প্রগতিশীল সাহিত্য এবং সংস্কৃতিকে ঘিরেই প্রকাশনীর বইগুলি। গত বছর এই প্রকাশন থেকে প্রকাশিত কবি শঙ্খ ঘোষের 'কবিতার মুহূর্ত' বইটি শিরোমণি পুরস্কার পায়। অনিলবাবু বললেন, সাহিত্য সমাজকে সচেতন করে। পুস্তক ব্যবসায়ীদের সেই কথাটাও মনে রাখা দরকার। শুধু ব্যবসা নয়। 'প্রতিভাস' মাত্র কয়েক বছর শুরু করেছে তার কাজ। বেশির ভাগ বই প্রবন্ধ কেন্দ্রিক। তবে উপন্যাস, গল্প বা কবিতার বইয়ের প্রতিও আগ্রহী প্রকাশক বিজেশ সাহা। নতুন রকমের বইয়ের বিক্রির কথা বললেন তিনি। বললেন, সিরিয়াস বইয়েরও আলাদা একটা রিডারশিপ আছে। বইয়ের বাজারে, এই বইমেলার ভিড়ে হাজার প্রকাশকের সঙ্গে নিজেকে না হারিয়ে ফেলে এই তিন জন অন্যরকম প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। একসঙ্গে ভালো বই এবং ব্যবসা।

অগ্রিম চিন্তা

একটা শহরে প্রতিদিন যত গাড়ি চলা উচিত, কলকাতায় কি তার বেশি চলে? চললে, তা কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যাবে? এ মহানগরের কোথায় কোথায় উড়ালপুল দরকার, কোথায় দরকার সাবওয়ে, গঙ্গায় কি দ্রুতগতির ফেরিয়াল সার্ভিসের প্রয়োজন রয়েছে, পাতাল রেলের সম্প্রসারণ কি করা উচিত? ইত্যাদি হাজারো প্রশ্ন ছড়িয়ে রয়েছে পরিবহনকে ঘিরে। আর সে সব যাচাই করে দেখতে জাপান থেকে আসছেন এক পরিবহন বিশেষজ্ঞের একটি দল। তারা সব দেখে শুনে দেবেন। দেবেন সাহায্যও। তবে নগদে নয় জিনিসপত্রে। এত কম ঝঞ্ঝাটে যে আগামী শতাব্দীতে এ মহানগরের পরিবহন সমস্যার সমাধান হতে পারে পরিবহন মন্ত্রী শ্যামল চক্রবর্তী স্বপ্নেও তা ভাবতে পারেন নি। জাপান থেকে প্রস্তাব আসা মাত্রই শ্যামলবাবু সম্মতি জানিয়ে দিয়েছেন।

ঢেলে সাজাতে

গ্রেট ইস্টার্ণ হোটেলকে ঢেলে সাজান হবে। ঠিক হয়েছে, হোটেলের পুরনো দুই বাড়ির মাঝে একটি পাঁচশ ঘর বিশিষ্ট বাড়ি তৈরি হবে। ওই বাড়ির ছাদে থাকবে আধুনিক সুইমিং পুল, আর একতলায় হবে রেস্তোরাঁ। সঙ্গে একটি মিউজিয়াম। তাতে থাকবে সেইসব জিনিস যা ভারতীয় কৃষ্টি ও সংস্কৃতি সম্পর্কে বিদেশিদের ধারণা গড়ে তোলে।

একতলায় শুধু রেস্তোরাঁ নয় থাকবে মেডিক্যাল কেয়ার ইউনিট। যাতে হৃদরোগের সর্বাধুনিক বন্দোবস্ত থাকবে। থাকবেন নামী ডাক্তারেরা। হঠাৎ কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে তাদের জন্য এবং বিবাদী বাগ অঞ্চলের কথা ভেবেই মেডিক্যাল ইউনিটটি তৈরি হবে।

আয় বৃদ্ধি

মৃতপ্রায় কলকাতা বন্দরের আয়ের পরিমাণ বেড়েছে। এ মহানগরের মানুষজনদের কাছে এটা নিশ্চয়ই আশার কথা। জানা গেছে, আগের বছরের তুলনায় ১৯৮৬-৮৭ সালে আয়ের পরিমাণ বেড়েছে ১৩ কোটি ৬১ লক্ষ টাকা। আর ব্যয়ের পরিমাণ বেড়েছে মাত্র ৬ কোটি ৪২ লক্ষ টাকা। ওই বছরে উদ্বৃত্তের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২০ কোটি ১৩ লক্ষ টাকা। আগের বছর ওই অঙ্কটি ছিল ১২ কোটি ১৩ লক্ষ টাকা।

জানা গেছে, ওই বছরে বন্দর দিয়ে মোট এক কোটি কুড়ি লক্ষ বাহাত্তর হাজার টন মাল খালাস বোঝাই হয়েছে। এর মধ্যে হলদিয়া বন্দর দিয়ে হয়েছে আশি লক্ষ পঁচিশ হাজার টন এবং কলকাতা দিয়ে চল্লিশ লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার টন।

পঙ্কজের চোখে

পঙ্কজ উদাস নামেই ওঁর পরিচয়। গজল গানের নতুন যে প্রবাহ শুরু হয়েছে, তার অগ্রণী নামটি হল, পঙ্কজ। কোন গান বাজারে বেরোন মাত্রই শেষ হয়ে যায়। সন্দেহ নেই গজল গানে পঙ্কজ ভিন্ন মাত্রা আনতে পেরেছেন।

শিক্ষিত-বুদ্ধিমান পঙ্কজ জানেন, হিন্দি ছবির বর্তমান গজল লক্ষ্ণৌ কি হায়দ্রাবাদের খানদানি গজল থেকে সরে এসেছে অনেকখানি। তবু পঙ্কজ বিশ্বাস হারাতে নারাজ। 'নাম' নামে একটি হিন্দি ছবিতে অভিনয় করেছেন পঙ্কজ। নায়কোচিত চেহারা। 'ভাল চরিত্র' পেলে আরো ছবিতে অভিনয় করতে কোন আপত্তি নেই ওর।

সম্প্রতি পঙ্কজ এ মহানগরে এসেছিলেন। বিখ্যাত এই শিল্পীকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, আপনার মতে ভারতের সেরা গজল শিল্পী কে?

এক মিনিটও ভাবার জন্য ব্যয় না করে পঙ্কজ উত্তর দিয়েছেন, 'বেগম আখতার।'

নাটকের স্বার্থে

উৎপল দত্তের শেক্সপীয়র প্রীতির কথা সবারই জানা আছে। 'ওথেলো' 'মিড সামার নাইটস্ ড্রিম', 'ম্যাকবেথ' প্রভৃতি নাটকে উৎপলবাবুর দক্ষতা আজ কিংবদন্তীতে পরিণত হয়েছে। কিন্তু মাঝে কিছুদিন উৎপলবাবু শেক্সপীয়র থেকে মুখ ফিরিয়েছিলেন। এখন শোনা যাচ্ছে উৎপলবাবু আবার শেক্সপীয়রকে নিয়ে ব্যস্ত হয়েছেন। নাটকটি হল, 'চৈতালি রাতের স্বপ্ন'। যেটি উৎপলবাবু নিজেই তৈরি করেছেন 'মিড সামার নাইট' অবলম্বনে। অভিনয়ে থাকবেন, পি-এল-টি গ্রুপের কিছু সদস্য ছাড়াও

আইচল্লিশটি দল থেকে বাছাই করা কিছু শিল্পী। পরিচালনার দায়িত্বে থাকবেন উৎপলবাবু।

এরপর যে অমোঘ প্রশ্নটির মুখোমুখি হতে হয় তার উত্তর একটাই, আগামী বছরের গোড়াতেই এ মহানগরের মানুষজনেরা এ নাটকের অভিনয় দেখতে পাবেন।

পরিবর্তন

সোনারপুরে মুকুন্দপুর মৌজার জগৎপোতায় প্রায় ছয়'শ একর জমি নিয়ে গড়ে উঠছে 'জুলজিক্যাল গার্ডেন কাম ক্যাপটিভ ব্রিডিং স্টেশন'।

অমন খোলামেলা জায়গায় থাকলে নাকি জন্তু-জানোয়াররা অনেক ভাল থাকবে। বর্তমানে আলিপুরে যে চিড়িয়াখানাটি আছে সেটিকে ধাপে ধাপে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে সোনারপুরে। তবে খুবই গোপনে এ পরিবর্তনটি ঘটান হবে বলে ঠিক হয়েছে।

কিন্তু সংবাদটি প্রকাশিত হওয়ার পরই শাসকদলের বিভিন্ন কর্তা-ব্যক্তিদের মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে গেছে। চিড়িয়াখানা উঠে গেলে আলিপুরের অমন মূল্যবান তিরিশ একর জায়গার কি হবে? বর্তমান বাজারদর অনুযায়ী ওই জমির দাম কত হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়। তাই তদ্বির চলছে নানাভাবে। অবস্থা শেষে এমন দাঁড়াল যে, মন্ত্রী অম্বরিশ মুখার্জি বলতে বাধ্য হলেন, আলিপুর চিড়িয়াখানা সরছে না আলিপুরেই থাকবে

Regd. No. AD-212 ALOKPAAT RNI No. RN 42171/86
Lic. No. U/AD-1 January 1989 Rs. 6.00 Per Copy